স্ম র ণি কা

সুবর্ণ-স্মৃতি

৫০তম

ইজতেমা

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে অন্যান্য সুন্নী মুসলমানদের বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর লেখার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন:

"আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ে আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্বাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরুদ্ধে ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা" অর্থ্যাৎ, সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ।

(আইয়ামুস্‌সুলেহ্ পুস্তক, পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭)

স্মরণিকা

সুবর্ণ-স্মৃতি

লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ③

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

১। স্বতঃপ্রণোদিত অসীমদাতা পরম করুণাময়,
বার বার কৃপাকারী আল্লাহর নামে।
২। সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক,
৩। পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী
(ও) বার বার কৃপাকারী, ৪। বিচার দিবসের মালিক।
৫। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং
তোমারই সাহায্য চাই।
৬। তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,
৭। তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা (তোমার)
কোপগ্রস্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও হয় নি।

হাদীস শরীফ

উচ্চারণ: **আন ওয়াবিসাতাবনি মা'বাদিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইসতাফতি নাফসাকা ইসতাফতি নাফসাকা ইসতাফতি নাফসাকা। আল বিররু মাতমাআন্নাত ইলাইহিন্নাফসু ওয়াত মাআন্না ইলাইহিল ক্বালবু ওয়াল ইছমু মা হাকা ফিননাফসি ওয়া তারাদ্দাদা ফিসসাদরি ওয়া ইনিফতাকান্নাসু।**

অর্থাৎ, হযরত ওয়াবেসাত ইবনে মা'বাদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– "তোমার নিজ 'নফসের' (আত্মা) নিকট 'ফতওয়া' জিজ্ঞাসা কর, (একথা তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন)। তিনি আরো বললেন, নেকী হল সেই বিষয়, যাতে তোমার 'নফস শান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং যার প্রতি তোমার হৃদয় তৃপ্তি অনুভব করে। আর পাপ হল সেই বিষয় যাতে তোমার নিজের বিবেক দংশিত এবং সংকুচিত হয়, যদিও অন্যেরা এই বিষয়কে বৈধ বা জায়েয বলে ফতওয়াই দিক না কেন।"

(মসনদ আহমদ)

৫০তম ইজতেমা
লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম

আহ্বায়ক
রওশান আরা আহমদ (সূচি)

সম্পাদিকা
নিলুফার মমতাজ

অর্থ সম্পাদিকা
আমাতুল মুজিব

প্রচ্ছদ
কাজী রাফি শামস্

মুদ্রণ
বাড-ও-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন
৮৯-৮৯/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

সংখ্যা
৫০০ কপি

১ম প্রকাশ
১৫ আগষ্ট ২০২২, ৩১ শ্রাবণ ১৪২৯

প্রকাশনায়
লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম
মসজিদ বায়তুল বাসেত,
১নং কে.বি. ফজলুল কাদের রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

১	মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের শুভেচ্ছা বাণী	৭
২	মোহতরমা সদর সাহেবার শুভেচ্ছা বাণী	৮
৩	মোহতরম আমীর সাহেবের শুভেচ্ছা বাণী	৯
৪	প্রেসিডেন্ট সাহেবার শুভেচ্ছা বাণী	১০
৫	সম্পাদকীয়	১১
৬	২০২১-২২ কার্যসালের আমেলা	১২
৭	হালকা প্রেসিডেন্টগণের নাম	১৩
৮	সুবর্ণ-স্মৃতি স্মরণিকা কমিটি	১৩
৯	এক নজরে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম ২০২১-২২	১৪
১০	লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম-এর প্রেসিডেন্টগণের তালিকা	১৫
১১	লাজনা ইমাইল্লাহ-এর আহাদনামা	১৬
১২	আমন্ত্রণ (কবিতা)	১৭
১৩	এই স্মরণিকার সূত্রপাত	১৮
১৪	চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ	১৯
১৫	আমার বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্যলিপি	২৫
১৬	আমার জীবনের কিছু কথা	২৮
১৭	আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা	৩১
১৮	আমার স্মৃতিতে চট্টগ্রাম	৩২
১৯	কিছু স্মরণীয় ব্যাক্তিত্বের স্মৃতিচারণ	৩৩
২০	সত্যস্বপ্ন দেখার মাধ্যমে আমার বয়আত গ্রহণ	৪০
২১	আমার জীবনে আহমদীয়াত	৪১
২২	স্মৃতিতে আমার আব্বা-আম্মা ও আমাদের পরিবার	৪২
২৩	ফিরে দেখা দিনগুলো	৪৫
২৪	যখন আমি নাসেরাত ছিলাম	৪৬
২৫	আমার আহমদীয়াত গ্রহণ এবং কিছু ঘটনা	৪৭
২৬	আমার পরম মমতাময়ী শাশুড়ি মায়ের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও সত্যস্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়া	৪৯
২৭	সুন্দরতম ফুলের স্মরণে	৫০

২৮	আমি কীভাবে তবলীগে ফিরে আসলাম	৫১
২৯	আমি কীভাবে আহমদী হলাম এবং আমার অনুভূতি	৫৩
৩০	খলীফা মাসরূর	৫৪
৩১	আমি কীভাবে আহমদী হলাম	৫৫
৩২	অর্ধ-শতবার্ষিকীতে আধডজন স্মৃতিচারণ	৫৭
৩৩	সোনালী স্মৃতি– খলীফা রাবে (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাত	৫৮
৩৪	দোয়া কবুলিয়াতের ঘটনা	৫৯
৩৫	আমার অনুভূতি ও একটি সত্য স্বপ্ন	৬১
৩৬	স্মৃতির স্মরণে	৬২
৩৭	চট্টগ্রামের দিনগুলো	৬৩
৩৮	স্মরণে ও বরণে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম	৬৫
৩৯	পুরানো সেই দিনের কথা	৬৬
৪০	আমার দেখা আধ্যাত্মিক এক মিলনমেলা ও সম্প্রীতির স্রোতস্বিনী চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন	৬৮
৪১	দোয়া কবুলীয়তের ঈমানবর্ধক ঘটনা	৭১
৪২	স্মৃতিবিধুরতা	৭২
৪৩	আমার প্রেরণার উৎস	৭৩
৪৪	স্মৃতির বনভোজনগুলো	৭৬
৪৫	সত্যের পথে আলোকবর্তিকা এক নও-মুসলিম ‘নুরুল ইসলাম চক্রবর্তীর’ জীবন কথা	৮১
৪৬	স্মৃতিপটে লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম	৮৮
৪৭	অন্তীম যাত্রা	৮৯
৪৮	স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম	৯০
৪৯	আমার স্নেহময়ী শাশুড়ি মায়ের স্মৃতিচারণ	৯৪
৫০	হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মো’জেযা বা নিদর্শন	৯৫
৫১	চট্টলার ঝর্ণাধারায় লুটোপুটি	৯৬
৫২	স্মৃতিতে চট্টগ্রাম	৯৭
৫৩	স্মরণ রেখো	৯৯
৫৪	ফুলবাগিচা	৯৯
৫৫	চট্টগ্রামের কীর্তিমানদের স্মরণে	১০০
৫৬	ইসলামের বিজয়	১০১
৫৭	ছবিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম	১০২

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের
শুভেচ্ছা বাণী

লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রামের 'বার্ষিক ইজতেমার' পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার জন্য আয়োজকরা আমার একটি বাণী চেয়েছেন। আমার বাণী হিসেবে হুযূর (আই.) গত ২৭শে মার্চ ২০২১ইং তারিখে জার্মানির ন্যাশনাল লাজনা ইমাইল্লাহ্র আমেলার সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মোলাকাতে তাদের শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন সেটাই স্মরণ করাচ্ছি।

হুযূর (আই.) বলেছিলেন– "লাজনা ইমাইল্লাহ্র শতবর্ষ জুবিলীতে লাজনা ও নাসেরাতের শতভাগ সদস্যার জামা'তী ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হওয়া এবং জামা'তের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা উচিত। শতভাগ সদস্যার নিয়মিত আল্লাহ্র ইবাদতকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারী ও এর শিক্ষায় আমলকারী ও জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী হওয়া আবশ্যক। এগুলো হল জামা'তের মৌলিক শিক্ষা।"

হুযূর (আই.) আরও বলেন, "আমাদের অধিকাংশ সদস্যা বা শতকরা ৫০ ভাগ সদস্যা যদি ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় আমল না করে তাহলে শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন করে কোন লাভ নেই। তাই এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লাজনা ইমাইল্লাহ্র শতবর্ষ উদযাপন করার পাশাপাশি আপনাদের সদস্যাদের ঈমানী দৃঢ়তা কতটুকু– তা মূল্যায়ন করুন এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।"

আপনাদের পঞ্চাশতম ইজতেমা উদযাপন উপলক্ষে আমরাও এ প্রত্যাশা রাখি, আপনাদের সব সদস্যা যেন হুযূর (আই.)-এর এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নে 'লাব্বায়েক' বলে সাড়া দেয়। এতে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োগে কোন ধরনের ঘাটতি যেন না থাকে। দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে এ উদ্দেশ্য সফল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

একই সাথে আপনাদের ইজতেমার সর্বাঙ্গীন সফলতাও কামনা করছি।

ওয়াসসালাম

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ওয়াকফে জিন্দেগী

মোহতরমা সদর সাহেবার
শুভেচ্ছা বাণী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

'লাজনা ইমাইল্লাহ্' (আহমদী মুসলিম মহিলা সংগঠন) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একটি অঙ্গসংগঠন। 'লাজনা' শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌র দাসী। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) যখন ১৯২২ সালে এই অঙ্গ সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন এর সদস্য ছিল মাত্র ১৪ জন। যা বর্তমানে লাখের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আমাতুল হাই (রা.) সাহেবা জামা'তের মহিলাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির বিষয়ে গভীর ইচ্ছা পোষণ করতেন। এই সংগঠন তৈরির বাসনা উনিই প্রথম খলীফা সানী (রা.)-এর কাছে ব্যক্ত করেন। যা জামা'তের মহিলাদের জীবনধারাকে বদলে দেয়। খলীফা সানী (রা.)-এর সাথে বিয়ের আগেই তিনি তাঁকে একটি চিঠিতে জামা'তের মহিলাদের ধর্মীয় ক্লাস নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এ সংগঠনের উদ্বোধনে খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) উল্লেখ করেন, ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা ছাড়াও জামা'তের উন্নতি ও সফলতা মহিলাদের উপর নির্ভর করে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই এ অঙ্গ সংগঠন সারা পৃথিবীতে গঠিত হতে থাকে এবং জামা'তী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মহিলারা সফলভাবে অংশ নিতে থাকে। সংগঠন পরিচালনার মূল গঠনতন্ত্র যে বিষয়ে মনোনিবেশ করে তা হলো, মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংগঠন এবং এখানে সকল নারীরা একে অপরের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করে।

১৯২২ সালে যখন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই সংগঠনের ভিত্তি রাখেন। সেই সময় সমাজে মুসলমান নারীদের অবস্থান যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো আহমদী জামা'তের সদস্য হিসেবে আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার আশীর্বাদ প্রাপ্ত। এমন একসময় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমাজে মুসলমান নারীরা শিক্ষা অর্জনে শূন্যের কোঠায় এবং তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোন সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্বও ছিল না। সমাজের সার্বিক উন্নতিতে নারীদেরও যে সমান অবদান থাকতে পারে সেটা ভাবার মত মন মানসিকতাও তখন খুব কম মানুষের ছিল।

আজকাল আমরা নারীদের উন্নতির জন্য অনেক নারীবাদী সংগঠনের উপস্থিতি দেখতে পাই। এসব সংগঠন যতটা না নারীদের উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে তার চেয়ে অনেক বেশি আধুনিকতার নামে করছে ক্ষতিসাধন। নারীদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কীভাবে হতে পারে তার কিছুই না জেনে নারী স্বাধীনতার নামে যেসব আন্দোলন বা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে লাভের চেয়ে সমাজে ক্ষতি হচ্ছে বেশি। এ অবস্থায় 'লাজনা ইমাইল্লাহ্' এমন একটি সংগঠন যা সরাসরি যুগ-খলীফার তত্ত্বাবধানে নারীদের সার্বিক উন্নয়নে শুধু কাজই করছে না বরং নারীরা কীভাবে সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে তাও শেখাচ্ছে। আমাদের সংগঠনের মূলনীতি অনুযায়ী–

* নারীরা একসাথে হয়ে নিজেদের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করবে।
* যুগ-খলীফার আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধীনে থেকে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে কাজ করবে।
* নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করবে।
* নিজেদের সন্তান-সন্ততির সঠিক তরবিয়তে মনোনিবেশ করবে।
* প্রাত্যহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক শিক্ষা চর্চা করা এবং সমাজের যে কোন প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

সর্বোপরি সকল উদ্দেশ্য পূরণে দোয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই সংগঠনের অধীনে থেকে সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ওয়াসসালাম
খাকসার

Rehena

রেহেনা খায়ের
সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ

মোহতরম আমীর সাহেবের
শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম ৫০তম স্থানীয় ইজতেমা-২০২২ (সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা) উদযাপন করার তৌফিক পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ইজতেমা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার ইসলামী শিক্ষার এই যে বাস্তবায়ন তা এই যুগে কেবলমাত্র জামা'তে আহমদীয়াতেই পরিপূর্ণ রূপে দেখা যায়। এই ইজতেমা এক প্রকার ঐশী মিলন মেলাও বলা চলে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যগণ ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিকভাবে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করে এসেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। যার উদাহরণ কেবলমাত্র ইসলামের প্রাথমিক যুগেই দেখা যায়। অতএব খলীফায়ে ওয়াক্ত এর নির্দেশনা অনুযায়ী লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যবৃন্দ পরিবারের সন্তানদের উত্তম তালিম ও তরবীয়্যত প্রদানের মাধ্যমে জামা'ত তথা ইসলামের সেবা করার সুযোগ পেতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৫ ডিসেম্বর ১৯২২ সনে এ সংগঠন কায়েম করেন যার শাব্দিক অর্থ হল আল্লাহর দাসীদের সংগঠন।

অতএব আমি আশা করবো লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম এর মা-বোনেরা তাদের এই স্থানীয় সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমার মাধ্যমে নিজেদের তালিম ও তরবীয়্যত এর মান আরও এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রত্যেকের মাঝে অনুপ্রেরণা হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম এর ৫০তম স্থানীয় ইজতেমার সার্বিক সফলতা কামনা করছি। আমিন।
খাকসার

মোহাম্মদ খালিদুর রহমান ভূঁঞা
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম।

প্রেসিডেন্ট সাহেবার
শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনটির শত বর্ষ পূর্তির আনন্দে যখন আমরা উদ্বেলিত ঠিক তখন-ই চট্টগ্রামের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে জানাই লাখো শুকরিয়া। আমি মনে করি লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামে প্রথমবারের মত স্মরণিকা প্রকাশ– এই সময়ে তাদের সাহসী পদক্ষেপ। মূলত তিনটি কারণে এই স্মরণিকা প্রকাশ। প্রথমত, মহান আল্লাহ তা'লার কাছে শুকরিয়া আদায়। দ্বিতীয়ত, এ যাবত যারা এ সংগঠনের জন্য কাজ করে গেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তৃতীয়ত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের কিছু ইতিহাস রেখে যাওয়া।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশকে। তাঁর 'শুভেচ্ছা বাণী' আমাদের স্মরণিকাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ-এর প্রতি। তাঁর আকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের সাহসী করে তুলেছে। কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জানাই মোহতরম আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামকে। যার শুভেচ্ছা বাণী আমাদের পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামে যারা বিভিন্ন সময়ে আমেলায় কাজ করেছেন এবং হালকার প্রেসিডেন্ট, হালকার আমেলা, নিগরাণ সাহেবারা এবং সাধারণ লাজনা ও নাসেরাত সদস্যাগণ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের জন্যই আজ আমরা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে উত্তম পুরষ্কার দিন।

স্মরণিকা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ। আবেদন রেখে যেতে চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের অসমাপ্ত কাজগুলো আপনারা আরো নিখুঁতভাবে ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে জামা'তকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমীন।

রওশান আরা আহমদ (সূচী)
প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম।

সম্পাদকীয়

মহান খোদা তা'লার আশিস ও অনুগ্রহক্রমে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম-এর ৫০তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই ৫০তম বার্ষিক ইজতেমায় চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ প্রথম বারের মত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ বছরের ইজতেমা এক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রাখে। কারণ চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে। তাছাড়া আমাদের এই স্মরণিকায় চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর সুবর্ণ ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

এই স্মরণিকায় যারা লিখেছেন তারা কেউই লেখিকা নন। নতুন স্মরণিকায় লেখা দেওয়ার জন্য লাজনা বোনদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মত স্মরণিকায় তাদের লেখা প্রকাশিত হবে সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়েই বোনেরা লিখেছেন। ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে। আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আমাদের কাম্য।

ইজতেমার অর্থ সংঘবদ্ধ হওয়া মহাসম্মেলন বা মহাসমাবেশ ইত্যাদি। ইজতেমার সবচেয়ে অধিক কল্যাণ লাভ হয় যিকরে ইলাহীর মাধ্যমে। আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর মহান মকাম ও মর্যাদা সমুন্নত হওয়ার লক্ষ্যে তসবীহ, তাহমীদ, ইস্তিগফার ও দরুদ শরীফের এক আধ্যাত্মিক মনোরম উদ্যানের সৃষ্টি হয়। ইজতেমার দিনগুলোতে এক একটি ইজতেমা যেন একটি রিয়াযুল জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের কানন। ফিরিশতা তাদের শাখা বিস্তার করে সপ্তম আসমান পর্যন্ত একে ঘিরে রাখেন এবং অংশগ্রহণকারীদের উপর ঐশী আশিস ও কল্যাণ বর্ষণ করতে থাকেন।

ইজতেমার উদ্দেশ্য হল নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা আর নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত উন্নতিগুলি ভাগ করে নিয়ে সমাজে উন্নততর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করা। এর ফলে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

অবশেষে এই ইজতেমার সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের এই ইজতেমার সফলতার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

নিলুফার মমতাজ
সম্পাদিকা
সুবর্ণ-স্মৃতি স্মরণিকা-২০২২

২০২১-২২ কার্যসালের আমেলা

ক্রমিক নং	পদবী	নাম
০১	প্রেসিডেন্ট	রওশান আরা আহমদ (সূচি)
০২	ভাইস প্রেসিডেন্ট	নিলুফার মমতাজ
০৩	জেনারেল সেক্রেটারী	জুলিয়া ইয়াসমিন
০৪	সহ. জেনারেল সেক্রেটারী	সৈয়দা নাফিসা হাসান
০৫	সেক্রেটারী তাজনীদ	নুসরাত নেছার
০৬	সেক্রেটারী তালিম	ফিজা আহমেদ
০৭	সেক্রেটারী তরবিয়্যত	নিলুফার মমতাজ
০৮	সেক্রেটারী তবলীগ	নুরুন্নাহার মণি
০৯	সেক্রেটারী মাল	আমাতুল মুজিব খুশী
১০	সেক্রেটারী মোহাসিবা মাল	মাহফুজা মাহমুদ উর্মি
১১	সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ	মনসুরা আবরার
১২	সেক্রেটারী নাসেরাত	ফাহমিদা খাতুন এপি
১৩	সেক্রেটারী খেদমতে খালক	নাসরিন সুলতানা নিপা
১৪	সেক্রেটারী নও-মোবাঈন	রিনা জামাল
১৫	সেক্রেটারী ইশায়াত	তাহেরা মাজেদ রাফা
১৬	সেক্রেটারী সানাত-দাস্তকারী	রানোয়ারা বেগম
১৭	সেক্রেটারী সেহতে জিসমানী	ডা. জাকিয়া খাতুন
১৮	সেক্রেটারী উমুরে তোলাবা	আফরা সিমরান তাহিনা
১৯	সেক্রেটারী যিয়াফত	খায়রুন্নাহার দিবা

হালকা প্রেসিডেন্টগণের নাম

ক্রমিক নং	হালকা	নাম
০১	চকবাজার	নুসরাত নেছার
০২	ষোলশহর	মুশাররাত আফরিন মুক্তা
০৩	অক্সিজেন	তানভিয়া আক্তার জেমি
০৪	বিশ্ববিদ্যালয়	তাজনিন সুলতানা
০৫	টেরিবাজার	তাহেরা হাসান দিবা
০৬	পতেঙ্গা	জাহানারা শাকিল
০৭	উত্তর হালিশহর	পারুল আক্তার
০৮	দক্ষিণ হালিশহর	রাজিয়া সুলতানা
০৯	জামালখান	জাকিয়া সুলতানা
১০	ফিরোজশাহ	কামরুজ্জাহান লাকি

সুবর্ণ-স্মৃতি স্মরণিকা কমিটি

আহ্বায়ক: **রওশান আরা আহমদ (সূচি)**	**সদস্য:** ১. নুসরাত নেছার ২. জুলিয়া ইয়াসমিন ৩. তাহেরা মাজেদ রাফা ৪. ফিজা আহমেদ ৫. জাকিয়া খাতুন ৬. মিথিলা আফরিন ৭. তুবা আহমেদ ৮. ফাতেমা তুজ জোহরা মুক্তি
সম্পাদিকা: **নিলুফার মমতাজ**	
অর্থ সম্পাদিকা: **আমাতুল মুজিব**	

এক নজরে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম

কার্যসাল: ২০২১-২০২২ [অক্টোবর'২১ - জুলাই'২২]

মজলিসের আওতাধীন এলাকা: চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা, পতেঙ্গা, পটিয়া, হাটহাজারী ও কক্সবাজার।

* প্রেসিডেন্টের নাম: রওশান আরা আহমদ সূচি।
* মোট লাজনা: ৩৩০ জন।
* মোট নাসেরাত: ৬৭ জন।
* মোট শিশু: ৩৮ জন।
* মোট আমেলার সদস্য: ১৮ জন।
* মোট হালকা: ১০টি।
* মোট চাকুরিজীবী লাজনা: ১০ জন।
* মোট ওসীয়্যতকারী: ৬৫ জন।
* মোট ওয়াকেফাতে নও: ৪৫ জন।
* মোট নও-মোবাঈন: ৩৯ জন।
* মোট ছাত্রী: ১০৫ জন।
* মোট আমেলা সভা হয়: ১১টি।
* মোট সাধারণ সভা হয়: ৯টি।
* ২ দিনব্যাপী স্থানীয় তালিম-তরবিয়তি ক্লাস হয় ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর, ২০২১।
* অক্টোবর'২১-জুন'২২ পর্যন্ত মোট কুরআন ক্লাস হয় ১০টি (তালীম দপ্তরের পক্ষ থেকে)।
* ২৩-২৯ ডিসেম্বর ও ১৯-২৫ মে তরবিয়্যতি সপ্তাহ পালন।
* নিশানে আসমানী, ইসলামী নাতি-দর্শন, নুরুল কুরআন, পয়গামে সুলেহ, লেকচার লুধিয়ানা বইয়ের উপর সেমিনার ও কুইজ অনুষ্ঠিত হয়।
* সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস পালন।
* ২২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মসজিদে সেহেতী জিসমানী বিভাগের পক্ষ থেকে লাজনাদের ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক করা হয়।
* ১৯ নভেম্বর, ২০২১ মসজিদে স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে এই বছরের নতুন লাজনা ও নতুন নাসেরাতদের জন্য **নবীনবরণ অনুষ্ঠান** আয়োজন করা হয়।
* ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নাসেরাতদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
* ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে তরবিয়্যতমূলক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন।
* ২১ জানুয়ারি, ২০২২, মিনা বাজার ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত।
* ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, মুসলেহ মওউদ (রা.) দিবস পালন (জামা'তী সহযোগিতায়)।
* ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।
* ২৩ মার্চ, ২০২২ মসীহ্ মওউদ দিবস পালন।
* ২৬ মার্চ, ২০২২, মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।
* ১ এপ্রিল, ২০২২, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ সেমিনার হয়।
* 'রোযার গুরুত্ব ও ফযিলত' এর উপর বিশেষ সভা হয় ২২ এপ্রিল, ২০২২।
* লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে ২৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ২৩০জন দুস্থ ও পথচারীকে বিনামূল্যে ইফতার বিতরণ করা হয়।
* ২৯ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে মসজিদ বায়তুল বাসেতে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম ৩০০জনের জন্য ইফতারির আয়োজন করে।
* ২৯ রমযানে মেহেদী উৎসব করা হয়।
* এই বছর রমযান মাসে ১২৬জন লাজনা ও ৬জন নাসেরাত কুরআন খতম করেন।
* ১৫ মে, ২০২২, ঈদ-পুনর্মিলনী আয়োজন করা হয়।
* ২৭ মে, ২০২২ তারিখে খিলাফত দিবস পালন। [জামা'তী সহযোগিতায়]
* ১ জুলাই, ২০২২, নও-মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
* 'লাজনা বুলেটিন'-এর মোট গ্রাহক সংখ্যা: ৮০ জন।
* মোট ওয়াকারে আমল হয় ২৬ বার।

লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম-এর প্রেসিডেন্টগণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	সময়কাল
০১	মিসেস সামসুন্নেসা বেগম	১৯৪৮-১৯৫২
০২	মিসেস মরিয়ম নিয়াজ	১৯৫২-১৯৫৪
০৩	মিসেস জয়নাব হাসান	১৯৫৫-১৯৫৮
০৪	মিসেস হামিদা বেগম	১৯৫৯-১৯৬৩
০৫	মিসেস রাবেয়া রহিম	১৯৬৪-১৯৭১
০৬	মিসেস মুখতার বানু	১৯৭১-১৯৯১
০৭	মিসেস তাহেরা মির্যা	১৯৯২-১৯৯২
০৮	মিসেস জোহরা বেগম	১৯৯২-১৯৯৪
০৯	মিসেস মুখতার বানু	১৯৯৪-১৯৯৬
১০	মিসেস ইসরাত জাহান	১৯৯৭-১৯৯৯
১১	মিসেস আমাতুল কাইয়ুম	১৯৯৯-২০০০
১২	মিসেস নাসিরা আক্তার (ভারপ্রাপ্ত)	২০০০-২০০১
১৩	মিসেস মুখতার বানু	২০০১-২০০৫
১৪	মিসেস নাজমা রহমান	২০০৫-২০০৫
১৫	মিসেস রওশান আরা আহমদ (ভারপ্রাপ্ত)	২০০৫-২০০৫
১৬	মিসেস রওশান আরা আহমদ	২০০৬-২০১৩
১৭	মিসেস নাঈমা বুশরা	২০১৩-২০১৯
১৮	মিসেস রওশান আরা আহমদ	২০১৯-বর্তমান

লাজনা ইমাইল্লাহ-এর আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)

ম্যাঁ ইকরার কারতিহুঁ কে আপনি মাযহাব অওর কওম কি খাতের আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর আওলাদ কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গী। নীয সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহুঙ্গী অওর খেলাফতে আহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী (ইনশাল্লাহ তা'লা)

অনুবাদঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্ম ও জাতির স্বার্থে আমার জীবন, সম্পদ, সময় ও সন্তান-সন্ততি কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। তদুপরি সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবো (ইনশাল্লাহ তা'লা)।

আমন্ত্রণ

সৈয়দা নাহিদ মমতাজ

লাজনা ও নাসেরাত বোনেরা
আজ সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ
চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমার
পঞ্চাশ বছর পূর্তি আজ।
মোরা আনন্দে করি আল্লাহর জয়গান।
আহা কি আনন্দ আজ আকাশে বাতাসে
সাথে সাথে দুঃখ কষ্ট ভুলে
মোরা এক হব খিলাফতের পতাকা তলে।
সোনালী যুগের গৌরব গাঁথা
জাগবে আবার নতুন রূপে
আহা কি আনন্দ আজ আকাশে বাতাসে
আজ নতুন করে শপথের দিন এসেছে
সবাই এক সাথে এক হবো খিলাফতের পতাকা তলে
পুরানো সব কিছু ভুলে যাব ইমাম মাহদীর ডাকে।

এই স্মরণিকার সূত্রপাত

রওশান আরা আহমদ (সূচী)

দিনক্ষণ মনে নেই। শুধু মনে পড়ছে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাঈমা বুশরা সাহেবার বক্তৃতা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। মন বক্তৃতায় থাকলেও চোখ আটকে গেলো পেছনের ব্যানারের দিকে– "৪৭তম বাৎসরিক ইজতেমা"। মনে হলো মাত্র তিন বছর পর-ই তো ৫০তম ইজতেমা। সুবর্ণ জয়ন্তীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। খুশিতে মন ভরে উঠলো।

পরবর্তী কোনো এক মাসিক আমেলার সভায় 'সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা' উদযাপনের প্রস্তাব পেশ করলাম। সেই সাথে ইজতেমাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশের গুরুত্ব সকলেই অনুভব করলাম। সাধারণ সভাতেও আলোচনা হলো। সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণিকার আনন্দ আমেলা সভা থেকে সাধারণ সভা, হালকা সভায় ছড়িয়ে গেলো। সাধারণ সদস্যরাও যোগ দিলেন এই আনন্দ মিছিলে।

'স্মরণিকা' কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তার সামান্যতম জ্ঞানও আমাদের নেই। দোয়া করতে থাকলাম– "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের সাহায্য করো"। স্মরণিকার জন্য সম্মানিত সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ সদয় অনুমোদন দিলেন। দোয়ার জন্য লেখা হয় হুযূর (আই.)-এর নিকটও। সাহসে ভর করে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিলুফার মমতাজ আপাকে সম্পাদিকা করে 'স্মরণিকা কমিটি' গঠন করা হলো।

স্মরণিকা কমিটির দুই-একটি সভার পর-ই শুরু হলো করোনা মহামারী। যোগাযোগ হতে থাকলো অনলাইনে। লেখা সংগ্রহের জন্য প্রথমেই আমরা গুরুত্ব দিলাম এ যাবত যারা লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের আমেলায় কাজ করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁদের প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। দেশের ও দেশের বাইরে থেকে বোনেরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের লেখা পাঠিয়েছেন।

স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্টগণ ও আমাদের প্রিয় সদস্য লাজনা ও নাসেরাতরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে স্মরণিকার ব্যাপারে সাহস যুগিয়েছেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ্ তা'লাকে শুকরিয়া জানাই যার ঐশী সাহায্যে প্রথমবারের মত একটি প্রকাশনা হতে যাচ্ছে।

সম্মানিত সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ-এর অনুমোদন ও সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু সাহেব। ৫০তম ইজতমোর জন্য অনুরোধ করতেই লোগো তৈরী করে দিলেন মাহমুদুর রহমান রিয়েল সাহেব। শেষ মুহূর্তে পছন্দমতো একটি চমৎকার প্রচ্ছদ তৈরি করে দিলেন কাজী রাফি শামস্ সাহেব। দেশ-বিদেশ থেকে লেখা সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন তাহেরা মাজেদ ও ফিজা আহমেদ। স্মরণকিার সমস্ত লেখা কম সময়ে কম্পোজে সাহায্য করেছেন আমাদের খোদ্দাম ইমরান আহমদ ও বাসেল আহমদ শাবাব। এ যেন আহমদীয়াতের এক মেল-বন্ধন। কোনো ধরণের অভিজ্ঞতা ছাড়াই আল্লাহ্র রহমত ও এ মানুষগুলোর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আমাদের এই স্মরণিকাকে একটি কাঠামোতে দাঁড় করাতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ

নিলুফার মমতাজ

২০২২ সালে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর ৫০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই চল্লিশ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর সোনালী যুগের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনায় আমি নিলুফার মমতাজ।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর ৫০তম বার্ষিক ইজতেমার বিস্তারিত বর্ণনায় যাওয়ার পূর্বে চট্টগ্রাম মসজিদের অবস্থান ও সুদৃঢ় ভিত্তি এবং চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও লাজনা ইমাইল্লাহ কীভাবে গঠিত হয় তার বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ বৈচিত্র্যময় জনপদ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে পরিচিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও চট্টগ্রাম বিশেষ অবদান রাখে। শুধু তাই নয় আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্ব নেতা বিশ্ব নবী হযরত রসূলে করীম (সা.) অনুবর্তীতে সারা বিশ্বে ইসলামের শরীয়তের বিধানকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত উম্মতি নবী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রথম আহমদী ব্যক্তিটিও চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান। কালজয়ী ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তিটির নাম হযরত মাওলানা আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)। পরবর্তীতে খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ১৯১৫ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্রাসা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে চট্টগ্রামে তবলীগের মাইল ফলক সৃষ্টি করেছেন। খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম শহরে একটি তবলীগি সভার আয়োজন করেন। চট্টগ্রাম বারের প্রখ্যাত এডভোকেট আব্দুস সাত্তার সাহেব যিনি পরবর্তীকালে গভর্নমেন্ট প্লিডার ও খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এ সেমিনার এ শহরের বিশিষ্ট দশ-বার জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খান এম.এ. চট্টগ্রাম কলেজের আরবী ও ফারসী বিভাগের শিক্ষক।

মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেব ছিলেন এ সভার বক্তা এবং উপস্থিত বাকী সবাই ছিলেন শ্রোতা। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, রূপক ঈসা (আ.)-এর আগমন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা, বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তি এবং আপত্তি খন্ডনের অকাট্য যুক্তি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেন। মুঙ্গেরী সাহেব কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর উপর ঐশীবাণীর তাৎপর্য বর্ণনাকালে লতিফ সাহেব কয়েকবারই প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ জানান। পরে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য বলা হলে তিনি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন বলে জানান। এর ক'মাস পর ১৯১৬ সালের প্রথমদিকে আব্দুল লতিফ সাহেবের আহমদীয়াতের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি হবার প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নিকট পত্রের মাধ্যমে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

আব্দুল লতিফ সাহেব ঐশী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর সহধর্মিণী সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। বাঁধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি চট্টগ্রাম শহরে আহমদীয়াতের প্রচার করতে থাকেন। অতঃপর ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জামা'তের ইমাম নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন স্থানীয় জামা'তের কর্ণধারকে ইমাম বলা হত, যা পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসাবে রূপান্তরিত হয় এবং তিনি আমরণ কর্ণধার হিসাবে চট্টগ্রাম জামা'তের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন। জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর বাড়ীর কিয়দংশে একটি ঘর নির্মাণ করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা

করেন। মসজিদে নিয়মিত আযান দিয়ে নামাজ পড়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তখন প্রাথমিক দিকে আমাদের যে টিনের ঘরের মসজিদ ছিল সেটার কোন মসজিদের আকার ছিল না। অনেকটা বসতবাড়ীর মতই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব প্রথমবার যখন চট্টগ্রামে মোবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত তখনকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫১/১৯৫২ সালের দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ তৈরী কল্পে ও রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য চট্টগ্রামে সরকারী প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় খুব জোরেসোরে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছিল। এমনি একদিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দলবল সহ আমাদের সেই প্রাথমিক টিনের মসজিদ ঘরটি ভাঙ্গার জন্য এসে উপস্থিত। মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব শেরওয়ানী পাগড়ী পড়ে তাঁর ওয়াকিং স্টিক হাতে নিয়ে বের হয়ে আসেন এবং বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে মসজিদ ভাঙতে বারণ করেন। তাঁর সাহসিকতা ব্যক্তিত্ব ও বাচনিক দৃঢ়তায় সবাই হতভম্ব হয়ে মসজিদের সীমানায় প্রবেশ না করে অন্যদিকে চলে যায় মাওলানা সাহেবের সময়োচিত সাহসিকতায় আমাদের মসজিদের জমি অধিগ্রহণ হতে রক্ষা পায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিকভাবে ১৯৪৮ সালের শুরুতে চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন কালে তাঁর দিক নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের স্ত্রী সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা। তিনি এক বুযুর্গ ব্যক্তির বুযুর্গ সহধর্মিনী। তিনি প্রফেসর সাহেবের নিকট থেকে জামা'তের যে তালিম তরবীয়্যত লাভ করেন তা প্রতিফলনে চট্টগ্রাম লাজনা ও নাসেরাতকে জামা'তী কাজে হাতে খড়ি দেন। তখন চট্টগ্রামে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার বসবাস করতো। প্রফেসর লতিফ সাহেবের পরিবার, খাজা সাহেবের ও ষোলশহরের আজিজুর রহমান চৌধুরী (টি টি) সাহেব ও ইসহাক সাহেবের পরিবার। তাঁরা একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাঁদের হৃদ্যতা ছিল গভীর ও আন্তরিক। মসজিদে তখন লাজনা ইমাইল্লাহর কোন কার্যক্রম হতো না।

যে টিনের মসজিদে মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব থাকতেন সেখানেই শুক্রবার নামায হতো এবং লাজনার বোনেরাও সেখানে নামায আদায় করতেন। প্রফেসর সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দায়িত্ব পালনে জামা'তে পবিত্র কোরআন শিক্ষার ও দরস প্রদানে যে ব্যাপক প্রচলন করেছিলেন সেই অনুপ্রেরণায় সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা জামা'তের ছেলেমেয়েদেরকে নিজ বাড়ীতে পবিত্র কোরআন নাযেরা শিক্ষা দেন। নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস ও সঠিকভাবে নামায পড়ার শিক্ষা দিতেন। তাই তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত জামা'তের বয়োজ্যেষ্ঠ সৈয়দা আমাতুল মজিদ (ছুটি আপা) সাহেবা আজও তাঁর সেই শিক্ষা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা খুবই পরহেজগার ও মানবদরদী ছিলেন। গরীবের প্রতি তাঁর গভীর সহমর্মিতা ছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। এই পূণ্যবতী মহিলা ৯-ই জুন ১৯৭২ সালে ইন্তেকাল করেন। সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার দায়িত্বকালে প্রথম দিকে লাজনার মিটিং হতো জিন্নাত আলী মাষ্টার সাহেবের বাসায়। তিন মাসের মতো উনার বাসায় মিটিং হয়। তখন লাজনার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪/১৫ জন। পরের দিকে প্রেসিডেন্ট সাহেবার বাসায় লাজনার সব কার্যক্রম হতো। সেই সময় সদস্য সংখ্যা ছিল ২০/২৫জন। মিটিং হতো রবিবারে। সেই সময়ে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রবিবারে। মিটিং এর সময় ছিল বিকাল ৪ টায়। সদস্য চাঁদা ছিল ৪ আনা। রশিদ বই ছিল উর্দুতে। সেই সময় কেন্দ্র থেকে (রাবওয়া) মহিলাদের মাসিক পত্রিকা 'মিসবাহ' মাসে একটা বের হতো। মিটিং এ সেই বুলেটিন থেকেও অনেক কিছু পড়ে শোনানো হতো। 'মিসবাহ' মাসিক পত্রিকাটি অনেকটা আমাদের লাজনা বুলেটিনের মতো। সেই সময় প্রেসিডেন্ট সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার সাথে যারা কাজ করেছেন তারা হলেন– মাহমুদা সাদী, মরিয়ম নিয়াজ, জয়নব হাসান, জেরিনা বেগম, মিসেস আহাদ ও জরিনা বেগম (মিসেস বদিউজ্জামান), রাজিয়া বেগম সাহেবা প্রমুখ। লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বের হাল ধরেন বেগম মরিয়ম নিয়াজ। পাঞ্জাবের এক বনেদী আহমদী পরিবারে তাঁর জন্ম। তাই বাল্যকাল থেকে জামা'তী তালিম তরবীয়্যত লাভে মুত্তাকী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন এবং জাগতিক উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা নিয়াজ মোহাম্মদ খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এন.এম. খান সাহেব পঞ্চাশ দশকে বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী মরিয়ম নিয়াজ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহিলাদেরকে জামা'তী তালিম তরবীয়্যত প্রদানের সাথে জাগতিক শিক্ষায় স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ দিতেন। উনার দায়িত্বকালে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর মধ্যে সেলাই শিক্ষার প্রচলন হয়। প্রথমে তিনি দুই কাঁটার উলের মোজা বানানো শিখান। উনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেলাই শিক্ষা করে অর্থ উপার্জনে জামা'তে চাঁদা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি সকলের নিকট মরিয়ম আপা নামে পরিচিত ছিলেন। নিজ সন্তানদের আহমদীয়াতের শিক্ষায় মানুষ করেছেন। বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

অতঃপর লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জয়নব হাসান সাহেবা। তাঁর জন্মস্থান ভারতের হায়দ্রাবাদে দাক্ষিণ্যের সেকান্দ্রাবাদ। পিতার নাম শেঠ আবদুল্লাহ আলাদীন। পিতা ধর্ণাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। পরিণত বয়সে জয়নাব বেগমকে উচ্চ শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের সাথে বিয়ে দেন। হাসান সাহেবের জন্মস্থান ভারতের যুক্ত প্রদেশে। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজে চাকুরী করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান ও পরে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি পঞ্চাশ দশকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। জয়নাব হাসান ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সাল প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ধর্ণাঢ্য ব্যক্তির মেয়ে এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে কোন অহমিকা ছিল না। তিনি মানুষকে খুব সম্মান করতেন। তিনি কুরআন শিক্ষার উপর খুব জোর দিতেন। তখন কেন্দ্র ছিল রাবওয়া। লাজনা ইমাইল্লাহর সব কার্যক্রম উর্দূতেই হতো। সব মিটিং এ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বই পড়ে শোনানো হতো। তখন রাবওয়া থেকে আল-ফযল পত্রিকা আসতো। যেখান থেকে হুযূরের খুতবা পড়ে শোনানো হতো। মিসেস জয়নাব হাসান ব্যক্তিগত জীবনে লন টেনিস প্লেয়ার ছিলেন। তিনি চিটাগং লেডিস ক্লাব-এ শখের বশতঃ মাঝে মাঝে খেলতেন। মিসেস হাসানের দুইজন আত্মীয় পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। উনারা চট্টগ্রামেই থাকতেন। উনারা হলেন মিসেস সালেহ সাহেবা ও মিসেস মাহমুদা সাহেবা। মিসেস হাসানের দায়িত্বকালে মিসেস সালেহ সাহেবা ও মিসেস মাহমুদা সাহেবার অক্লান্ত পরিশ্রমে লাজনা ইমাইল্লাহর কর্মতৎপরতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। যেমন তবলীগের ক্ষেত্রে।

১৯৫৩-১৯৫৪ সালের কথাই ধরা যাক, তখন মৌলানা এজাজ আহমদ সাহেব চট্টগ্রামের মোবাল্লিগ ছিলেন। উনি যে বাসায় থাকতেন সেটিও একটি বেড়ার ঘর ছিল। শুক্রবার দিন জুমার নামাযের সময় উনার স্ত্রী ঘরের সব জিনিস একদিকে সরিয়ে রাখতেন ও ঘরের মাঝখানে একটা সবুজ পর্দা দিয়ে দিতেন। সেই খালি জায়গায় লাজনা বোনেরা নামায আদায় করতেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে টিনের ঘরের মসজিদ ভেঙে বড় আকারে আধা পাকা টিনের মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তখন সদর মুরুব্বী হিসাবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা এ.কে.এম. মুহিবুল্লাহ সাহেব।

যখন সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব ১৯৫৬ সনে নতুন আধা পাকা টিনের মসজিদ নির্মাণ করলেন তখন রমযান মাসে কোরআনের দরস হতো। লাজনা বোনেরাও দরসে আসতেন। উর্দূতে দরস হতো। দরসের শেষে ইফতারের ব্যবস্থা থাকতো। সেই ব্যবস্থাপনা মসজিদ থেকে হতো না। লাজনা বোনেরা সবাই যার যার বাসা থেকে ইফতার তৈরী করে আনতেন। যে যতটুকু পারে কোন রকম বাধ্যবাধকতা ছিল না। ইফতারের সময় যার যার নিজের ইফতার বের করে দিতেন এবং সেই ইফতার থেকে পুরুষদের জন্য আলাদা করে সাজিয়ে পাঠানো হতো। খাকসারের কাজ ছিল বাসা থেকে মুড়ি নিয়ে যাওয়া। আনন্দঘন পরিবেশে দরসের পরে সবাই মিলে একসাথে ইফতার করা এটা সত্যিই আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার একটা বন্ধন।

অতঃপর মিসেস হামিদা বেগম সাহেবা ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী। স্বামী ডা. আব্দুল হামিদ টি.কিউ.এ পূর্ব পাকিস্তান ইষ্টার্ন রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার হিসাবে চট্টগ্রামে কর্মরত। মিসেস হামিদা বেগম সাহেবা ভাল নযম জানতেন এবং লাজনা বোনদের নযম শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তিনি খুব জনদরদী ছিলেন এবং আন্তরিকতার সাথে জামা'তের খেদমত করেছেন। তাঁর স্নেহ মমতার কথা অনেকে স্মরণ করেন।

ষাট দশকের একজন নিবেদিত প্রাণ যার কথা না বললেই নয়– তিনি হলেন মাহমুদা সাদী সাহেবা। মুসলেহ উদ্দীন সাদী সাহেব ফিলিপস কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তার সহধর্মিণী মাহমুদা সাদী সাহেবা। যদিও তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট ছিলেন না তবুও তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর এক নিরলস কর্মী হিসেবে জামা'তের খেদমত করেছেন। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনকে তালিম তরবীয়্যত প্রদানে অনেক গতিশীল করে তোলেন। তাই তার ইন্তেকালের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর যিকরে খায়ের করেন, গায়েবে জানাযা পড়ান। ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখ ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুসলেহ উদ্দিন সাদী সাহেব মাওলানা আব্দুর রহীম দর্দ সাহেবের ভাই ছিলেন। যিনি ফযল মসজিদের ইমাম হিসাবে কাজ করছেন। মাহমুদা সাদীর এক পুত্র জালাল উদ্দিন আকবর সাহেব যিনি নায়েব সেক্রেটারী যিয়াফত হিসাবে যুক্তরাজ্যে কাজ করছেন। মরহুমার খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি দোয়াগো, কৃতজ্ঞা এবং ধৈর্য্যশীল ছিলেন। তবলীগে গভীর আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তা'লা তার মর্যাদা উন্নত করুন। তার পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

ষাট দশকে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর অগ্রগতির অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রাখতে ১৯৬৪ সালে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন রাবেয়া রহিম সাহেবা। তাঁর পিতার নাম হাজী আব্দুস সাত্তার মোমেন এবং স্বামী আব্দুর রহীম ইউনুস। এ পূণ্যবতী মহিলা পিতার সাথে ১৯৩৪ সালে বয়আত করে জামা'তভূক্ত হন। ভারত বিভক্তির পর স্বামীর সাথে ভারত থেকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন।

মিসেস রাবেয়া রহিম সাহেবার কাজের দূরদর্শিতায় তিনি জামা'তের দায়িত্ব বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন। তিনি ১৯৬৪ থেকে

১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি আহমদী মহিলাদের লাশ ধোয়ানোর সমস্যা উপলব্ধি করে একটি টিম গঠন করেন। সেই টিমে ১০/১২ জন সদস্য ছিলেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের মধ্যে একজন খাজা সাহেবের বড় মেয়ে সৈয়দা আমাতুল মজিদ সাহেবা (ছুটি আপা)। রাবেয়া রহিম সাহেবার শেষের দিকের সময় থেকে গঠনতন্ত্র শুরু হয়। তিনি আমেলা সভা, সাধারণ সভা, বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় এবং বার্ষিক ইজতেমার অনুষ্ঠান করেন। তার উদ্যোগে ১৯৭০ সালে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়।

উনার দায়িত্বকালে একবার কেন্দ্র থেকে (রাবওয়া) সিলেবাস দেওয়া হল লাজনা বোনদের সবাইকে সূরা বাকারার ১৭ আয়াত মুখস্ত করতে হবে। প্রেসিডেন্ট সাহেবা লাজনা বোনদের জোর তাগিদ দেন ১৭ আয়াত মুখস্ত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট সাহেবা নিজে এক আয়াত করে পড়া দিতেন ও শিখাতেন। এভাবে আমরা ১৭ আয়াত শিখেছি যা আমাদের মনে এখনও গেঁথে আছে।

উনার দায়িত্বকালে প্রথম দিকে ইজতেমা হত প্রথম প্রেসিডেন্ট সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার বাড়ীর পিছনে খালি জায়গায় বড় বড় গাছের ছায়াতলে। ইজতেমার রান্নাবান্না সব বাড়ীর ভিতরে চুলা বানিয়ে খড়ি দিয়ে করা হত। লাজনার বোনেরা নিজেরাই উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে রান্না করতো। সেই আনন্দঘন ইজতেমার মধ্যে আমাদের লাজনা বোনেরা পরিবেশন করতো মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেবের লেখা নযম 'কেন ওরে ইসলাম আখিঁ কোণে তোর জল' আরেকটা নযম ছিল হযরত মসীহ মাউদ (আ.) এর 'উওঁ পেশ হুয়া হামারা'। তখন বাঙালীদের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়ার মতো ছিলেন মুখতার বানু সাহেবা ও জোহরা বেগম সাহেবা।

প্রেসিডেন্ট রাবেয়া রহিমের সময় থেকে নোমায়েশের প্রচলন হয়। উনি খুব ভাল সেলাই জানতেন। লাজনা ও নাসেরাতদের সেলাই শিখানোর ব্যাপারে খুব জোড় দিতেন। খুব সম্ভবত লাজনাদের পক্ষ থেকেই কাপড় দেওয়া হতো। লাজনা বোনেরা কে কী সেলাই করবে উনি দেখিয়ে দিতেন। ডিজাইন সব প্রেসিডেন্ট সাহেবা করে দিতেন। কেউ শাড়ীতে এম্ব্রয়ডারী, কেউ কুশন কভার আবার কেউবা কুরুশের তৈরী জিনিস তৈরী করতো। সেলাই করার পর সব জমা নিতেন এবং রাবওয়ার সালানা জলসায় কোন বোন জলসায় গেলে তাঁর সাথে জিনিসগুলি দিয়ে দিতেন এবং জলসা শেষে নোমায়েশে সেই জিনিসগুলি বিক্রি করে বিক্রিত টাকা লাজনার খাতে জমা হতো। আমাদের ইজতেমাতেও কিছু কিছু জিনিস বিক্রি হতো। মনে পড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে সেই নোমায়েশে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম ১ম স্থান অধিকার করেছিল।

ষাট দশকের পর সত্তর দশকের দিকে তাকালে দেখা যাবে সূর্য ওঠেছে পূর্ব দিগন্তে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানে ১৯৭১ সাল। অবাঙালী আহমদী পরিবারগুলি পাকিস্তান চলে গেলেন। তখন মুখতার বানু সাহেবা বাঙালি বোনদের নিয়ে লাজনা ইমাইল্লাহর সংগঠন গুছিয়ে তোলেন। তিনি প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের পুত্রবধূ এবং চট্টগ্রাম জামা'তের দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট ও আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়ার) সহধর্মিণী। স্বামীর শিক্ষায় তিনি জামা'তের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। প্রায় বছরই রাবওয়ার জলসায় যোগদান করেছেন। ঢাকা কিংবা বিদেশ থেকে জামা'তের প্রতিনিধি চট্টগ্রাম আসলে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা তিনি করতেন। মুখতার বানু সাহেবা ১৯৭১ থেকে ১৯৯১ সাল লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিরলসভাবে পালন করেছেন।

১৯৭১ সালে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর নতুন আমেলা গঠনের মাধ্যমে লাজনার কর্মতৎপরতা গতিশীল করা হয়। উনার সময় থেকেই বার্ষিক ইজতেমা জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ৩য় বার্ষিক ইজতেমা জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামা'তের অধিক সংখ্যক লাজনা ও নাসেরাত অংশ গ্রহণ করেন। মুখতার বানু সাহেবা আরো দুইবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। উনার সময় থেকে হালকার প্রচলন হয়। পরবর্তীতে মসজিদ সংলগ্ন লাজনাদের জন্য একটি রুম বানানো হয়। যাতে করে লাজনা বোনেরা তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে। প্রথম দিকে হালকা মিটিং লাজনা বোনদের বাসায় বাসায় হতো। পরে আশির দশকে লাজনা ইমাইল্লাহর জন্য যে বর্ধিত অংশে রুম বানানো হয়েছিল সেখানে মিটিং হত। উনার সময় বনভোজনেরও প্রচলন হয়। বনভোজন প্রেসিডেন্ট সাহেবার বাসায় হত। উনার দায়িত্বকালে ও লাজনা ও নাসেরাতদের সেলাইয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সেই সময় সেলাই ও রান্নার প্রতিযোগিতা হত। যার রান্না ভাল হতো তাকে পুরস্কৃত করা হত। এভাবে লাজনা বোনদের কাজে উৎসাহিত করা হত। সত্তর দশকে মুখতার বানুর দায়িত্বকালে মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের মেয়ে আয়েশা হক সাহেবা চট্টগ্রামে ছিলেন। রমযান মাসে তিনি সেই আধা পাকা টিনের মসজিদে লাজনাদের কোরআনের দরস দিতেন। এতে অনেক লাজনা বোন উপস্থিত থাকত। মাঝে মধ্যে মুখতার বানু সাহেবাও দরস দিতেন।

আশির দশকে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর এক আলোকিত নাম প্রেসিডেন্ট জোহরা বেগম সাহেবা তাঁর স্বামী চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাক্তন আমীর জনাব নূর উদ্দিন আহমদ। জোহরা বেগম সাহেবা ডা. খাস্তগীর স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। পরে এ বিদ্যানুরাগী মহিলা নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষকতায় তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। ফলে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে তিনি ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। আমরা চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ প্রেসিডেন্ট জোহরা বেগম সাহেবার জন্য গর্ববোধ করি। তিনি

খাকসারের ও শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল শিক্ষা ও দক্ষতার সাথে প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায়ের উপর গুরুত্ব দেন। উনার চেষ্টার ফলে বাজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় বেড়ে যায়। তিনি নিজেও তবলীগ করতেন এবং তবলীগের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন এবং তবলীগের ব্যাপারে অন্যকেও সাহায্য করতেন। তাছাড়া লাজনার সব কার্যক্রম যথাযথভাবে পালিত হয়।

প্রেসিডেন্ট জোহরা বেগম সাহেবা গত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো লাজনার হাল ধরেন মুখতার বানু সাহেবা। ইতিপূর্বে দীর্ঘ ২০ বছর চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন এবং লাজনার কার্যক্রমের ধারা বজায় রাখেন। মুখতার বানু সাহেবা দীর্ঘ ২০/২২ বছর নিরলস কর্মবীর হিসাবে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ পরিচালনা করে গেছেন।

অবশেষে নব্বই দশকে সম্পর্কিত ইসরাত জাহান সাহেবার উপর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয়। খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। ইসরাত জাহান সম্পর্কে খাকসারের 'জা' এবং বাল্যবন্ধু। একই পরিবারে আমাদের বিয়ে হয়। তিনি ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল লাজনা অঙ্গ সংগঠন পরিচালনায় অবদান রাখেন। তাঁর উদ্যোগে লাজনার সার্বিক কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়। উনার নেক কর্মদক্ষতার কারণেই আল্লাহ তা'লা তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সদরের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল সদরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্বামী বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ এর পৌত্র সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ।

১৯৯৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পান আমাতুল কাইয়ূম সাহেবা। তিনি বর্তমানে এম.টি.এর বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর হিসাবে নিয়োজিত আছেন। নাসিরা আক্তার সাহেবা ২০০০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের নেতৃত্বে খেদমত করেছেন।

নাজমা রহমান দীপা ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে নিবেদিত।

লাজনা ইমাইল্লাহর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সাহেবা। তিনি ২০০৫ সালে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৬ সালে নির্বাচনের পর স্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন ২০১৩ সাল পর্যন্ত। তার পিতার নাম আলাউদ্দিন আহমদ ও মাতা রাজিয়া আখতার। তাঁর স্বামী জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম এর বর্তমান জেলা নাযেম। প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী। তাঁর সময়ে লাজনার সার্বিক কর্মকান্ড অনেক বৃদ্ধি পায়। উনার দায়িত্বকালে নাসেরাত দিবস ও ঈদ পূনর্মিলনী ইত্যাদির প্রচলন হয়। সকলের মাঝে হৃদ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনভোজনের আয়োজন করেন। আগেও বনভোজন হয়েছে তবে সেটা মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিতরে। উনার সময় দেখেছি বাইরে পিকনিক স্পটে পিকনিকের ব্যবস্থা করতেন। বনভোজনে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা হতো এবং ফলাফলের মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হতো।

মানবসেবা উনার অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুখে দুঃখে মানুষের পাশে থাকা তাছাড়া কোন লাজনা বোনের অসুস্থতা বা বিপদের কথা শুনলে সবার আগে রওশন আরা আহমদ ছুটে যান। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, খাওয়া পাঠানো, বিপদে পাশে থাকা ইত্যাদি গুণগুলি লক্ষণীয়। তাছাড়া উনার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে সবসময় লাজনা বোনদের খোঁজ খবর নেওয়া। উনি একজন ভালো বক্তাও বটে। বর্তমানে ২০১৯ থেকে রওশন আরা আহমদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ছিলেন নাঈমা বুশরা সাহেবা। তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের দৌহিত্রী এবং মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সুযোগ্য কন্যা। শৈশব থেকে জামা'তী তালিম ও তরবীয়্যত লাভে যে জ্ঞান অর্জন করেন তা প্রতিফলনে লাজনা সংগঠন পরিচালনা করেছেন। তিনি তবলীগের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন। উনার দায়িত্বকালে অনেক বোন বয়আত গ্রহণ করে এই সিলসিলায় দাখিল হন। লাজনা বোনদের বিপদে আপদে অসুস্থতায় তাদের পাশে থাকা ইত্যাদি গুণগুলি লক্ষণীয়। উনার দায়িত্বকালে নাসেরাত দিবস, বার্ষিক ইজতেমা ও বনভোজন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হতো। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর জেলা সদর ও সম্মানিত সদস্যা।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর আরেকজন নিবেদিত প্রাণ মিসেস নূর সৈয়দ (আছিয়া খালা)। তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর একজন কর্মঠ সেবক ছিলেন। তবলীগ করতে পছন্দ করতেন। তিনি একজন দোয়াগো মানুষ ছিলেন। প্রত্যেক রমযানে উনি ইতেকাফে বসতেন। খাকসারের মনে আছে আমি মাঝে মাঝে বাসা থেকে উনার জন্য খাওয়া নিয়ে যেতাম। খাকসারের পরিবারের সাথে উনার একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত অবাঙালি আহমদী ভ্রাতা/ভগ্নিদের অবদান আমাদের কাছে অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সর্ব প্রথমে যাঁর নাম বলতেই হয় তিনি হলেন মোহতরম জনাব সাদী সাহেব, মিনহাজ সাহেব, মোহতরম এস এম হাসান সাহেব, মোহতরম আব্দুল হামিদ সাহেব (CMO)-Rly, নেভীর কমোডোর আর.ইউ বাজওয়া সাহেব, মোহতরম ইউসুফ সাহেব তিনি (বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহর সাবেক সদর মরহুমা ইশরাত জাহান সাহেবার আব্বা)। মোহতরম নিজাম সাহেব তিনি (হলেন আমাদের লাজনা সদস্যা মোহতরমা

দিবা হাসানের আব্বা)। নিজাম সাহেবের বাসা প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে ছিল। উনার বাসায় প্রায়শ তবলীগি সভা হতো। মোহতরম আব্দুর রহিম ইউনুস সাহেব, মোহতরম ড. শফিক সাইগাল সাহেব, মোহতরম আনোয়ার মালিক সাহেব, মোহতরম আব্দুস সাত্তার সাহেব, মোহতরম আনোয়ার আহমদ সাহেব, মোহতরম গোলাম নবী সাহেব, মোহতরম মোহাম্মদ শফি সাহেব, মোহতরম মোহাম্মদ আতিশ সাহেব, মোহতরম জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব (কায়েদ খোদ্দাম), মেজর ইকবাল সাহেব, মোহতরম ইসহাক কোরেশী সাহেব প্রমুখ উল্লেখ্য। তাঁরা সবাই জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

তখন চট্টগ্রাম জামা'তের সদর মোবাল্লিগ বগুড়া হতে বদলী হয়ে চট্টগ্রাম জামা'তের প্রথম সদর মোবাল্লেগ হিসেবে আসেন মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ১৯৫০ সালে। পরবর্তীতে আমাদের জামা'তের আরও অনেক প্রখ্যাত মোবাল্লেগগণ চট্টগ্রাম জামা'তের দায়িত্ব পালন করেন। পর্যাক্রমে তাদের নাম নিম্নরূপ:

মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আজমল শাহেদ সাহেব, মাওলানা ফারুক সাহেব, মাওলানা রাজা নাসির সাহেব, মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকি সাহেব আরও অনেকে। বর্তমানে মুরুব্বী সিলসিলাহ মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সাহেব, মাওলানা নাভিদুর রহমান সাহেব এবং মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য বিখ্যাত (নাযমুল মাহদী) রচয়িতা মরহুম মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেবও চট্টগ্রাম জামা'তে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেছেন।

বলাবাহুল্য, চট্টগ্রাম জামা'তে মসজিদ নির্মাণ আল্লাহ তা'লার খাস ফযল ও রহমত। দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারা হলেন–

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী– উপদেষ্টা
প্রকৌশল মীর শওকত আলী– উপদেষ্টা
জনাব মেজর (অব.) ডা. আসাদুজ্জামান– চেয়ারম্যান
জনাব মির্যা মোহাম্মদ আলী– আহ্বায়ক
জনাব মোজাম্মেল হক– সদস্য সচীব
জনাব মোর্শেদ আলম– হিসাব রক্ষক

এই তহবিল কমিটির অনেক সদস্যও ছিলেন। তাছাড়াও আমাদের সদর মুরুব্বী ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আধ্যাত্মিকভাবে সবাইকে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ২৯শে এপ্রিল ১৯৯৪ সালে মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে একতালার কাজ প্রায় শেষ হয়। তখন বাংলাদেশ জামা'তের সালানা জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়া থেকে আগত হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি চৌধুরী মোবারক মোসলেহ উদ্দিন সাহেব ১২ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখ জুমুআর নামায পড়ানোর মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধন করেন। অতঃপর দো'তলার কাজ শেষ হলে ১৮ এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিক সাহে সদর মুরুব্বী কর্তৃক ঈদুল আযহার নামায পড়ানোর মাধ্যমে মূল মসজিদের কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর নামকরণ করেন "মসজিদ বায়তুল বাসেত"।

তাঁদের এই নিরলস পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর আরেক নিবেদিত প্রাণ ছিলেন মিসেস আহমাদুর রহমান। আহমাদুর রহমান সাহেবরা দুই ভাই ছিলেন। মাহমুদুর রহমান ও আহমাদুর রহমান সাহেব উনারা উভয় পরিবারই জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আহমাদুর রহমান সাহেব বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকুরী করতেন। উনারা আগ্রাবাদ থাকতেন। প্রত্যেক শুক্রবার খালাম্মা বাচ্চাদের নিয়ে নামাযের অনেক আগেই চলে আসতেন। খাকসারদের বাড়ীর উঠানে বড় একটা লিচু গাছ ছিল। সেই গাছের ছায়ায় বসে সবাই গল্প ও কথা বার্তা বলত। তারপর আযানের পর সবাই মিলে মসজিদে যেতাম। চকবাজার থেকে আগ্রাবাদের দূরত্ব অনেক। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার কারণেই এত দূর থেকে খালাম্মা চলে আসতেন। সত্যিকার অর্থে সেই সময় আহমদীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভালবাসার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সেটা ছিল আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ।

চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহর বর্তমান প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সাহেবা। তিনি পূর্বেও দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। অক্টোবর ২০১৯ থেকে দ্বিতীয়বার দায়িত্বে সমাসীন হন।

চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টগণ যেভাবে লাজনার কার্যক্রমের অগ্রগতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন সেই সোনালী যুগের সোনালী দিনের পূণ্যবতী বুযুর্গগণকে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

তাছাড়া যেসব লাজনার বোনেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর কার্যক্রমের অগ্রগতির অগ্রযাত্রাকে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ গতিশীল করতে পেরেছেন। সেই সব সম্মানিত বোনদের চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর সব চাইতে অনুকরণীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতার বন্ধন।

আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমত, বরকত ও আশীষ দ্বারা কল্যাণময় হয়ে উঠুক। এই দোয়া করি।

[তথ্যসূত্র: পুস্তক চট্টগ্রামে আহমদীয়াত,
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল]

আমার বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্যলিপি

তাহেরা মির্যা

আমি তাহেরা মির্যা। আমরা সাত ভাইবোন। আমি সবার ছোট। তার মধ্যে আমরা দুই বোন এক ভাই আহমদী (আলহামদুলিল্লাহ)। স্বাভাবিকভাবে ছোট বলে আদর আহ্লাদে বড় হয়েছি। মা অতি ছোট বেলায় মারা যান। তাই বাবা ও ভাই-বোন, মা এর অভাব বুঝতে দেয়নি। বড় হয়েছি আদর আর ভালোবাসায়। জীবনকে উপভোগ করেছি রাজকীয়ভাবে। এটা বলার অর্থ হলো আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছি। কিন্তু আমার চাওয়া পাওয়া ছিল সবার ঊর্ধ্বে। ভালো স্কুল ভালো কলেজে (চট্টগ্রাম গার্লস কলেজ, নাসিরাবাদ) শিক্ষার সৌভাগ্য হয়েছিল। পড়া শেষ করে অতঃপর বিয়ে হয় ১৯৭১ সনে ১২-ই ফেব্রুয়ারি। বিয়ের পর ঢাকায় চলে যাই। ফিরে আসি অক্টোবর মাসে। এসে স্বামী মির্যা মোহাম্মদ আলী সহ উঠলাম ফরিদ সাহেবের বাসায়। উনি ছিলেন আমার বোন আয়েশা বেগমের স্বামী। তখন থেকে শুরু হলো আমার সৌভাগ্যের সূচনা। তার বাসায় থাকা অবস্থায় আমাকে বেশ কয়েকবার মসজিদে নিয়ে আসেন। সেখানে এসে দেখলাম শ্রদ্ধেয়া জোহরা আপাকে। আমি যখন গুল-এ-জার বেগম স্কুলে পড়তাম উনি তখন সেই স্কুলের হেড মিসট্রেস ছিলেন। সে এক বিস্ময়কর মহিলা। ছোট খাটো কালো মিষ্টি এক মহিলা। যিনি রুম থেকে বেরোলেই সবাই যে যেদিকে পারে লুকিয়ে যেত। এমন এক পারসোনালিটি ছিলো তার মধ্যে। সেজন্য সবাই তাকে আড়ালে কালো প্যানথার বলত। আরো দেখা হলো রশুর সঙ্গে। নাজির সাহেবের স্ত্রী সেও গার্লস কলেজে

পড়তো। আমার এক বছরের জুনিয়র। জোহরা আপাকে দেখে খুব উৎসাহিত হই। তারপর আমার স্বামী মোহাম্মদ আলী সাহেব ও আমার বড় ভাই আমজাদ হোসেন সাহেব মসজিদে আসতে লাগলো। আমার মতে তারা ছিলেন অনেক জ্ঞানী। সেই জ্ঞানী ব্যক্তিদ্বয় যেখানে এলেন, সে তো ভুল হতে পারে না। মোহাম্মদ আলী সাহেবের জ্ঞানের কথা সবাই জানেন। হেন বিষয় নেই তিনি জানতেন না। তিনি যখন ১৯৭৪ সনে বয়আত করলেন। শুরু হয়ে গেল মোখালিফাত, তার দুই বোন অসম্ভব ভাবে বিরোধীতা করতে লাগলো।

তারা ছিলেন তাদের বড় ভাইয়ের (অর্থাৎ, মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব-এর) অন্ধ ভক্ত ও বিশ্বাসী। যদি বলত সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে ওরা বলত, "হ্যাঁ তো পেয়ারু ভাই বলেছে তো"। পেয়ারু ভাই যেটা বলে তার চেয়ে সত্যি কিছুই হতে পারে না। পেয়ারু ছিল মোহাম্মদ আলী সাহেবের ডাক নাম। দুই বোনই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী (M.A) একজন বাংলা আর একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। এক ভাই শওকত আলী সে থাকতো বিদেশে লন্ডনে। তারা বলতো, "পেয়ারু ভাই তুমি হিন্দু, খ্রিষ্টান যেটা চাও হও কিন্তু কাদিয়ানী ছাড়"। এটা শুনে আমার মনে হলো হযরত মোহাম্মদ (সা.) যখন আদিষ্ট হন সবাইকে ডেকে বললেন "যদি বলি পাহাড়ের ওপাশে এক দল শত্রুরা অবস্থান করছে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তখন মক্কাবাসী এক সাথে বলে উঠলো হ্যাঁ।

তখন হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেন, আর যদি বলি আল্লাহ এক ও তিনি আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন তখন কি তোমরা তা মেনে নিবে? সেই সময় অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলই তাকে পরিত্যাগ করল এবং তাকে মিথ্যাবাদী বললো। ঠিক মসীহ মাহদী (আ.)-এর বেলাতেও তাই হয়েছিল। আমার ননদদের বিরোধীতা আমার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে দিল। চেষ্টা চালিয়ে গেলাম তাদের ফেরাতে; দেখা করলাম মাসুদা আপার সঙ্গে। উনি যে কতভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের ফেরাতে। এমনকি উনি একবার এসেও ছিলেন তাদের বাসায়। তারাও খুব যত্ন করে আপ্যায়ন করলেন। পরে বললেন "দেখ ভাবী তোমার কোন কাদিয়ানী বন্ধু আমাদের বাসায় আসুক আমরা এটা চাই না। আপা আরো একবার আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আনিনি। আমি চাই নাই তাঁর মতো একজন গুণী সম্মানিত মহিলার অপমান হোক। আমি কিন্তু তখনও বয়আত গ্রহণ করিনি। উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিয়েই বয়আত করবো। শত চেষ্টা বৃথা হলো। হাল ছাড়িনি। তাদের বাসায় যেতাম, থাকতাম; তবে মনের কোনো আশা যে ছিলো না তা-না। এর মধ্যে অনেকটা বছর কেটে গেলো। আমার সন্তান মুনতাহির মির্যা, রাহনুমা মির্যা এবং শিমরান মির্যাঁর জন্ম হলো। ১৯৭৯ সালে ফরিদ সাহেবের প্রস্তাবে আমরা রাবওয়ায় যাওয়ার প্ল্যান করি। যেই কথা, সেই কাজ। ফালু মিয়া, মুক্তার বানু, আতা ইলাহী, ফরিদ ভাই, আমার বোন আয়েশা বেগম ও আমরা দুজন মোট ৭ জনের কাফেলা রওনা হলাম। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ২২শে ডিসেম্বর রওনা হলাম। করাচিতে নামলাম সেখানে আমার ও ফরিদ ভাইয়ের গায়ের আহমদী বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আহমদী খোদ্দামরাও এসেছিলেন। উঠলাম মসজিদের তিন তলায়। রেস্ট হাউজে এ সে কি মেহমানদারী আতিথেয়তার আর খাওয়ার বৃষ্টি। পরদিন ট্রেনে রওনা দিলাম করাচি থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে। আমার জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ, মজাই পাচ্ছিলাম। যেখানেই ট্রেন থামে খাঁন সাহেব কিছু না কিছু খাওয়ার কিনে আনতেন। সবার জন্য (ফালু মিয়াকে আমরা খান সাহেব বলতাম)। লাহোর হয়ে বাসে রাবোয়ার পথ অনেক দূর ও কষ্টকর। কিন্তু কষ্ট মনে হয়নি। খুব উপভোগ করছিলাম। অবশেষে পৌঁছালাম রাবোয়ায়। পরদিন জলসা। জলসার ২য় দিন ছেলেরা দেখা করলো হুযূরের সঙ্গে। মেয়েদের দেখা হয়নি। আমি শুধু দেখেছিলাম জলসা গাহে। খুব মনের মধ্যে আকুতি কীভাবে হুযূরের সঙ্গে দেখা করবো বললাম খাঁন সাহেবকে। উনার সঙ্গে আবার হুযূরের সঙ্গে মনে হলো আলাদা সম্পর্ক; যেই বলা সেই কাজ। এসে বললেন কাল দেখা করব তোমাকে নিয়ে যাব। আমি তো অবাক এটা কী করে হয়? তারপর দিন রাত ৯টায় আমি, মোহাম্মদ আলী সাহেব,আয়েশা বেগম, খান সাহেব ও মোক্তার বানু আমরা গেলাম ও সাথে ফরিদ সাহেব। এরপর লিখতে পারছিনা মনের কথা; সেটা কেবল অনুভব করা যায়। হুযূর আমাকে অনুমতি দিয়েছেন দেখা করতে। হাত-পা কাঁপছিল।

যাই হোক, ১০ মিনিট সময় মনে হলো ২০ মিনিট নয় কেন? চলে আসার সময় শুধু বললাম, হুযূর দোয়া করবেন। রুমে এসে খাঁন সাহেবকে বললাম আমি এক্ষুনি বয়আত করবো। আমি বুঝতে পারিনি, জলসা গাহে বয়আত হয়। বয়আত করেছি হুযূরের হাতে। তখন বাংলা অনুবাদ ছিলো না। খান সাহেবের কাছে বয়আত ফর্ম সবসময় সাথে থাকতো। তাই রুমে এসে লিখিতভাবে আবার বয়আত করেছি (২৯-১২-১৯৭৯)। বয়আত করার পর লোভটা বেড়ে গেল। খান সাহেবকে বললাম আমরা যাওয়ার আগে হুযূরের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারবো? মনে হলো উনাকে মুশকিলে ফেলে দিলাম। হুযূরের কাছে এবং পাকিস্তানের জামা'তগুলোতে খান সাহেবের আলাদা একটা Status ছিল। সেটা কাজে লাগিয়ে পর দিন আমাকে আর মোহাম্মদ আলী সাহেবকে নিয়ে গেলেন। বললেন শুধু ২ মিনিট। তাই সই। গেলাম রুমের ভিতর। আরো কতজন ছিলো। হুযূর একটুও বিরক্তিবোধ করলেন না। বসতে

বললেন কখন যাবো (বাংলাদেশে) জিজ্ঞাসা করলেন। দোয়া করলেন। আমাদের নিয়ে চলে আসার আগের দিন। মুক্তার বানু সাহেবা বললেন, "চলেন ছোটি আপার সঙ্গে দেখা করে আসি"। ছোটি আপা অর্থাৎ মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছোট মেয়ে তাঁর পুরো নাম হলো আমাতুল হাফিস সাহেবা। আমরা প্রায় ১ ঘণ্টার মতো ছিলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হলো। উনার খুব ইচ্ছা বাংলাদেশে আসার। সাহস করে বললাম আপনি এলে অবশ্যই আমার বাসায় থাকবেন এবং সৌভাগ্যবান মনে করবো নিজেকে। উনিও বললেন "অবশ্যই যদি যাওয়া হয় আমি আপনার সঙ্গে থাকবো ইনশাল্লাহ"। যখন চলে আসছিলাম কি যে কষ্ট হচ্ছিল বুঝাতে পারবো না। খলীফার সঙ্গে আর ছোটি আপার সঙ্গে আরো অনেক বুজুরগণদের ছেড়ে চলে আসা অনেক কষ্টের। যাই হোক ফিরে পরদিন করাচি। আরো ২ দিন ছিলাম করাচিতে। ঢাকায় ফিরে মনটা খারাপের মধ্যেও পরিপূর্ণ আনন্দবোধ করছিলাম ভাবলাম কয়েকজন সৌভাগ্যময়ীর মধ্যে আমিও একজন যার জীবনে ঐ ১৬টা দিন আজীবন মনে রাখার মতো।

সুন্দর খুশী ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে ৭০ এর দশক শেষ হলো। ৮০ দশক শুরু হলো আমার পরীক্ষার বছর। মোহাম্মদ আলী সাহেব অসুস্থ হয়ে গেলেন। কেউ বলেন ক্যান্সার কেউ বলেন এটা, ওটা যাই হোক। মুখের ভিতরে টিউমার অপারেশন দরকার। ঢাকায় টেস্ট করে বললো অনেক সিরিয়াস অপারেশন তখন খলীফা সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) মারা গেছেন। নতুন খলীফা হলেন খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)। খলীফা রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বাংলাদেশীদের উপর সদয় ছিলেন। সদর মুরুব্বী সালেহ আহমদ সাহেব তাঁর কাছে চিঠি লিখতে বললেন। লিখলাম তিনি নির্দেশ দিলেন অপারেশন করতে। ঢাকা জামা'ত থেকে বলা হলো ঢাকা মেডিকেলে অপারেশন করতে। কিন্তু তখন এত উন্নত ছিল না মুখের ভিতরে অপারেশন করা। যাই হোক যোগাযোগ করলাম ইন্ডিয়াতে। ওখানে আমার খালাতো বোনের জামাই ছিলেন এম্বাসেডর রাশেদ আহমদ। তিনি দিনে দিনে ব্যবস্থা করে দিলেন কলকাতা উডল্যান্ড এ । নাই পাসপোর্ট নাই টাকা, বড় ভাই আমজাদ সাহেব সবে রিটায়ার করেছেন। তার সব টকা দিয়ে বললেন আল্লাহ ভরসা। ১৯৮৬ তে অপারেশন হলো। প্রায় ৪৫দিন থাকতে হলো ইন্ডিয়াতে। যখন আসলাম ফিরে দেখি তার সব ব্যবসাপাতি লুটের মতো করে শেষ। মির্যা সাহেবের কিছু করে খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। অতএব গ্রামের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, তাহলে বাচ্চাদের পড়ার কী হবে? এই চিন্তা করে স্কুলে জয়েন করলাম কোন রকমে চলছে সংসার। শুধু আল্লাহর কাছে চাইতাম আমাকে ধৈর্য্য দাও। আল্লাহ অপমানের হাত থেকে রক্ষা করো। ভাইবোনরা অনেক সাহায্য করেছে। তবুও তো আহমদীয়াত ছাড়িনি। দুই ছেলে ও এক মেয়ে সবাইকে মাস্টার্স পড়িয়েছি (আলহামদুলিল্লাহ)। অবশ্য এতে আমার ছেলেমেয়েদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই জন্য যে তাদের খাওয়া পড়ার কোন চাহিদা ছিল না। যাই দিতাম তাই খেত। স্কুলের অল্প বেতন আর কয়েকটা মাত্র স্টুডেন্ট পড়াতাম। ঘরে তাই দিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে মোহাম্মদ আলী সাহেবের মুখের ভিতরে অপারেশনের জায়গায় ইনফেকশন হলো। আবার যেত হলো ইন্ডিয়াতে। এবার কোন রকমে টাকা জোগার করলাম।

১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে উঠলাম আহমদীয়া মিশন হাউজে। গিয়ে দেখি মসজিদ ফাঁকা। কোথায়? প্রায় সবাই চলে গেছে কাদিয়ান জলসায়। হুযূর আসার কথা। শুনে আমরা দুজনে উৎফুল্ল হয়ে গেলাম যাওয়ার জন্য, কি করে যাবো কাফেলার ট্রেন আগের দিন চলে গেছে। আমরা দুজনে চেষ্টা করেও পেলাম না টিকেট। এক আহমদী লোক বললেন চলেন রেডি হয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখি কিছু করা যায় নাকি। গেলাম তার সঙ্গে। আলহামদুলিল্লাহ পেলাম লাস্ট দুটো টিকেট। কাদিয়ান পৌঁছে দেখি শ্রদ্ধেয়া মাসুদা আপা, কুদসিয়া আপা আরো অনেক চেনা, রাণী (সিদ্দিক রহীম সাহেব এর স্ত্রী) যিনি বর্তমানে ইউএসএতে আছেন। যাই হোক সেদিন কুদসিয়া আপা বললেন, "আপনি কি আমার সঙ্গে তাহাজ্জুদ পড়তে যাবেন? সকালের নামায পড়ে একবারেই আসবো"। কি যে ভাগ্য আমার! গেলাম। তাহাজ্জুদের পর ফজরের নামায পড়াবেন হুযূর। অর্থাৎ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), এটি শুনে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। পর পর তিনদিন তাঁর পিছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য হলো। ১ম দিন সকালের নামাযের পর দেখি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। প্রথমে বুঝিনি। বুঝতে একটু দেরী, হুযূর নামাযের পর বেহেশতি মাগবেরাতে যান। তাই যাওয়ার পথে সারিবদ্ধভাবে মেয়েরা দাড়িয়ে হুযূরকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়ে গেল। আমিও সৌভাগ্যের আংশিক ভাগিদার হয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ কুদসিয়া আপাকে। তিনি না ডাকলে আমার যাওয়া হতো না। হুযূরের পেছনে নামায পড়ার সৌভাগ্যও হতো না। আল্লাহ তা'লা তাঁকে বেহেস্ত নসীব করুন। জলসার ২য় দিন ১ম অধিবেশনে মেয়েদের জলসা গাহে আসেন হুযূর। তাকে কাছ থেকে দেখলাম। তাঁর বক্তৃতা শুনতে অসুবিধা হয়নি; তখন বাংলা তরজমা ছিলো যেখানে বাঙ্গালীরা বসে ছিলেন। হেডফোনের বাংলায় শোনার ব্যবস্থা ছিলো। এই ছিলো আমার দুই খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎকার এর সৌভাগ্য লিপি।

আমার জীবনের কিছু কথা

আমাতুল কুদ্দুস শাহানা

আমি আমাতুল কুদ্দুস শাহানা। আমার পিতা মওলানা আবুল খায়ের মুহিবুল্লাহ, মুরুব্বী সিলসিলা। আমার দাদা মাওলানা আব্দুল মান্নান। আমার আম্মা হাবিবা রাহাত। আল্লামা জিল্লুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলার বড় মেয়ে। আমার আম্মার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কিন্তু শিশুকালেই কাদিয়ান চলে যান। কাদিয়ানে পড়াশোনা করেছেন, তালীম-তরবীয়ত লাভ করেছেন। কাদিয়ানে থাকা অবস্থায়ই খলীফা সানী (রা.) এর বিশেষ নির্দেশে আব্বার সাথে আম্মার বিয়ে হয়। বিয়ের পরে তিনি চর দুঃখিয়া গ্রামের প্রথম আহমদী ছিলেন। আমার দাদাও অনেক বড় মওলানা ছিলেন। আমার দাদা যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন সেই মাদ্রাসায় আমার আব্বাও পড়াশোনা করেছেন। আমার দাদা আব্বাকে ইন্ডিয়াতে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন আরো বেশি পড়াশোনা করার জন্য। ইন্ডিয়াতে গিয়ে আব্বা শুনেছেন ইমাম মাহদী এসেছেন। আব্বা তখনই কাদিয়ানে গিয়ে খলীফা সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। আব্বা দেশে আসার পরে অনেক মুখালেফাত হয়েছে। আব্বার নিজের মামা আব্বাকে জবাই করতে এসেছিল। আব্বা অনেকবার মার খেয়েছেন।

নাটোরে একবার আব্বাকে অনেক মারধর করেছিল মোল্লারা। আমার আব্বাও সারাজীবন বিভিন্ন জামা'তে জামা'তেই থাকতেন। জামা'তে আগে কোন কোয়ার্টার ছিল না তাই আমরা নিজ গ্রামের বাড়ীতেই থাকতাম। আব্বাকে আমরা খুব কমই দেখেছি। আব্বাকে আমরা খুব ভয় পেতাম। আব্বার কাছে আসতাম না। আব্বা ডাকলে উনার সামনে আসতাম। আব্বা বলতেন তোমরা উর্দু লেখাপড়া শিখ আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বই পড়। কিশতিয়ে নূহ পড়। আমি একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ৮০টি বইয়ের নাম মুখস্ত করেছিলাম। আব্বা বাড়ি আসলে আমরা খুব খুশি হতাম। আব্বা বাড়ি আসলে ঘরে ভালো রান্না-বান্না হতো। আব্বা ভালো খাওয়ার সৌখিন ছিলেন। আমি ছোট বেলা থেকেই অনেক সময় নিয়ে নামায পড়তাম। তা দেখে আমার বান্ধবীরা খুব হাসতো আর ঠাট্টা করতো। আমার আব্বা বলতেন তোমরা ওকে নিয়ে হেসো না, ওর ভাগ্য ভালো হবে। আব্বার দোয়া আল্লাহ শুনেছেন।

আমার বিয়ে ভালো একজন মুরুব্বীর সাথে হয়েছে। আমার স্বামী একা আহমদী। উনার পিতা-মাতা, ভাই বোন কেউ আহমদী নন। তবে উনারা ভালো মানুষ। আমি শুধু হাই স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। আব্বা গ্রামে প্রথম আহমদী হওয়ার কারণে গ্রামে অনেক মুখালেফাত ছিল। তাই পড়াশোনা করতে পারিনি। আমার বিয়ের পরে আমি পাকিস্তানে চলে গেলাম। আমার স্বামীর কাছে। তখন উনার পোস্টিং ছিল ভাওয়ালপুর। সেখানে আমার প্রথম সংসার শুরু হলো। তখন ঘরে কোন আসবাবপত্র ছিল না। আমার স্বামীর বেতন মাত্র দেড়শ টাকা ছিল। চাঁদা দিয়ে মাত্র ১০০-১২০ টাকা পেতেন। ঘরে একটা চারপাই (দড়ির খাট) ছিল। দুটি বালিশ ছিল। ভাত খাওয়ার দুটি টিনের প্লেট ছিল। একটা গ্লাস ছিল পানি পান করার। একটা ভাত রান্না করার পাতিল ছিল। একটা কড়াই ছিল তরকারি রান্না করার। কিন্তু আমার মনে কোন দু:খ ছিল না। আফসোস ছিল না। যখন ভাওয়ালপুর গেলাম তখন সবাইকে আমাদের দাওয়াত করতেন। সবাই অনেক বড়লোক। সবার ঘরে দামি দামি জিনিস। একবার হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (পরবর্তী চতুর্থ খলীফা) ভাওয়ালপুর এসেছিলেন। আমি হুযূরের জন্য চা বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম। একদিন আমার সাহেব বললেন, শাহানা! মানুষের ঘরে জিনিসপত্র দেখে তুমি মন খারাপ কর না। তোমার নেকী নষ্ট হবে। তুমি একজন ওয়াকফে জিন্দেগী মুরুব্বীর বিবি, মুরুব্বীর মেয়ে, মুরুব্বীর বোন, মুরুব্বীর নাতনী। তোমাকে অনেক ধৈর্য্যের মোকাবিলা করতে হবে। আমার স্বামী আমাকে অনেক অনেক ভাল কথা শিখিয়েছেন। আমার সাহেব আমাকে প্রথম দিনই বলেছেন ফজরের নামায পড়ে, কোরআন তিলাওয়াত করে নাস্তা বানাতে। নামায না পড়ে নাস্তা বানালে উনার জন্য খাওয়া জায়েয হবে না। আমি পাকিস্তান যাওয়ার পরেই উনি আমাকে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় শামিল করেছেন। আমাকে কোরআন শরীফের প্রথম পারার অনুবাদ শিখিয়েছেন। এরপর আমার বড় মেয়ের জন্ম হলো। এরপর আর শেখা হয়নি।

পাকিস্তান যাওয়ার দুই মাস পর আমার সাহেব হুযূরের সাথে (খলীফা সালেস) মোলাকাত করতে আমাকে রাবওয়া নিয়ে গেলেন। হুযূর প্রথম দেখেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন পাকিস্তানে মন লেগেছে? আমাকে হুযূর সুন্দর একটা রুমাল উপহার দিয়েছিলেন। সেই রুমাল দিয়ে আমার বড় মেয়ে কুররাতুল আয়েন সাদিয়ার জন্মের পরই তার মাথায় বেঁধে দিয়েছি। তখন আমার ভাবী হাজেরা (মাহমুদ বাঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী) বললেন, শাহানা! তোমার মেয়ের ভাগ্য অনেক ভালো। জন্মের পরই হুযূরের রুমাল দিয়ে মাথা বেঁধে দিয়েছ। এরপর তিন মাস পর কুররাতুল আয়েন সাদিয়াকে নিয়ে হুযূরের সাথে

দেখা করতে গেলাম। তখন আমার মেয়ের কপালে টিপ দিয়েছিলাম যেটা শিশুদের কপালে দেওয়া হয়। হুযূর তা দেখে আমাকে বললেন, ছোট বাচ্চাদের কপালে টিপ, চোখে কাজল লাগাবেন না। এরপর কোনদিন আর বাচ্চাদের চোখে কাজল, কপালে টিপ দেই নি।

আল্লাহ তা'লার রহমতে আমার সাত ছেলেমেয়ে। চার মেয়ে তিন ছেলে। তিন ছেলেই ওয়াকফে জিন্দেগী। দুই ছেলে মুরুব্বী। বড় ছেলে এম.এস.সি পাশ করে ওয়াকফে জিন্দেগী করেছে। সে এখন সিয়েরা লিওনে জামা'তের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সাইন্স টিচার। মেঝ ছেলে ইনামুর রহমান নাসের কানাডা জামেয়া পাশ করে কানাডা জামা'তের মুরুব্বী হয়েছে। আমার বড় ছেলে লুৎফুর রহমান তাহের আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আম্মা! আমি ওয়াকফে জিন্দেগী করবো, আপনি কী বলেন? আমি বললাম তোমার ইচ্ছা। আমি তো চাই তোমরা সবাই জামা'তের খেদমত কর। জামা'তের কাজ কর। আমি দোয়া করি সারাজীবন আমার ছেলে মেয়ে জামা'তের কাজ করুক। আমি কোনদিন জামা'তের কাজ করিনি। রাবওয়াতে একবার আমাদের হালকার মিটিং হচ্ছিল। সবসময় আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে হালকা মিটিঙে যেতাম। আমার তখন চার ছেলে মেয়ে। মেঝো ছেলে ইনামুর রহমান মাত্র পাঁচ মাসের ছিল। আমাদের হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেবা বেগম ছোটি আপাকে বললেন (খলীফা সানীর স্ত্রী), ইমদাদুর রহমান সাহেবের বিবিকে আমি একটা কাজ দিতে চাই। যেমন আমাদের হালকার বাসায় বাসায় গিয়ে লাজনাদের চাঁদা উঠানো। তখন বেগম ছুটি আপা বললেন, বেচারীর চার বাচ্চাই ছোট ছোট। উনি বাচ্চা সামলাবেন , না ঘরের কাজ করবেন, না উনার সাহেবের খেয়াল রাখবেন। নাকি আপনাদের কাজ করবেন। রাবওয়াতে সবাই আমাদের খেয়াল রাখতেন। আমি সবসময় সব প্রোগ্রামে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেতাম। আমি সবসময় আমার স্বামীর, আমার বাচ্চাদের খেয়াল রেখেছি। ওরা যেন জামা'তের ভালো কাজ করতে পারে। খাওয়াদাওয়ার খেয়াল রেখেছি। বাচ্চাদের পড়াশোনার খেয়াল রেখেছি। এখন আমার চার মেয়ে তিন ছেলে সবাই জামা'তের কাজ করে। এখন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। পিতা-মাতা কষ্ট করলে সন্তানেরা অবশ্যই ভালো হয়। হযরত খলীফা সালেস (রাহে.) বলেছেন, বেশী শিক্ষিত হওয়া জরুরী না। ভালো একজন মা হওয়া জরুরী। আমার মনে হয় আমি ভাল মা হতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা পাকিস্তানেও অনেক জামা'তে ছিলাম। সেখানেও অনেক কষ্ট করেছি। পরে রাবওয়াতে আমার সাহেবের পোস্টিং হয়েছে। আমার সাহেব হযরত খলীফা রাবে (রাহে.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে প্রথমে ইনচার্জ বাংলাডেস্ক ছিলেন। রাবওয়া যাওয়ার পরে অনেক কিছু দেখেছি। হুযূরের সাথে বার বার দেখা করেছি। রাবওয়াতে আমার বড় ছেলে লুৎফুর রহমান তাহেরের জন্ম হয়। এরপর ফয়সালাবাদে দ্বিতীয় ছেলে ইনামুর রহমান নাসেরের জন্ম। আমার তৃতীয় মেয়ে হেবাতুল ওয়াদুদের জন্মও রাবওয়াতে। লুৎফুর রহমান ও হেবাতুল ওয়াদুদের জন্ম রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে।

খলীফা রাবে খলীফা হওয়ার আগে অনেকবার দেখা করেছি। হুযূর তখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন। উনার কাছে আমার বড় দুই মেয়েকে নিয়ে যেতাম। হুযূর ঔষধ দিতেন। আমার মেয়েদেরকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'বাঙ্গালীওঁকা পেট খারাপ রেহতা হ্যাঁয়।!' তখন হুযূরের বাসা থেকে তার গরুর দুধ আমাদেও বাসায় পাঠানো হতো। যতদিন রাবওয়া ছিলাম কয়েক বছর আমরা হুযূরের খামারের গরুর দুধ খেয়েছি।

আমার মেঝ মেয়ে আতিয়াতুল আযিযের জন্মও ভাওয়ালপুরের হয়েছিল। তার বিয়ে একজন ওয়াকফে জিন্দেগী মুরুব্বীর সাথে দিয়েছি।

যখন রাবওয়া ছিলাম তখন হুযূরের খানদানের সবার সাথে দেখা করেছি। বেগম সাহেবাদের সাথে অনেকবার দেখা করেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছোট মেয়ে হযরত আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবার সাথে বারবার দেখা করেছি। আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে মুরুব্বী সাহেব উনার সাথে দেখা করতে যেতেন। যখন উনার বাসায় যেতাম তখন আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা শরবত বানিয়ে প্রথমে উনি পান করতেন তারপর আমাকে দিয়ে বলতেন, তুমি পান কর, তোমার স্বামীকে পান করাও, বাচ্চাদেরকে পান করাও। এটাকে বলে তবারক।

পাকিস্তানে অনেক বড় বড় জলসা দেখেছি। সে কি আনন্দময় সময়। সারা রাববওয়া মানুষে গমগম। সব ঘরে ঘরে মেহমান। সবার ঘরে নীচে মেঝেতে বিছানা করা থাকতো। তারপরেও ঘরে জায়গা হতো না। আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে চলে যেতাম জলসাগাহে। তখন আমার চার বাচ্চা ছিল। জলসাগাহে লাজনারা কত সুন্দর করে বসে থাকতো। যখন হুযূরের বক্তৃতা হত তখন সবাই চুপচাপ বসে হুযূরের বক্তৃতা শুনতো। তখন কেউ কথা বলতো না। বাচ্চারাও কথা বলতো না। ওই সুন্দর দৃশ্যগুলো আমার এখনো মনে পড়ে। গ্রামের মেয়ে ছিলাম। কিছুই জানতাম না। রাবওয়াাতে অনেক কিছু দেখেছি শুনেছি। খলীফা সানীর (রা.) বেগম ছোটি আপা, খলীফা সানীর (রা.) মেয়ে বিবি বাসেত এবং খলীফা সালেসের (রাহে.) বেগম আপা তাহেরা আমার বাসায় এসেছিলেন। আমার বড় মেয়ে কুররাতুল আয়েন সাদীয়ার আমীন অনুষ্ঠানে আমরা দাওয়াত করেছিলাম। আমার মেয়ের কোরআন তিলাওয়াত শুনে দোয়া করান হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবি মৌলভী মোহাম্মদ হুসায়েন সবুজ পাগড়িওয়ালে (রা.)। এছাড়াও আমার ভাই-ভাবীসহ আরো অনেকে ছিলেন। খলীফা রাবে (রাহে.) আমাকে দোয়ার একটি সোনার আঙটি দিয়েছিলেন।

২০০৫ সালে যখন আমরা কাদিয়ানে জলসায় গেলাম তখন হুযূর খলীফা খামেস (আই.) আমাকে রূপার দোয়ার আঙটি দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হুযূর প্রথমে নিজের তৃতীয় আঙ্গুলে পড়েছেন পরে খুলে আমার হাতে দিয়েছেন। সাথে সাথেই আমি আমার ওই আঙ্গুলেই পড়েছি। হুযূর দেখে হেসে বললেন, 'মাশাল্লাহ! আপ বহুত সেহেতমান্দ হ্যাঁ। কাদিয়ানে এক মাস ছিলাম। প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাযের পরে আমি, আমার সাহেব বেহেশতি মাকবেরাতে

গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কবর যিয়ারত করতাম। হযরত খলীফা আওয়াল (রা.) এর কবরও যিয়ারত করতাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যেখানে প্রতিদিন নামায পড়তেন অর্থাৎ, ''বায়তুদ দোয়া''; সেখানে আমি আমার সাহেব প্রতিদিন একবার করে নামায পড়তাম। আমার অনেক ভালো লাগতো। রাববওয়াতেও বেহেশতি মাকবেরা গিয়ে দোয়া করতাম।

বাংলাদেশে এসেও আমার স্বামীর অনেক জায়গায় পোস্টিং হয়েছে। যখন খুলনায় ছিলাম তখন অনেক মুখালেফাত ছিল। বিরোধীরা অনেকবার খুলনায় আঞ্জুমানে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। আমাদের মুরুব্বী সাহেব মুখালেফাতের মাঝেও অনেক ভালো কাজ করেছেন। খুলনায় আমার ছোট মেয়ে বারিরা নুসরাত রহমানের জন্ম হয়েছে। তারপর আমরা চট্টগ্রামে চলে আসি। চট্টগ্রামে আমার ছোট ছেলে নাভিদুর রহমানের জন্ম হয়েছে। এরা দুজনেই ওয়াকফে নও। নাভিদুর রহমান এখন চট্টগ্রামের মুরুব্বী। আমরা চট্টগ্রাম থাকাকালীন আমীর সাহেব আমাদের মুরুব্বী সাহেবকে খুলনায় পোস্টিং দিয়েছিলেন। মুরুব্বী সাহেব পনেরো দিন খুলনায় থাকতেন আর পনেরো দিন চট্টগ্রামে থাকতেন। তখনই ১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর খুলনায় জুমুআর খুতবা চলাকালে বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন শহীদ হলো। অনেকে আহত হল। তার মাঝে আমাদের মুরুব্বী সাহেবের ডান পা শহীদ হল, কাটা গেল। পরদিন সকালে খবরের কাগজে আসলো ইমদাদুর রহমান মারা গেছে, তখন আমি অনেক পেরেশান হয়েছিলাম যে, আমার সাত ছেলেমেয়ে সবাই ছোট। পরে মনকে অনেক শক্ত করেছি। একদিন ট্রমা সেন্টার হাসপাতালে উনার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। আমাকে বললো শাহানা আমার খুব খারাপ লাগছে। আমার জন্য দোয়া কর। তখনই আমার খালাতো ভাই তুষার ডাক্তারকে ডাকলেন। আটজন ডাক্তার এসে চেকআপ করেছিল। ডাক্তাররা ভয় পেয়েছিল কী হয়েছে বুঝতে পারছে না। তখনই আমি নামাযের সিজদায় কান্নাকাটি করে আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করেছি, হে আল্লাহ তা'লা! তুমি আমার স্বামীকে শুধু তোমার জামা'তের কাজ করার জন্য বাঁচিয়ে রাখ। আমার জন্য নয়, আমার সন্তানদের জন্য নয়। আমার সন্তারদেরকে তুমি দেখে রেখ। আল্লাহ তা'লা আমার দোয়া কবুল করেছেন। আল্লাহ তা'লা উনাকে পুরোপুরি সুস্থ করে দিয়েছেন। উনি নকল পা দিয়ে হাঁটা চলা করেন। হুযূর খলীফা খামেস (আই.) উনাকে বাংলাদেশ জামেয়ার প্রথম প্রিন্সিপাল বানিয়েছেন। দীর্ঘ ১৩ বছর জামেয়ার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করে ভাল কাজ করেছেন। এখন উনি চট্টগ্রাম জামা'তের মুরুব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। সবাই দোয়া করবেন সারাজীবন যেন কাজ করতে পারেন। আমাদের সবার দোয়া করা উচিত সবাই যেন জামা'তের ভাল কাজ করতে পারে।

১৯৯২ সালের ২ জানুয়ারী আমরা খুলনা জামা'ত থেকে চট্টগ্রাম জামা'তে এসে পৌঁছাই। বেলা দুপুর ২টায় রেল স্টেশন থেকে জনাব নজির আহমদ সাহেব আমাদেরকে উনার বাসায় নিয়েছিলেন। দুপুরে রশু আপা আমাদেরকে খুব খাওয়ালেন। বিকালে মসজিদের কোয়ার্টারে আসলাম। এসে দেখি টিনের ঘর খুব ঠান্ডা। বাসায় সবদিক দিয়ে খুব ঠান্ডা বাতাস ঢুকছিল। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মনে কোন কষ্ট ছিল না। এখানকার মানুষ খুব ভালো ছিলেন। সবার মনে অনেক আন্তরিকতা ছিল। মন ভরা ভালোবাসা ছিল। সবাই মুরুব্বী সাহেবকে আপন করে নিয়েছিলেন। এখন তো কেউ বেঁচে নেই। একদিন রশু আপা উনার বড় বোন ছুটি আপা আমাদের বাসায় আসলেন। মুরুব্বী সাহেবকে বললেন, মুরুব্বী সাহেব পুরনো মসজিদ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ বানানোর ব্যবস্থা করেন। মুরুব্বী সাহেব বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব? তারা বললেন, আপনিই পারবেন। অবশেষে সবাই মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। চট্টগ্রাম মজলিস আমেলা, চট্টগ্রামের আমীর সাহেব, সবাই প্রস্তাব পাশ করলেন এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর অনুমোদন চাইলেন। হুযূর (রাহে.) অনুমোদন দিলেন। তারপর আমীর সাহেব সহ সবাই মুরুব্বী সাহেবকে বললেন, আপনি এলান করবেন। তখন মুরুব্বী সাহেব আমাকে বললেন, শাহানা! তোমার যে একটা সোনার হার আছে সেটা তুমি মসজিদকে দান করে দাও। মসজিদকে দান করলে অনেক নেকীর কাজ হবে, অনেক বরকত হবে। আমি সোনার হার দিতে রাজি হয়ে গেলাম। মুরুব্বী সাহেব জুমুআর খুতবার সময় মসজিদের কাজের এলান দিলেন। সবার আগে মুরুব্বী সাহেব আমার হারের কথা ঘোষণা করলেন। সবাই খুব উৎসাহিত হলেন এবং সবাই মসজিদে চাঁদা দিতে শুরু করলেন। মসজিদ কমিটির সবাই এবং জামা'তের অন্যান্য মানুষ সবাই কাজে অংশ নিলেন। মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব, সিদ্দিক রহিম সাহেব, সিরাজী সাহেব সহ জামা'তের সবাই আন্তরিকভাবে অংশ নিয়েছেন। সবাই মুরুব্বী সাহেবকে খুব মান্য করতেন। ঐ সময় নিজামী সাহেব এবং সবাই বলেছেন মুরুব্বী সাহেবের চেষ্টায় সবাই মিলে কুরবানীর ফলে এই মসজিদ হয়েছে। মুরুব্বী সাহেব সবসময় হুযূরকে (রাহে.) লিখতেন। হুযূর (রাহে.) খুব খুশী হয়েছিলেন। দোয়া করেছিলেন। আমাকেও সবাই অনেক স্নেহ আদর করতেন। আমার পাশে মুখতার খালা এবং নিলু আপার আম্মা ছিলেন। তারা আমাকে মেয়ের মতো অনেক আদর করতেন। মেজর আসাদুজ্জামান সাহেব এবং নিজামী সাহেব; সবার কথা লিখলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম জামা'তের জন্য দোয়া করি আগের মতো আন্তরিকতা ফিরে আসুক। সবাই ভাল কাজ করে জামা'তকে আরো অনেক বড় করুক।

আমার আব্বা মওলানা মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব আজীবন মুরুব্বী সিলসিলা হিসেবে খেদমত করেছেন। খুব সম্ভব ১৯৫৩ বা ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। বেশ কয়েক বছর জামা'তের খেদমত করেছেন। এসব আমার জন্মের পূর্বের কথা। এত বছর পর আমার সাহেব এখানে পোস্টিং হয়ে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমার খুব ভালো লাগছে।

শ্রদ্ধেয়া নিলু আপার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। উনি আমার বড় বোনের মত। তিনি এবং লাজনা প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সূচি আমাকে লেখার উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের প্রতি আমার অনেক দোয়া, আন্তরিক ভালোবাসা।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ির কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত

আজ আমি আমার শ্বশুর জনাব লুৎফুল হক সিরাজী ও শাশুড়ি জনাবা হালিমা খাতুন সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো।

লুৎফুল হক সিরাজী সাহেব পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন। শাশুড়ি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। চট্টগ্রাম পোস্ট অফিসে কর্মরত অবস্থায় তার ভাতিজা মরহুম আব্দুল গফুর সিরাজী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের খবর পান। একদিন আমার শ্বশুর বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন, তখন আমার শাশুড়ি বললেন, আপনি কোথায় যাবেন, আমিও আপনার সাথে যাবো। আমি আপনার সব কথাই শুনেছি-আমিও বয়আত নেব। ১৯৫৭ সালে মরহুম খাজা আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বয়আত নিয়ে আহমদী জামা'তে দাখিল হন। তখন থেকেই জামা'তের সদস্য হিসাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দীর্ঘকাল সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯৭১ সালে পোস্ট অফিসের ট্রেজারীর চাবি আমার শ্বশুরের কাছে থাকতো। যখন শহরে গোলমাল শুরু হলো তখন অনেকের সাথে তারাও কর্ণফুলী নদীর ওপারে চলে যান। এদিকে রেডিওতে বার বার ঘোষণা দেওয়া হতে লাগলো যার কাছে ট্রেজারীর চাবী আছে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে পোস্ট মাষ্টারকেও মেরে ফেলেছে। চাবীর খোঁজে গ্রামে আসলে গ্রামের অনেকেই মেরে ফেলবে সবাই ভয় পাচ্ছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। আমার শাশুড়ি বললেন আমাদের জন্য কারো ক্ষতি হোক আমরা তা চাই না। আপনি চাবী জমা দিতে যান– আল্লাই আমাদের ও আপনার হেফাযত করবেন। শাশুড়ি দোয়া করতে লাগলেন। শহরে তখন ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। সব জায়গায়, রাস্তায়, মহল্লায় অগণিত লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যেই আমার শ্বশুর চাবী জমা দিয়ে আসলেন, আল্লাই তার হেফাযত করলেন।

ফিরিঙ্গী বাজার এলাকায় রিকন্ডিশন করা সরকারী বাসায় থাকতেন, অনেক বড় জায়গা ছিল। সেখানে অনেক দিন ছিলেন। আমার শ্বশুরের ছোট ভাই মাসুদুল হক সিরাজী সাহেবও পোস্ট অফিসে চাকুরী করতেন। উনিও একসাথে একই বাসাতে থাকতেন।

অনেকে তাকে পরামর্শ দিলেন হক সাহেব এ বাসা ছাড়বেন না, নিজের নামে এলট করে ফেলেন। অনেকেই করছে। এ সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি বললেন এটা অন্যায়। এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এরপর সরকারী বাসার জন্য আবেদন করেন। আগ্রাবাদ পোস্ট অফিস কলোনীতে তার প্রাপ্য বাসা খালি না পাওয়ায় অন্য আর একটি অনেক ছোট বাসায় চলে আসেন। তাদের বড় ছেলে মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব যখন বুয়েটে ভর্তি হন তখন একদিন অফিসে গিয়ে দেখেন হঠাৎ করেই বেতন বেড়েছে এবং বেশ কিছু জমা টাকাও পাবেন। এভাবেই আল্লাহ তা'লা ছেলের পড়ার খরচের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারা দুজনেই খুব ফিটফাট থাকতে পছন্দ করতেন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারতো না তারা যে কত হিসাব করে চলতেন।

একদিন অফিসের একজন কলিগ বললেন- হক সাহেব আপনার কতগুলি পাঞ্জাবী আছে যে, রোজই স্ত্রী করা পাঞ্জাবী পড়ে আসেন। তিনি বললেন আমার তো একটাই পাঞ্জাবী আর তা বাসায় গিয়ে ধুয়ে, সকালে স্ত্রী করে পড়ে আসি।

দুজনেই ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তাদের 'কতবা' কাদিয়ানের বেহেস্তী মাকবারায় লাগানো আছে। তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও দোয়াগো ছিলেন।

লুৎফুল হক সিরাজী সাহেব ১৬ই জুন ২০০০ সালে আর হালিমা খাতুন ২৩ এপ্রিল ২০১৪ সালে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। তাদের বড় ছেলে মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর ছিলেন। তিনি বিগত ২০১৩ সালের ৩১শে জুলাই ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

তাদের অন্য ছেলে বসির হাসান সিরাজী ও ছোট ছেলে মঈন উদ্দিন সিরাজী বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। আমাদের সবার জন্যই দোয়ার আবেদন করছি।

আমার স্মৃতিতে চট্টগ্রাম

তালাত মেহতাব রত্না

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৫০তম ইজতেমা (সুবর্ণ জয়ন্তী) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় লেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি।

চট্টগ্রাম জামা'ত অনেক পুরানো জামা'ত এবং বাংলাদেশের বড় জামা'তগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি জামা'ত। আমি লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামে সাত বছর সেক্রেটারী তালীম হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, (আলহামদুল্লিাহ)। আমার স্বামী মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সাহেবের পোস্টিং-এর সুবাদে আমরা ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে যাই। তখন আমার বয়স খুবই কম ছিলো। ২০০৬ সালে সেক্রেটারী তালীমের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। তখন লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন মোহতরমা রওশন আরা আহমদ সূচী। চট্টগ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে সবসময় আনন্দ দেয়। আমার বয়স কম থাকার কারণে কাজের অভিজ্ঞতা কম ছিল। আমি সাত বছরে চট্টগ্রাম জামা'তের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। চট্টগ্রামের মানুষ অত্যন্ত আনুগত্যশীল। আমি বয়সে ছোট হয়েও কোন পরামর্শ দিলে সকলে মানার চেষ্টা করতো। এই জামা'তে অনেক বুযুর্গ লাজনারা আছেন। আমি তাদের পরীক্ষা নিতাম এবং তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে পরীক্ষা দিতেন। আমেলার মিটিং এর সময় অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে মিটিং সম্পন্ন হত, যা আমি অন্য জামা'তে দেখিনি।

ইজতেমা এবং জলসার সময় আমাদের কাছে ঈদের মতো মনে হতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লাজনা নাসেরাতেরা একসাথে কাজ করতাম।

সেই সময়ে সে.মাল ছিল সৈয়দা মুশাররাত আফরিন মুক্তা। আমি মুক্তার সাথে অনেক বাসায় গিয়েছি। তখন চট্টগ্রামে ৯টি হালকা ছিল। হালকা পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক মাসে লাজনা টিমের সাথে বিভিন্ন হালকায় যেতাম। এত আনন্দের ছিল সেই সময়গুলো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মুরুব্বী মোয়াল্লেম সাহেবদেরকে চট্টগ্রামের মানুষ অত্যন্ত সম্মান করেন। আমি শুধু মুরুব্বীর স্ত্রী হিসাবে নয়, চট্টগ্রামের মানুষ আমাকে তাদের মেয়ের মতো ভালোবাসতো। যদিও আমার বাবার বাড়ি খুলনায় কিন্তু যখন আমার সাহেবের পোস্টিং চট্টগ্রাম থেকে আহমদনগর হয়ে যাবে তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি বাবার বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলের সাথে এত বেশী ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো যে, আমি যেদিন বিদায় নিচ্ছিলাম মসজিদের সবাই আমার সাথে সাথে কাঁদছিলো। আমি এতই অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, যাদের সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই অথচ আত্মার কত টান। এটাই হলো মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামা'তের বন্ধন। আমি আহমদনগর যাওয়ার পরেও অনেকেই বিভিন্নভাবে আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছেন।

আমি চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। দোয়া করি চট্টগ্রাম লাজনা সংগঠন তাদের কাজের ধারা অব্যাহত রাখুক। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে জামা'তের সাথে যুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

কিছু স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ

নিলুফার মমতাজ

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রথম প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয়া মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন ১৯১৬ সালে আর লতিফ সাহেব ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল মুন্সি নাঈম উদ্দিন আহমদ সাহেবের ছোট মেয়ে সামসুন্নেসা বেগমকে বিয়ে করেন। তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রথম আমীর হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.) এ ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর জানাযা যেন হযরত প্রফেসর সাহেব পড়ান। সেই অনুযায়ী প্রফেসর সাহেব চট্টগ্রাম হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর জানাযা পড়ান। এতে এই ইশারাও ছিল যে তাঁর পরে হযরত প্রফেসর সাহেব (রহ.) বঙ্গদেশের আমীর হওয়ার উপযুক্ত। সেই মতে তার পরে হযরত আমীরুল মুমেনীন তাঁকে বঙ্গদেশের আমীর নিযুক্ত করেন। ১৯৩১ সালে প্রফেসর সাহেবের ওফাতের খবর হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলিয়াছিলেন–

"প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব (রহ.) এক বাড়ে বুযুর্গ থেঁ।"

মরহুমা সামসসুন্নেসা বেগম (আমার শ্রদ্ধেয় নানী জান) এই পবিত্র সিলসিলার জন্য অনেক কোরবানী করেছেন। কথিত আছে যে, মরহুম মীর সাহেব হতে জানা যায় যে, একবার তিনি তার শ্বশুরকে তার শাশুড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন তাঁর জীবনে তাহাজ্জুদের নামায ক্বাযা হয় নাই সুবহানাল্লাহ। এও শুনা যায় যে তাঁর বাড়ী থেকে কোন দিন কোন ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরে যায় নাই।

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ সালে মৌলবী মোহাম্মদ চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন কালে তাঁর দিক নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ গঠিত হয়, প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, চট্টগ্রাম জামতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও আমীর এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেবের স্ত্রী সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা। এক বুযুর্গ ব্যক্তির বুযুর্গ সহধর্মিনী। তিনি প্রফেসর সাহেবের নিকট থেকে জামা'তী যে তালিম তরবীয়্যত লাভ করেন তা প্রতিফলনে চট্টগ্রাম লাজনাদের হাতে খড়ি দেন।

বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠা প্রবীণতম সদস্যা মোহতরমা সৈয়দা আমাতুল মজিদ (ছুটি আপা) সাহেবা বর্ণনা করেন–

"আমার আব্বা মরহুম সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব যখন বয়আত করেন তখন চট্টগ্রামে আহমদীদের মধ্যে একান্ত আপনজন বলতে এই পরিবারটিকেই আমরা জানতাম। আমার বাবা বলেছিলেন আজ হতে মোহতরমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমার মা। আমরা তখন থেকেই মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবাকে দাদী ডাকতাম ও মরহুমার দুই মেয়ে মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগমকে ফুফু বলে ডাকতাম। আমার আব্বা আহমদীয়াত গ্রহণ করার পরে আমি আমার প্রথম ইসলামী শিক্ষা ও আহমদীয়াতের যাবতীয় তালিম তরবীয়্যত প্রফেসর লতিফ সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার নিকট থেকে পেয়েছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি আমার ধর্মীয় শিক্ষিকা ছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহাস্পদ নেক মহিলা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহর প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন

১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত। তখন লাজনা ইমাইল্লাহর যত সভা হতো সব উনার বাসাতেই হতো। আসলে আমরাতো খৃষ্টান থেকে আহমদী হয়েছিলাম। সত্যিকার অর্থে আমরা আহমদীয়াতের শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার কিছুই জানতাম না। আমরা এই পরিবারের মাধ্যমেই সবকিছু শিক্ষা লাভ করেছি। আমাদের পরিবারের জন্যে প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের পরিবারের অবদান আমরা কোনদিনই ভুলতে পারবো না এবং কৃতজ্ঞতা চিত্তে তা স্মরণ করি। তখনকার দিনে চট্টগ্রাম জামা'তের আহমদী পরিবারদের মধ্যে যে ধরণের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহমর্মিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সেটি আমাদের কাছে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ বলে মনে হয়। আমি কায়দা, কোরআন শরীফ পড়া সহ যাবতীয় ইসলামী দোয়া, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ ইত্যাদির শিক্ষা দাদীজান অর্থাৎ মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার কাছ থেকে শিখেছি।

পরবর্তীতে আমি লাজনা ইমাইল্লাহর তবলীগ সেক্রেটারী হিসেবে সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর কাজ করেছি এবং ওসীয়্যত সেক্রেটারী হিসাবে প্রায় ৩ বছর করেছি ১৯৫৮ সালে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আমার সবকিছুইতে দাদী জানের (মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার) একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা কাজ করেছে।"

খাকসার তখন ছোট। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি যত দোয়া শিখেছি তার প্রায় সবগুলো আমার নানীজানের কাছ থেকে শিখেছি। ছোট বেলায় আমার নানীজানের কাছে ঘুমাতাম। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত উনি আমাদেরকে দোয়া শিখাতেন। তাছাড়া কায়দা ও কোরআন শরীফ পড়া নানীজানের কাছ থেকেই শিখেছি।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার সুযোগ্য সন্তান মরহুম গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া) সাহেব, এক কথায় চট্টগ্রাম জামা'তের প্রাণ পুরুষ ছিলেন। তিনি ১৯৬৩-১৯৬৫ এবং ১৯৬৮-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৮৫ সালে এমারত প্রতিষ্ঠার পর তিনি স্থানীয় জামা'তের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রামের বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্সেই তাঁর কবর বিদ্যমান এবং বেহেশতি মাকবেরা রাবওয়াতে তাঁর ইয়াদগার কাতবা (নামফলক) স্থাপিত রয়েছে। খিলাফতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। সেই আকর্ষণে প্রায় প্রতি বছরই তিনি ছুটে যেতেন আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় জলসায়। যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে উজ্জীবিত করতেন নিজেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবসর জীবনে তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'Voxwagon' গাড়িটি বিক্রি করে যুগ খলীফার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্পেনের বাশারাত মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর স্মরণে চট্টগ্রাম জামা'তকে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। মরহুম গোলাম আহমদ খাঁন সাহেবের স্ত্রী মরহুমা মুখতার বানু সাহেবাও দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মরহুমা মুখতার বানু সাহেবা ২০০৭ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার বড় মেয়ে মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার স্বামী হলেন মরহুম জনাব মীর হাবিব আলী সাহেব (ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল অর্গানাইজর) যিনি প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের বাড়িতে থেকেই চট্টগ্রাম কলেজে লেখাপড়া করেন। মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় মেয়ে মোহসেনা বেগমের স্বামী এদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর শফিউল আলম আতহার সন্দীপের কৃতি সন্তান। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মোহসেনা বেগম সাহেবার ছেলে মেয়েরাও ঐশী জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত ও খিলাফতের সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে। বড় মেয়ে মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার বড় ছেলে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট। তিনি বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং জামা'তের এক নিবেদিত প্রাণ খাদেম। মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় ছেলে জনাব মীর শওকত আলী (বাসেত) সাহেবও জামা'তের এক নীরব খাদেম এবং চট্টগ্রামস্থ মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার বড় নাতি অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমার আব্বা পরিবারের সবাইকে নিয়ে চিটাগাং থেকে সরাইলে আমাদের গ্রামের বাড়ী চলে আসেন। সাথে নানী জানকেও নিয়ে আসেন। আমার নানী জান সদালাপী, অমায়িক ও নেক মহিলা ছিলেন। আশেপাশের সবাই আসতেন নানীজানের সাথে পরিচিত হতে। আশেপাশের মহিলাদেরকে তিনি স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে কায়দা ও কোরআন শিক্ষা দিতেন এবং সঠিকভাবে নামায পড়তে শিখাতেন। আশেপাশের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রবীণ গ্রামবাসীরা এখনও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রথম লাজনা প্রেসিডেন্ট মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমাদের সবার নিকট প্রাত:স্মরণীয়। আল্লাহ তা'লা এই মুমিনার আচরিত আদর্শ গুলি আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রবিষ্ট করুন আমীন।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুমা মুখতার বানু সাহেবা (লেখিকার মামী)

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

মরহুমা মুখতার বানু সাহেবার বাড়ী নারায়নগঞ্জে। উনার বাবা ছিলেন উকিল। অনেক বড় পরিবারের মধ্যে উনি বড় হয়েছেন। উনি কীভাবে আহমদী হলেন তার বর্ণনা কিছুটা না দিলেই নয়।

আমাদের প্রয়াত সাবেক ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের ছোট ভাই মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সাথে মুখতার বানু সাহেবার বড় বোনের বিয়ে হয়। আমার মামীজান তখন ইডেন কলেজের ছাত্রী। মো: ইউসুফ সাহেবের কাছ থেকে উনি প্রথম আহমদীয়াতের সংবাদ পান। মো: ইউসুফ সাহেবের বড় ভাই ডা. মুসা সাহেবের কাছ থেকে অনেক বই নিতেন এবং পড়াশুনা করতেন। উনাদের সান্নিধ্যেই উনি আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন।

মৌলানা এজাজ আহমদ সাহেব তখন ঢাকা জামা'তের মুবাল্লেগ। মো: ইউসুফ সাহেব উনাকে বকশীবাজার মসজিদে পাঠান এবং মৌলানা এজাজ সাহেবের সাথে দেখা করেন এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে চান। মৌলানা সাহেব উনাকে অন্দর মহলে নিয়ে উনার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর থেকে যখনই উনার ক্লাস অফ থাকত চলে আসত বকশীবাজার মসজিদে আর মৌলানা সাহেবের স্ত্রীর সাথে আহমদীয়াত সম্বন্ধে আলোচনা হতো। ছাত্রী থাকাকালীন অবস্থায় উনি অনেক বই পড়েছেন এবং তবলীগের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্তর পালা শেষ করে উনি ঐশী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। মুখতার বানু সাহেবা একজন ছাত্রী হয়ে এমন একটা বড় পরিবারের মধ্যে থেকে যেভাবে উনি বয়আত করলেন এটা সত্যিই একটি বিরল ঘটনা।

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া) সাহেবের সাথে মুখতার বানু সাহেবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। গোলাম আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিনী মুখতার বানু সাহেবা একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ এর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। পূণ্যবান স্বামীর সাথে অনেকবার পবিত্রভূমি কাদিয়ান ও রাবওয়ায় সফর করেছেন। জামা'তের মেহমানদের আন্তরিক আতিথেয়তা তাঁর জীবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মুখতার বানু সাহেবা প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন–

১. ১৯৭১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত।
২. দ্বিতীয়বার দায়িত্ব পান ১৯৯৪-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত।
৩. তৃতীয়বার দায়িত্ব পান ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত।

জীবনের এই দীর্ঘ সময় চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ এর জন্যই উৎসর্গীত, আলহামদুলিল্লাহ। সেই সময় বাইরে থেকে যারা আসত বিশেষ করে অতিথিরা সবাই উনার বাসায় থাকত। কারণ মসজিদে কোন গেস্ট হাউজ ছিল না। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) (হযরত মির্যা তাহের আহমদ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে বেড়াতে এসেছিল। উনার বিবিকে নিয়ে চট্টগ্রামে এসেছিল এবং উনার বাড়ীতেই ছিল। তখন লাজনার বোনেরা সবাই উনার বিবির সাথে দেখা করতে আসতো। সেই সময় উনার আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ছিল না। হুযূরের এই সফর চট্টগ্রাম জামা'ত এবং চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর জন্য স্মরণীয় ঘটনা।

ষাট দশকের প্রথম দিকের কথা একটু বলতে হয়। তখন কোন আমেলা বা হালকা এসব ছিল না। মাসে একটা মিটিং হতো। সেটা উনার বাসাতেই হতো এবং মিটিং শেষে চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। এখন লাজনার বোনেরা যেভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেন তখন উনারা এটা কল্পনাও করতে পারেন না। আমি দেখেছি সকাল বেলা ১০-১১টার দিকে চাঁদা সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। উনার সাথে ছিল চট্টগ্রাম জামা'তের বয়েজ্যেষ্ঠা ও প্রবীণতম সদস্যা (ছুটি আপা)। উনারা হেঁটে হেঁটে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। খাকসার তখন স্কুলে পড়ি। আমিও উনাদের সাথে অনেকবার গিয়েছি দেখেছি কি কষ্ট করে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। তবলীগ করতে খুব পছন্দ করতেন। সুযোগ পেলেই তবলীগের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। কোনরূপ ভয়ভীতি উনার মধ্যে ছিল না। খুবই সাহসীকতার সাথে তবলীগ করতেন।

মরহুমা মুখতার বানু সাহেবা অনেকবারই প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। উনার দায়িত্ব পালনের প্রথম দিকের কথা বলছি। সেই সময় চট্টগ্রামের মসজিদ এত বড় ছিল না। মহিলাদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থাও ছিল না। লাজনা ইমাইল্লাহ এর সব প্রোগ্রাম উনার বাসায় হতো। ইজতেমার কথাই ধরা যাক। আমার মামার বাসার পিছনে খানিকটা খালি জায়গা ছিল। সেই জায়গাতে ইজতেমা হতো। তখন ইজতেমার রান্নাবান্না সব উনার বাসায় হতো। লাজনার বোনেরা নিজেরাই রান্না করতো। তিনি লাজনা ও নাসেরাতদের উন্নতিকল্পে সেলাই শিক্ষার উপরও জোর দিতেন। এভাবে উনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ এর একজন লড়াকু সৈনিক হিসাবে কাজ করেছেন।

উনার একটা মহৎ গুণের কথা না বললেই নয়–

খাকসার তখন স্কুলে পড়ি। রমযান মাস। উনি বাসায় আমাদের

সবাইকে নিয়ে কোরআনের দরস দিতেন। উনি সূরা ইউসূফ দিয়ে শুরু করেন। উনার কাছে প্রথম আমি সূরা ইউসুফের অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনি। উনি এত সুন্দর করে যেরূপ ইউসুফ (আ.) ভাইয়েরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এ ঘটনার কথা বর্ননা করেছিলেন যে সেটা আমি এখনও ভুলি নি।

জামা'তের প্রতি ছিল নিবেদিত প্রাণ। জামা'তের কারও কোন অসুবিধার কথা শুনলে ছুটে গিয়েছেন সেই যত রাতই হোক না কেন। সুখে দুঃখে সবসময় মানুষের পাশে ছিলেন। সত্যিকার অর্থে আহমদী জামা'তের প্রতি ছিল উনার অগাধ ভালোবাসা। সেই জন্যই জামা'তের যেকোন ডাকে সাড়া দিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। উনার তবলীগে উনার ভাই ও ছোট বোন বয়আত নিয়েছিলেন।

তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায, নফল নামায, নফল রোযা আদায় করতেন। আমি উনাকে কখনও তাহাজ্জুদ মিস করতে দেখিনি। আর্থিক কোরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা:

স্পেনে ৭০০ বছর পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মামা গিয়েছিলেন। সেই সময় উনার আর্থিক অসুবিধা ছিল। মামার একটি গাড়ী ছিল। সেই গাড়ীটা উনার খুব শখের গাড়ী ছিল। সেই গাড়ী বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে মামী মামাকে স্পেনে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছিলেন। এটা সত্যি আমাদের পরিবারের জন্য গর্বের বিষয়।

ইতি টানার আগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কথা একটু বলা দরকার বলে আমি মনে করি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মামা-মামী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী-অবাঙালী সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে জামা'তের বাঙালী-অবাঙালী সবাইকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন এই বাড়িটা এবং আমাদের আহমদীয়া মসজিদ ছিল সবার আশা ভরসার স্থল। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাড়ীতে দুই পক্ষের গুলাগুলিতে যে শেল পড়েছিল সে শেলের স্প্লিন্টার মামীর পায়ে ঢুকে রক্তপাত শুরু হয়। আমার দুই নানীজান তখন দোয়া পড়তে থাকেন। পরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা রক্ত বন্ধ হয়। ইনফেকশনের ভয় ছিল। কিন্তু মামীর মনোবল এতটাই দৃঢ় ছিল যে, বললেন দোয়াই আমার ঔষধ। আমি দোয়াতে ভালো হয়ে যাব। আল্লাহর ফযলে উনি সত্যি ভালো হয়ে গেলেন।

সর্বোপরি মামীর এই অবস্থা দেখে ওয়ালী খাঁ মসজিদের ইমাম বললেন খান সাহেব আপনারা আমাদের মসজিদে চলে আসেন। আমাদের মসজিদ অনেক নিরাপদ। আমার মামা-মামী বললেন আমার বাসা আমার মসজিদ ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। আমার মসজিদ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। আল্লাহ আমাদের নিরাপদে রাখবে।

সর্বোপরি মুখতার বানু সাহেবা একজন মুসী ছিলেন। উনি ডা. খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতায় অবসর গ্রহণের পর তিনি নভেম্বর ২০০৭ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হী রাজেউন)। সেই সময় চট্টগ্রাম জামা'তে আহমদী পরিবারের মধ্যে যে ধরণের সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সেটি আমাদের কাছে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ বলে মনে হতো।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার বিনীত প্রার্থনা আল্লাহ তা'লা যেন মুখতার বানু সাহেবা (আমার মামীজানকে) জান্নাতের সুউচ্চ মোকাম দান করেন। (আমীন)।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের বড় কন্যা মাহমুদা বেগম সাহেবা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ইং রাত ২-১০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সরাইল নিবাসী মরহুম মীর সেকান্দার আলী সাহেবের কনিষ্ঠ ছেলে মীর হাবিব আলী সাহেবের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। পুরুষগণ যেমন এলেম-আমল, শিল্প সাহিত্য ও বীরত্ব, তাকওয়া, পরহেজগারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবদা রাখার কারণে সম্মান ও মর্যাদার অধীকারী হন ঠিক তদ্রুপ নারীগণও এবাদত বন্দেগী, পর্দা, তাকওয়া-তাহারাত ও শারাফতের কারণে ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন। আমাদের আহমদীয়া জামা'তে আদর্শ জননী হিসাবে যে দশটি সোনালী তরবীয়ত নীতির মৌলিক শিক্ষা রয়েছে মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পালনে আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা ৭ সন্তানের জননী। পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে। উনার বড় ছেলে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দ্বিতীয় ছেলে মীর শওকত আলী (বাসেত) জামাতের একজন নীরব খাদেম এবং চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুল বাসেত নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অন্য ছেলে মেয়েরাও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা অত্যন্ত কোমল মনের মানুষ

ছিলেন। আমার মনে হয় না উনি কখনও কারও মনে কষ্ট দিয়েছেন। অল্পে তুষ্ট, সহিষ্ণুতা, সবর-ধৈর্য্য-সহনশীলতা এবং সর্বোপরি দোয়াই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আহমদী জামা'তের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা। উনি এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে কখনো নিজের স্বার্থের দিকে দেখেননি। পরোপকার করাই যেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা, তরবীয়্যত ও তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর সমন্বয়ে তিনি তাঁর গোটা পরিবারকে আহমদীয়াতের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। উনার আরেকটি বিশেষ দিক- সাহায্যপ্রার্থী সবাইকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। কাজের বুয়াদের সাথেও উনার ব্যবহার ছিল আন্তরিক।

আত্মীয়তার পরিমন্ডলে সবার সাথে উনার স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার শ্বশুর বাড়ীতে উনাকে সবাই রাঙা বউ ডাকত। আমার চাচাতো ভাই বোনেরা সবাই আমার আম্মাকে রাঙা চাচী বলে ডাকত। এক কথায় বলতে গেলে শ্বশুরবাড়ীতে সবাই আম্মার গুন মুগ্ধ ছিল। আম্মার আরেকটা বিশেষ গুণ ছিল উনি সবসময় সদকা দিতেন। আমরা ভাইবোনরা যখন ঢাকায় পড়াশোনা করতাম ছুটির সময় যখন বাড়ী আসতাম তখনই আম্মাকে দেখতাম সদকা দিতে। কোন দুঃসংবাদ শুনলে, অসুখ-বিসুখে সবসময় আম্মা সদকা দিতেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায, নফল নামায, নফল রোযা আদায় করতেন। আমি আম্মাকে কখনও তাহাজ্জুদ মিস হতে দেখিনি। তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লার একজন নীরব সেবক ছিলেন। তিনি কখনও বসে নামায পড়েনি। চেয়ারে বসেও কখনও নামায পড়তে দেখিনি। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে উনি বেশী পছন্দ করতেন।

আম্মা নিয়মিত জুম্মার নামায আদায় করতেন। আম্মা আমাদের বলতেন শুক্রবার হচ্ছে ছোট ঈদ। শুক্রবার দিন আম্মা ১২ টার মধ্যে মসজিদে যেতেন এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জুমার দিন ১২ টার মধ্যে মসজিদে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিতেন। আম্মা তাঁর দোয়ার বরকতে আমাদের গোটা পরিবারে পরিপূর্ণ প্রশান্ত ও দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবা ছিলেন মানবদরদী। সাহায্যপ্রার্থী কেউ আমাদের বাসা থেকে কখনো খালি হাতে ফিরে যাননি। ২০০৫ সালে যখন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসি তখনকার একটি ঘটনা–

এক ভিক্ষুক এসে বেল বাজালো। দরজা খুললাম। দেখি এক ভিক্ষুক এসে দাঁড়িয়ে আছে। ভিক্ষুক আমাকে দেখে বললো মা কই? ওমা ওমা করে ডাকছে। আম্মা আসলেন। আম্মাকে দেখে বললেন, মা বাসী ভাত থাকলে আমাকে খেতে দেন। আমি ক্ষুধার্ত। আম্মা পিড়ি দিয়ে ওকে বসতে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পরোটা, ডিম ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। এভাবেই আম্মা অসহায়দের সেবা করতেন। উনি সবসময় আমাদের বলতেন ভিক্ষুকরা আমাদের দরজায় এসেছে ওদের কখনো মাফ করো এ কথা বলবে না। কিছু না কিছু দিবে। খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না।

আম্মা আমাদের দুটি কথা সবসময় বলতেন–

"মিথ্যার জয় প্রতিদিন
সত্যের জয় একদিন।"

আরও একটি কথা উনি বলতেন–

"চুরি করা মহা পাপ
মনে যেন রয়
না বলিয়া লইলে
চুরি করা হয়।"

এ দুটি কথা আম্মা আমাদের সবসময় শুনাতেন।

মেহমানদারী আম্মা খুব পছন্দ করতেন। আমার মনে আছে আমি তখন ছোট তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সময় তখন চট্টগ্রামে অনেক আবাঙালী আহমদীরা ছিল। প্রত্যেক ঈদে আম্মা সকালে উঠে পোলাও, কোর্মা, সেমাই ও নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করতেন। আঞ্জুমান থেকে সবাই ঈদের নামায পড়ে লাজনার বোনেরা আমাদের বাসায় আসতেন। আম্মা সবাইকে খুব যত্ন সহকারে মেহমান নেওয়াজী করতেন। এই মেহমান নেওয়াজীতে আম্মা খুবই আনন্দ পেতেন।

বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের অন্যতম বয়ো জ্যেষ্ঠা প্রবীণতম সদস্যা মোহতরমা সৈয়দা আমাতুল মজীদ (ছুটি আপা) সাহেবা বর্ণনা করেন–

"আমার আব্বা সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব যখন বয়আত করেন তখন চট্টগ্রামে আহমদীদের মধ্যে একান্ত আপনজন বলতে প্রফেসর লতিফ সাহেবের পরিবারটিকে জানতাম। আমার বাবা বলেছিলেন আজ হতে সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমার মা। আমরা তখন থেকেই সামসুন্নেসা বেগম সাহেবাকে দাদী বলে ডাকতাম। উনার দুই মেয়ে মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগম সাহেবাকে বড় ফুফু ও ছোট ফুফু বলে ডাকতাম।

আসলে আমরা তো খৃষ্টান থেকে আহমদী হয়েছিলাম। সত্যিকার অর্থে আাহমদীয়াতের শিক্ষা বলতে যা বুঝায় আমরা তা কিছুই জানতাম না। সবকিছুই আমরা এই পরিবারের মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করেছি। বিশেষ করে বড় ফুফু (মরহুমা মাহমুদা বেগম

সাহেবার) সাথে আমার হৃদ্যতা ছিল গভীর। আমার জীবনের প্রায় সব কিছুই যেমন সেলাই, পর্দা, নামায ও দোয়া দরুদ সব বড় ফুফুর কাছ থেকে শিখেছি। কিভাবে কম মসলা ও কম তেল দিয়ে রান্না করতে হবে ফুফুর কাছ থেকে শিখেছি। বড় ফুফু সবসময় বলতেন এক তরকারী রান্না করবে। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের জ্ঞান আমরা বড় ফুফুর কাছ থেকে পেয়েছি। তারীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ কি সেটাই আমরা জানতাম না। তখন বাংলায় এত বই ছিল না সব কিছুই উর্দুতে ছিল। আমার কাকা (ফালু মিয়া) আমাদেরকে আল ফযল থেকে পড়ে বাংলায় বুঝিয়ে দিতেন। বড় ফুফুর বাসায় যখন গিয়েছি কোন দিনও না খেয়ে আসতে পারিনি। সেই সময়ে চট্টগ্রাম জামা'তে আহমদী পরিবারের মধ্যে যে ধরণের সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল সেটি আমাদের কাছে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ বলে মনে হয়। আমরা যখন ছোট তখন মোতালিব সাহেব (দরবেশ) একবার চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তখন ফুফুদের বাড়ীতেই উনি ছিলেন। আমরা সেই সময় উনাদের মতো বুযুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেয়েছি। তখন আহমদী পরিবারগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অত্যন্ত গভীর ও আন্তরিক।

মরহুমা মাহমুদা বেগম সাহেবার আরেকটি শক ছিল গাছ লাগানো ও হাঁস-মুরগী পালন। উনি ফলের গাছ ও সবজি গাছ লাগাতেন। প্রতিদিন গাছগুলি নিজ হাতে পরিচর্যা করতেন। আম্মা যখন গাছের পরিচর্যা করতেন তখন মনে হত গাছগুলি আম্মার সাথে কথা বলে। আর উনি যখন হাঁস-মুরগীকে খাওয়া দিতেন তখন দেখে মনে হত ঐগুলি উনার সন্তান। আম্মার হাতে লাগানো গাছগুলি এখনো মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আগে আম্মা বলে গিয়েছেন গাছগুলির যত্ন নিও।

পরিশেষে বলব, মাতাপিতার জন্য প্রত্যেক সন্তানের দোয়া করা উচিত। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার বিনীত প্রার্থনা আল্লাহ তা'লা আমার আম্মাজানকে জান্নাতের সুউচ্চ মোকাম দান করুন। (আমীন)।

মরহুমা মোহসেনা বেগম সাহেবা

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ইসলামে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আইয়ামে সালেহীন যে বইটা আমরা পেয়েছি সেখানেও ইহার উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিন জন লোক যদি মৃত ব্যক্তিকে ভাল লোক হিসেবে স্বাক্ষী দেয় তবে উহা আল্লাহর নিকট সুপারিশ হিসাবে কাজ করে এবং সেই স্বাক্ষী যদি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হয় তবে সেটা আরো বেশী কার্যকর হয়। আমি মোহসেনা বেগম সাহেবার জীবন স্মৃতি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতিচারণ করছি।

মোহসেনা বেগম সাহেবা চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এবংবঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমান আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা। মোহসেনা বেগম সাহেবা ২০১৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ইন্তোল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

পুরুষরা যেমন এলেম-আমল, শিল্প সাহিত্য ও বীরত্ব, তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন। ঠিক তদ্রুপ নারীগণও ইবাদত বন্দেগী, পর্দা, তাকওয়া-তাহারাত ও শারাফতের কারণে প্রভূত মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন।

আমাদের আহমদীয়া জামা'তে আদর্শ জননী হিসাবে যে দশটি সোনালী তরবীয়্যত নীতির মৌলিক শিক্ষা রয়েছে মরহুমা মোহসেনা বেগম সাহেবা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তা পালনে আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন।

১৯৪৮ সালে সন্দীপের কৃতি সন্তান এ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শফিউল আলম আতহার এর সাথে মোহসেনা বেগম সাহেবার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মোহসেনা বেগম সাহেবার স্বামী চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মোহসেনা বেগম সাহেবার জন্ম ১৯৩০ সালে। তিনি ডা. খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্রী ছিলেন এবং পড়াশোনার খুব শখ ছিল। কম বয়সে বাবাকে হারান। উনার বাবা যখন মারা যান তখন উনার বয়স ১ বছর। এই পরিবারটাকে তখন দেখার মতো কেউ ছিল না। তখন জামা'তের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল গভীর ও আন্তরিক। তখন খান সাহেব, মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ও সরাইলের মীর সেকান্দার আলী (লেখিকার দাদা) উনাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন।

মোহসেনা বেগম সাহেবা ৮ সন্তানের জননী। তিনি তাঁর ৮ সন্তানের প্রায় সবাইকে জামা'তে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি একজন মুসী ছিলেন। ২০১০ সালে তিনি হজ্ব পালন করেছেন। চাঁদার ব্যাপারে খালাম্মা খুবই নিয়মিত ছিলেন। জামা'তী যেকোন চাঁদার ব্যাপারে খালাম্মা খুবই নিয়মিত ছিলেন। জামা'তী যে কোন চাঁদার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উনাদের বাবা ছিলেন না কিন্তু উনাদের তরবীয়্যত ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় আঁধারে হয়েছেন। সেই তরবীয়্যতি শিক্ষায় তিনি তাঁর গোটা পরিবারকে আহমদীয়াতের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন।

মোহসেনা বেগম সাহেবা খুব সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। উনার চেহারার মধ্যে সবসময় পবিত্র ভাব ফুটে থাকতো। স্বল্পতুষ্টি, সহিষ্ণুতা, সবর-ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি দোয়াই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির এবং খুব কম কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি আহমদীয়াত নিয়ে কোন কথা বলতেন বা কোথায়ও কোন তবলীগ হত তখন তিনি চুপ থাকতেন না। তখন তিনি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে আহমদীয়াত কি সেটা বুঝিয়ে দিতেন।

তিনি খুব ইবাদত বন্দেগী ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায, নফল নামায ও নফল রোযা আদায় করতেন। খালাম্মাকে আমি দেখেছি উনার বিছানার পাশে একটি টেবিল থাকত। টেবিলের উপর এক পাশে কুরআন শরীফ, মসীহ মাওউদ (আ.) এর বই, কলম ও ১টি ডায়েরী থাকত। প্রায়ই দেখতাম বই পড়ছেন ও কিছু লিখছেন। উনার জীবনের একটি ঘটনা না বললেই নয়। আমার বড় ভাই মীর মোবাশ্বের আলী নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন তখন খালাম্মাও নিউইয়র্কে ছিলেন। নিউইয়র্কের কুইন্সে আমাদের মসজিদে বড় ভাই নামায পড়তে গিয়েছিলেন। তখন কোন এক অনুষ্ঠানে প্রফেসর লতিফ সাহেব (আমার নানা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বড় ভাই বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন লতিফ সাহেবের ছোট মেয়ে আমার খালা এখানে আছেন। তখন সবাই খালাম্মার সাথে দেখা করতে চাইলেন এবং অনেকে দেখাও করেছেন।

আরেকটি মজার ঘটনা হচ্ছে। বিয়ের পর খালাম্মা যখন শ্বশুড়বাড়ী যায়। তখন সন্দীপের যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন ভালো ছিল না। স্টীমারে করে যেতে হত। কিন্তু স্টীমার থেকে নামার কোন সুব্যবস্থা ছিলনা। কোন ঘাট ছিল না। দূরে স্টীমার দাঁড়াতো আর যাত্রীরা নৌকার মধ্যে লাফ দিয়ে নামত। এ দৃশ্য দেখে উনি বললেন, এভাবে বে-পর্দা হয়ে নামা যাবে না। এত লোকের সামনে লাফ দেওয়া যাবে না। পরে উনি গেলেন না ফিরে আসলেন। এটা উনার নেক মানসিকতার পরিচয়।

মোহসেনা বেগম সাহেবা ছিলেন মানব দরদী। প্রতিবেশীর প্রতি তিনি অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। কাজের লোকদের সাথেও উনার ব্যবহার ছিল আন্তরিক। উনার মেয়ে নার্গিস গাফ্ফার বলে, আমার আম্মা মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। এতে উনি নিজে কষ্ট পেত। আম্মা যেভাবে মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন সেটা আমার মনে দাগ কেটে আছে। আমি তখন ছোট ক্লাস থ্রী তে পড়ি। আমার ছোট নানী তাহার বাড়ী কুলিয়াচর থেকে মল্লিকা নামের একটি মেয়ের হাতে আমাদের জন্য গাছের ফলমূল পাঠাতেন। একবার মল্লিকা আসলো ওর দুই মাসের বাচ্চা নিয়ে। আমার মামী ওকে থাকতে দিল বাইরের একটা ঘরে। ঘরের দরজা ছিলনা। আমার আম্মা ঘুমাতে পারছে না। খালি পায়চারি করছে। আম্মা ভয় পাচ্ছে বিড়াল এসে যদি বাচ্চাটাকে কামড় দেয়। পরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল আম্মা ওকে ডেকে ঘরে নিয়ে আসল ও বিছানা করে দিয়ে ঘরে ঘুমাতে দিল এবং বললো সকালে চলে যেয়ো।

আরেকটি ঘটনা আমি যখন চিটাগাং কলেজে পড়ি। আমার এক বান্ধবী ছিল। ওরা দুই বোন। ওরা দুই বোনই মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসতো। একদিন রাত ২টা সময় আমাদের ঘরের দরজা নক করছে। আমরা আম্মাকে দরজা খুলতে বারণ করলাম। বার বার নক করছে। আম্মা দোয়া পড়তে পড়তে দরজা খুলল। দেখলাম আমার বান্ধবীর বড় বোন। দরজা খুলতেই বললো আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছি। আমাকে একটু থাকতে দেন। আম্মা বললো এত রাতে মেয়েটা কোথায় যাবে। বাইরে আরো বিপদে পড়বে। সকালে সব শুনবো। এভাবে আম্মা মানুষের পাশে দাড়াতো। পরের দিন অনেক বিপদ হতে পারত। কিন্তু আম্মা বললো– আল্লাহ আমার সাথে আছে।

উনার বড় মেয়ে শাহনাজ আতহার বলেন, "আম্মা সবসময় আমাদেরকে আহমদীয়াতের বন্ধনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতেন। উনার মধ্যে তাকওয়া ছিল। উনি অসুস্থ অবস্থায় যখন হাসপাতালে ছিলেন আমরা বোনেরা পালাক্রমে আম্মার কাছে থাকতাম। যেদিন আম্মা মারা যায় তার ২ দিন আগে আমি হাসপাতালে আম্মার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এই বলে আম্মা আসি কাল আবার আসব। আম্মা আমার হাত ধরে বললেন তোমার সাথে আর দেখা হবে না। আমি আহমদীয়াতের যে শিক্ষা তোমাদের দিয়ে গেছি সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করবে।"

আত্মীয়তার পরিমন্ডলে সবার সাথে উনার স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। নিজের শ্বশুরবাড়ী ও মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী সবার সাথেই উনার মেহমানদারী ছিল আন্তরিক। উনার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বলতো মোহসেনা বেগম সাহেবার হাতের রান্না খেয়ে আসলে একমাস পরেও রান্নার ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

নিউইয়র্কে খালাম্মা যখন হাসপাতালে ছিলেন অনেক ডাক্তার নার্স উনাকে দেখাশুনা করতো। খালাম্মা অসুস্থ থাকা অবস্থায় উনার ব্যবহারে ডাক্তার ও নার্স মুগ্ধ হয়ে উনার মেয়েদের বলেছে– 'She is a very nice lady with good karma.'

উনি নিউইয়র্কের সাউথ শোর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উনাকে দাফন করা হয়– Washington Memorial Park Graveyard, Long Island, N.Y.

পরিশেষে বলব মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমার বিনীত প্রার্থনা আল্লাহ তা'লা যেন আমার খালাম্মাকে জান্নাতের সুউচ্চ মোকাম দান করেন (আমীন)।

সত্যস্বপ্ন দেখার মাধ্যমে আমার বয়আত গ্রহণ

জান্নাতুল ফেরদৌস ফারুকা

"আহমদীয়াত"– শব্দটি এখন আমার কাছে আর নতুন নয়। কেননা আল্লাহর অশেষ রহমতে আজ আমিও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন সদস্যা। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার স্বামী, চট্টগ্রামের একজন সাংবাদিক, জামাল উদ্দিন সাহেব জামা'তে ইসলামীর রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘ এক বছর যাবত আমি তার কাছ থেকে "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত" সম্পর্কে শুনছিলাম। কিন্তু তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ নিয়ে আমার মনে কোনরূপ আগ্রহ জাগ্রত হয়নি। হঠাৎ শুনি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ জুম্মাবারে আমার স্বামী বয়আত গ্রহণ করেছেন। এই কথা শুনেই আমার শরীরে এক ঝাঁকুনী অনুভব হলো। আমি আমার স্বামীকে অনেক বুঝালাম যেন বয়আত গ্রহণের কথা আত্মীয়স্বজন এবং তার জামা'তে ইসলামীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রকাশ না করে। কিন্তু তিনি তার উল্টো করলেন এবং আমাকেও বললেন এই জামা'ত সত্য। আরও বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই দুনিয়ার একমাত্র সত্য জামা'ত যার নিদর্শন কোটি কোটি আহমদী পেয়েছেন। আমি তখন সত্য মিথ্যা যাচাই করার চেয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী, বাবার বাড়ী, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের লোকদের নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি।

আমার স্বামীর বয়আত গ্রহণের পঞ্চমদিনের রাতে আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি আমার স্বামীর সাথে এক নতুন মসজিদে গিয়েছি যেখানে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি আছে। সকালে উঠে আমি আমার স্বামীকে স্বপ্নের কথা জানাই ও আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে বলি। আমার স্বামী কাল বিলম্ব না করে, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (২৭ ফেব্রুয়ারি ঘূর্ণিঝড়ের ৯নং সংকেত ছিল) আমাকে চকবাজার, চট্টগ্রামে অবস্থিত "বায়তুল বাসেত মসজিদ"-এ নিয়ে যান। মসজিদে প্রবেশ করেই বুঝতে পারি, এটা সেই মসজিদ যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আসরের নামায মওলানা জাফর আহমদ সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাদের কোয়ার্টারে আদায় করি। পরবর্তী শুক্রবারে আমি জুম্মার নামাযে আবার মসজিদে যাই। নামাযে আমি অন্যরকম আনন্দ অনুভব করি। মক্কা-মদীনায় জামা'তে নামায পড়ার মতো অনেকটা অনুভূতি হয় আমার। কিন্তু আহমদীয়াতের কিছু বিষয় নিয়ে আমার স্বামীর সাথে ঝামেলা হতে থাকে। পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। এর আগে, আমার পরিবারে কখনও এতো অশান্তি ছিল না। আমার মন অস্থির হয়ে যায়। রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে আমি অনেক কান্নাকাটি করি এবং আল্লাহকে বলি, হে আল্লাহ! এই জামা'ত সত্য হলে আমাকে নিদর্শন দেখান আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে রক্ষা করেন, এই বলে দোয়া করতে থাকি। ঐ রাতে আমি স্বপ্ন দেখি, আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকজন আমাকে ধাওয়া করছে জমি-জায়গার বিরোধ নিয়ে। আমার ননদ আমাকে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু আমি আমার সন্তানকে নিয়ে পালাতে পারছিলাম না। বাড়ীর চারদিকে যেন অথৈ পানি। এমন সময় একটা নৌকা এসে আমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যায়। নৌকাতে আরো লোকজন ছিল। নৌকায় একজন মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলেন যে এখানে আহমদী সাংবাদিক জামাল সাহেবের স্ত্রী কে? আমি হাত তুলি এবং বলি আমি আহমদী, আমার স্বামীও আহমদী। তখন আমি মনে করলাম এটাই আল্লাহর নিদর্শন। আমি আহমদী না হয়েও নিজেকে আহমদী ঘোষণা করলাম। এই স্বপ্ন দেখার পর আমার মন স্থির হয়ে গেল। পরবর্তী জুম্মাবার, ৮ই মার্চ, ২০১৯ তারিখে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ইমাম মাহদী হিসেবে মেনে খোদা তা'লার মদদে বয়আত গ্রহণ করি। আমার ধার্মিক স্বামীর সুবাদে আমি এই আলোর পথ পেয়েছি। আমার বয়আত গ্রহণের সহযোগী হিসেবে মোহতরম জাকির হোসেন সেতু সাহেব, মোহতরম মওলানা জাফর আহমদ সাহেব ও তার সহধর্মিণী ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

আমার জীবনে আহমদীয়াত

নাহিদ সুলতানা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি নাহিদ সুলতানা। লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের সদস্যা। ১৬-৮-২০১৭ইং তারিখে আমি বয়আত গ্রহণ করি (আলহামদুলিল্লাহ্)। আমি আহমদীয়াতের সংবাদ পাই আমার স্বামীর মাধ্যমে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করে শেষ করতে পারব না। কেননা আল্লাহ তা'লা আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন (আহমদীয়াতের মাধ্যমে)। আমি যদি আহমদীয়াতের সংবাদ না পেতাম, আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। আহমদীয়াতের মাধ্যমে আমি ইসলামের সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি। কেননা আমি অ-আহমদী থেকে আহমদী হয়েছি তাই আমি ভুল এবং সঠিক পথের পার্থক্য বুঝতে পারছি আল্লাহর ফযলে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া তিনি আমাকে এই আহমদীয়াতের মাধ্যমে নতুন জীবন দান করেছেন এবং আল্লাহ তা'লা আমাকে দুটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। দুইজন'ই ওয়াকফে নও, আলহামদুলিল্লাহ্।

সত্য স্বপ্ন–

বয়আত নেয়ার আগে থেকেই আমি বর্তমান হুযূর (আই.)-কে স্বপ্নে দেখি। বয়আত নেয়ার পর এ পর্যন্ত ৪টি স্বপ্ন দেখি যার মধ্যে ২টি পূরণ হয়েছে। বাকীগুলোর ব্যাখ্যার জন্য হুযূর (আই.)-এর নিকট চিঠি পাঠিয়েছি।

১ম স্বপ্নের পূর্ণতা–

বয়আত নেয়ার এক সপ্তাহ আগে আমি স্বপ্নে দেখি আমাদের বর্তমান খলীফা একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হুযূর (আই.)-এর পেছনে অনেক লোকজন হাঁটছেন। আর সেই রাস্তায় অনেক ধুলাবালি উড়ছে। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হুযূর (আই.)-কে দেখছিলাম আর ঠিক তখন-ই হুযূর (আই.) আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন এবং আমাকে হুযূর (আই.) তার ডান হাত তুলে দেখান। এই স্বপ্ন দেখার এক সপ্তাহ পর আমি বয়আত নেই। উল্লেখ্য, বয়আতের আগে আমি কখনই আমাদের খলীফার ছবি দেখি নাই।

২য় স্বপ্নের পূর্ণতা–

আমার দ্বিতীয় সন্তান কনসিভের সপ্তম মাসে দেখি হুযূর (আই.) আমাদের বাসার একটি খাটে বসে আছেন। আমার প্রসব ব্যাথা বাড়ছে আর কমছে। কিন্তু ডেলিভারী হচ্ছেনা। আমি হুযূর (আই.)-এর সাথে দেখা করি আর হুযূর (আই.) আমাকে বলেন চিন্তা না করতে, এবং এও জানান যে আমার নরমাল ডেলিভারী হবে। এরপর যেদিন আমার বাচ্চা ডেলিভারী হওয়ার তারিখ ছিলো সে সময়ে স্বপ্নটি বাস্তবে রুপান্তরিত হয়। কেননা, আমার বাচ্চার ওজন ছিলো ৩.৮ কেজি তাই ডাক্তার বলেছিলেন এটি সিজারিয়ান হবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, আমার নরমাল ডেলিভারী হয় এবং আল্লাহ তা'লা দ্বিতীয়বারের মতন পুত্র সন্তান দান করেন।

স্মৃতিতে আমার আব্বা-আম্মা ও আমাদের পরিবার

সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত

আজ আমি আমার আম্মা সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবার কিছু স্মৃতিচারণ করছি। আমার আম্মা জন্মগত আহমদী ছিলেন। আমার আব্বা মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব কাদিয়ানে লেখাপড়া শেষ করার পর কাদিয়ানে খলীফা সানীর (রা.) প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সে সময়েই আব্বা-আম্মার বিয়ে হয়। আব্বা-আম্মা বেশ কয়েক বছর কাদিয়ানেই বসবাস করেন। কাদিয়ানেই আমার বড় ভাই সৈয়দ মমতাজ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। ফজরের নামাযের সময় হুযূরকে ছেলে হওয়ার সংবাদ জানান, হুযূর সঙ্গে সঙ্গেই নাম রাখলেন 'সৈয়দ মমতাজ আহমদ।'

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় হুযূরের আদেশে বগুড়া চলে আসেন। সেখানে খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের বাসায় যে মসজিদ ছিল সেখানেই পরিবার সহ থাকতেন। আমার আম্মা উর্দুভাষী ছিলেন। ভালো উর্দু জানতেন এবং অনেক বই পড়তেন। নিজের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় বাংলা শিখে ফেলেন। আম্মা বলতেন, "যে দেশে থাকবো সে দেশের ভাষা না জানলে মানুষকে আপন করা যায় না।" দুপুরে বিশ্রামের সময় আমাদের বাংলা বই এর গল্পগুলো পড়তেন, পাশাপশি অন্য গল্পের বইও পড়তেন। উর্দু আল ফযল, আল বুশরা, বদর পত্রিকা আমাদের বাসায় আসতো। আম্মা সেগুলোও পড়তেন। আমাদেরকে অনেক কিছু পড়ে শুনাতেন।

বগুড়ার পর আব্বা চট্টগ্রামে বদলী হয়ে যান, এরপর ঢাকায় বদলী হন, ঢাকা থেকে আাবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় বদলী হয়ে আসেন। এর কিছুদিন পর আবার চট্টগ্রামে বদলী হন। কিন্তু এতে করে আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হতে থাকে, সেজন্য আম্মা আর আব্বার সাথে বদলীকৃত জায়গায় যান নাই। আমরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই ছিলাম এবং সেখান থেকেই পড়াশুনা করি। স্কুল কলেজ বাসার কাছেই ছিল।

বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে যেসব নতুন জামা'তের জন্ম হয়, যেমন: সুন্দরবন, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ সহ আরও অনেক জামা'ত যার গোড়াপত্তন আব্বার হাত ধরেই সূচনা হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার আব্বা মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী হিসাবে চট্টগ্রাম দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তখন মসজিদটি বেড়ার ছিল। সাল আনুমানিক ১৯৫৩-৫৪ হবে। একদিন একজন খাদেম (সঠিক নাম মনে নেই) এসে বললেন, বাইরে লোকজন জমি মাপ ঝোক করছেন। তখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের জন্য জমি একোয়ার বা রিকোজিশন বা জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছিল। আব্বা তাড়াতাড়ি শেরওয়ানি পাগড়ি পড়ে ওদের সামনে গিয়ে বললেন, এটা আমাদের মসজিদ। যে অফিসার এসেছিলেন তার সাথে আলাপ করে জানতে পারলেন অফিসার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 'অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের' ছাত্র এবং তিনি আমার দাদা মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবরও ছাত্র ছিলেন। দাদা অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাওলানা ছিলেন।

আব্বার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলার পর অফিসার সাহেব তার লোকজন নিয়ে চলে যান। আর এভাবেই সেদিন আমাদের মসজিদ বায়তুল বাসেত রক্ষা পেয়েছিল। সেই বেড়ার মসজিদ এখন কত পরিবর্তন হয়ে তিনতলা সুন্দর মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। উল্লেখ্য যে, বেশ কয়েক বছর আগে চট্টগ্রামের সালানা জলসায় প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব উনার চট্টগ্রামের স্মৃতিচারণে এই ঘটনাটিও বর্ণনা করেছিলেন।

আম্মা সবসময় আব্বাকে বই লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। বলতেন, আপনি যা জানেন তা লিখেন জামা'তের কাজে আসবে। আপনি শুরু করেন কোন সমস্যা হলে আল্লাহই ব্যবস্থা করে দেবেন। আব্বা যেই তিনটি বই লিখেছেন: ১) আহমদীয়াত ২) সীরাতে সুলতানুল কলম ৩) জযবাতুল হক (অনুবাদ) যা আম্মার অনুপ্রেরণার ফসল।

আগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় লাজনা ইমাইল্লাহর কোন কার্যক্রম চালু ছিল না। আম্মার চেষ্টায় প্রথম লাজনা ইমাইল্লাহর কার্যাবলী চালু

করা হয়। সহিদুন নেসা নামে এক স্কুল টিচার ছিলেন। তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। আহমদী পাড়ার দুইটি হালকাকে উত্তর হালকা, দক্ষিণ হালকা আর মৌড়াইল এই তিনটি হালকায় বিভক্ত করা হয়। করিমুননেসা, হাজেরা বারী সহ অনেকেই বিভিন্ন পদে কাজ করতেন (সবার নাম এখন আমার মনে নেই)। আম্মা সবাইকেই কীভাবে কী করতে হবে সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন। সবাই উৎসাহী হয়ে সবকিছু করতেন। মাঝে মাঝে হালকা মিটিং হতো, সেসব মিটিং এ আমরাও যেতাম।

লাজনাদের মাসিক চাঁদা চার আনা ছিল। অনেকে কমও দিত। কর্মীরা বাসায় বাসায় গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। সবকিছু খাতায় লিখিতভাবে হিসাব রাখা হত।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মৌলভী পাড়ায় বাংলাদেশের প্রথম মসজিদ 'মসজিদুল মাহদী'-তে জুম্মার নামায, জলসা সহ সব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু মহিলাদের জুম্মার নামাজের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার আব্বার চেষ্টায় মসজিদের পেছনের দিকে পর্দা টাঙ্গিয়ে মহিলাদের জুম্মার নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর মসজিদের বারান্দা নির্মাণ করা হয়। এই বারান্দা আগে ছিল না। জলসা মসজিদের সামনে খোলা-প্রঙ্গনে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার জন্য পাশের নওয়াব মিয়া সাহেবের বাড়ীর আঙ্গিনা ব্যবহার করা হতো। মহিলারা আমাদের বাসায় জলসা শুনতে আসতেন।

খলীফা রাবে (রাহে.) খলীফা হবার আগে একবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় উনার বিবিসহ জলসায় এসেছিলেন। উনার বিবি আমাদের বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

১৯৬৩ সালে খোদ্দামদের ইজতেমা শেষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সালানা জলসা লোকনাথ দিঘীর পাড়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় মাগরিবের নামাযের পর জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু জলসা শুরু হবার কিছুক্ষণ পরই জলসাগাহে অ-আহমদীরা আক্রমণ করে জলসা পন্ড করে দেয়। অনেক লোক আহত হয়। যখন জলসাগাহে তান্ডব চলছিল তখন কিছু লোক 'মসজিদুল মাহদী' তে আগুন দিতে আসে। কিন্তু হঠাৎ আচমকা ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এতো জোরে বাতাস হচ্ছিল যে তারা ভয় পেয়ে কেরোসিন সহ সবকিছু ফেলে পালিয়ে গেল।

আল্লাহ তা'লা এভাবেই 'মসজিদুল মাহদী' কে রক্ষা করলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর হাসপাতাল আহত লোকে ভরে গেল। রাতেই ওসমান গনি শহীদ হন এবং পরদিন আব্দুর রহীম শহীদ হন। রাতেই শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। আহমদীরা মার খেলো, উল্টা আহমদীদেরকেই আসামী করে মামলা করা হলো। এই ঘটনার পর যারা আগে জামা'তে আসতো না তারাও জামা'তে আসতে শুরু করলো। জুম্মায় মসজিদসহ সামনের মাঠে লোক ভরে যেত।

দুই ঈদের নামায হতো লোকনাথ দিঘীর পাড়ে। একটি টেনিস খেলার কোট ছিল। সেখানে পর্দা ঘিরে মহিলাদেরও নামাজের ব্যবস্থা করা হতো।

একবার তাহরীক করা হলো ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মসজিদ পাকা করা হবে। তখন পাকিস্তান আমল, অনেক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ঢাকায় থাকতেন। তারা অনেক টাকা চাঁদা দিলেন। মসজিদ তৈরী হলো। তাদেরকে দাওয়াত করা হলো। কয়েক জন আসলেন এবং রেল ষ্টেশন থেকে প্রথমেই দাদা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কবর জিয়ারত করতে আসেন, 'মসজিদুল মাহদী'ও সেখানেই অবস্থিত, তখন তারা বলেন, তারা তো মনে করেছিলেন 'মসজিদুল মাহদী' পাকা করা হবে। আহমদী পাড়ায় যে মসজিদ পাকা করা হয়েছিল সে মসজিদ পরে বিরুদ্ধবাদীরা দখল করে নেয় যা এখনও আহমদীরা ফিরে পায়নি।

আম্মা একবার স্বপ্ন দেখেন 'মসজিদুল মাহদী'কে কয়েকটি হাতী এসে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঙতে পারে নাই। ১৯৬৩ সালে 'মসজিদুল মাহদী'তে আগুন দিতে এসেও কোন ক্ষতি করতে পারে নাই। এভাবেই স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'লা 'মসজিদুল মাহদী'কে সব বিপদ আপদ হতে রক্ষা করবেন।

২০১২ সালে বাংলাদেশের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানের সূচনা 'মসজিদুল মাহদী'তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার দাদাজান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রখ্যাত আলেম ও জামে মসজিদের বড় ইমাম ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বড় মাওলানা নামে বিখ্যাত ছিলেন। উনার অনেক মুরিদ ছিলেন। আহমদী হওয়ায় সবাই উনার বিরোধী হয়ে গেলেও অনেক মুরিদ আহমদী হয়ে যান, আলহামদুলিল্লাহ। দাদাজান বাংলাদেশের আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আমীর ছিলেন। দাদাজানের নামেই পাড়ার নাম 'মৌলভী পাড়া'।

আমাদের দুই ঘর ছাড়া সবাই অ-আহমদী। কিন্তু সবাই আম্মাকে খুব সম্মান করতো, বিশ্বাস করতো। কারো কোন সমস্যা হলে আম্মার পরামর্শ চাইতো। কাজের বুয়া অন্যের বাসায় কাজ করে তার টাকা আম্মার কাছে জমা রাখতো। বাড়ী যাওয়ার সময় নিয়ে যেতো। আম্মা সেই টাকা যেভাবে দিয়ে যেতো সেভাবেই আলাদা করে রেখে দিতেন। নিজের টাকার সাথে রাখতেন না। আমি বুয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি আম্মার কাছে টাকা কেন রাখো? সে বললো "অনেকের কাছেই রেখে দেখেছি টাকা চাইলেই খালি ঘুরায়, কিন্তু এখানে রাখলে আমি চাইলেই পাই কোন চিন্তা থাকে না।"

আমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আম্মা খুব সচেতন ছিলেন। অনেকে বলতো মোবাল্লেগের মেয়েদের লেখাপড়া করে কি হবে? খলীফা সালেসের (রাহে.) অনুমতি নিয়ে সবকিছু সামাল দিয়ে আমাদের পড়াশুনায় সহযোগিতা করেছিলেন বলেই আমি ও আমার বড় বোন সৈয়দা আমিনা বেগম বি.এ. পাস করি। আমার ছোট বোন সৈয়দা নাঈমা বেগম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করে। আমরা তিন বোনই ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. ডিগ্রী লাভ করি।

আব্দুল মালেক মাষ্টার সাহেব ছোটবেলায় আমাদেরকে বাসায় এসে পড়াতেন। উনি আব্দুল আলীম মহুরী সাহেবের বড় ভাই ছিলেন। একদিন আমার বড় বোনকে এসে বললেন "একটা দরখাস্ত লিখে দাও সি.এস.পি মোহাম্মদ আলী বাড়ী এসেছেন, তাকে দিয়ে তোমার চাকরীর ব্যবস্থা করাবো"। পরদিন এসে বললেন, তোমার চাকরী হয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া 'সাবেরা সোবহান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে'। তিনি নিজে সাথে করে স্কুলে নিয়ে গেলেন। এভাবে চাকরী হবে আমরা কেও কল্পনাও করিনি। চাকরীর কোন প্রস্তুতিও ছিল না। বি.এড. ট্রেনিং পরে নিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা 'নারিন্দা সরকারী হাই স্কুল' হতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং ছোট বোন বর্তমানে কানাডা প্রবাসী।

আমরা ৩ ভাই ৩ বোন। বড় ভাই সৈয়দ মমতাজ আহমদ, যিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০১৪ সালের ২১শে অক্টোবর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হী রাজিউন), মেঝ ভাই সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, বর্তমানে কানাডা প্রবাসী এবং ছোট ভাই সৈয়দ সরফরাজ আহমদ বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্য।

মসজিদুল মাহদী সহ আমাদের বাসগৃহ জামা'তকে আগে মৌখিকভাবে দেওয়া হয়েছিল। ১৯ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে আমরা সব ভাই-বোন মিলে জামা'তের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি। তখন কিন্তু আমাদের কারো নিজস্ব বাড়ী-ঘর ছিল না। আমরা ভাড়া বাসায় ও চাকরী সূত্রে সরকারী কোয়ার্টারে বসবাস করতাম। এখন কিন্তু সবারই নিজস্ব ঘর-বাড়ী হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আব্বা ও আম্মা দুজনেই খুব মিশুক ও সৌখিন ছিলেন। মোবাল্লেগ হিসাবে তখনকার সময়ে আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। কিন্তু বাহির থেকে কেউ তা বুঝতে পারতো না। আমাদের পাড়ার লোকেরা, আমাদের বন্ধু ও খেলার সাথীরা সবাই মনে করতো আমরা অনেক বড়লোক। আমরা মনে করি এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'লার অনেক বড় ফযল। আম্মা আমাদেরকে সবসময় সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন। অল্পতে তুষ্ট থাকতে শিখিয়েছেন। ঝগড়া করতে নিষেধ করতেন। বলতেন– কথায় কথা বাড়ে, লাভ কিছু হয় না। তাই চুপ থাকতে বলতেন। চুপ থাকলে অনেক আপদ দূর হয়।

আব্বাকে খলীফা সালেস (রাহে.) ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের মুরুব্বী ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব অর্পন করেন, যা ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক বৈরী পরিস্থিতির কারণে ছুটি শেষে আর ইসলামাবাদে যাওয়া হয়নি।

আব্বার ব্যবহার মানুষের মনে কীভাবে দাগ কাটতো তার ছোট্ট একটা উদাহরণ হঠাৎ মনে পড়লো, আমি ও আমার স্বামী মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব ২০১০ সালে কাদিয়ান গিয়েছিলাম। তখন কাদিয়ানের জামেয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন মাওলানা হামিদ কাওসার সাহেব। আমরা উনার সাথে দেখা করে আমাদের পরিচয় বললাম। আমি আব্বার কথা বলার সাথে সাথেই উনি বললেন, "আমিতো উনাকে ভালো করেই চিনি। সেবার উনি অমৃতসর থেকে কাদিয়ান আসার সময় বাস থেকে উনার সুটকেস চুরি হয়ে যায়। সবকিছু হারিয়ে উনি খুব পেরেশান ছিলেন।"

সুটকেস চুরি যাওয়ার ঘটনা আমার কিন্তু মনে ছিল না, ভুলে গিয়েছিলাম। উনি বলার পর ঘটনাটি আমার মনে পড়ে। এই ঘটনা ১৯৭৩-৭৪ সালের। এতোদিন আগের ঘটনা উনার কিন্তু ঠিক মনে ছিল। একজন মানুষকে কতটা সম্মান করলে তার জীবনের এতো ক্ষুদ্র ঘটনাও যে মনে থাকে সেটা দেখে আমি খুব অভিভূত হয়েছিলাম।

আব্বা ১৯৮৬ সালে ওমরা হজ্জ পালন করার তওফিক লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। পরে লন্ডন সফর করেন এবং খলীফা রাবের সাথে মোলাকাত করেন।

আমার নানাজান সৈয়দ মুসি রাজা সাহেব অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় আহমদীয়াতে দাখিল হন। উনার পিতা অনেক অত্যাচার করেন যেন আহমদীয়াত ছেড়ে দেন কিন্তু আহমদীয়াত না ছাড়ার কারণে বাড়ী থেকে বের করে দেন। এরপর নিজের চেষ্টায় জায়গীর থেকে পড়াশোনা করেন। সেই ব্রিটিশ আমলে 'এনট্রান্স' পাস করতেন। ব্রিটিশ আমলের দোতলা বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। পরিস্থিতির কারণে ১৯৪৭ সালে সব কিছু ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও চট্টগ্রামে রেলওয়েতে চাকরী করেছেন। চট্টগ্রামেও অনেকদিন ছিলেন। ১৯৭০ সালে করাচী চলে যান।

আমার নানীজানের নাম সৈয়দা কানিজ ফাতেমা। উনিও খুব পরহেজগার ও দোয়াগো মহিলা ছিলেন। আমার আম্মারা পাঁচ বোন ও একভাই ছিলেন। আমার বড় খালা সৈয়দা খাদিজা বেগম। বিয়ের পর থেকেই কলকাতায় থাকেন। আমার খালু

জনাব ফজল করিম সাহেব অনেকদিন আগেই কাদিয়ান জলসা যাওয়ার পথে অমৃতসরে হৃদরোগে মারা যান। উনার ছেলে মেয়েরা তখন সবাই ছোট ছিল। সংগ্রামী জীবন শেষে এখন সবাই প্রতিষ্ঠিত। সবাই জামা'তের সাথে নিবেদিত প্রাণ।

জামা'তের পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের লাজনার প্রাক্তন সদর বুশরা হামিদ খালার পূত্রবধু। মেঝ খালা সৈয়দা মোবারেকা বেগম এর বিয়ে হয় বাংলাদেশের পটুয়াখালীতে। খালু আব্দুল বারী তালুকদার একাই আহমদী ছিলেন। বাচ্চাদের ভাল তরবীয়তের জন্য পরিবারকে 'রাবওয়া' পাঠিয়ে দেন। তাদের বড় ছেলে আব্দুল খালেক। বর্তমানে লন্ডনে থাকেন। এম.টি.এ এর কল্যাণে আব্দুল খালেক বাঙ্গালী নামে তাকে অনেকেই চিনেন। বাংলাদেশের সালানা জলসায় প্রায় প্রতি বছরই আসেন।

আমার সেজ খালা সৈয়দা আমিনা বেগম পাকিস্তানের করাচী প্রদেশের জেলা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হিসাবে অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে মেয়ের কাছে কানাডা প্রবাসী। ছোট খালা ও মামা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন।

নানাজান ১৯৮৩ সালে করাচীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। উল্লেখ্য যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) নানাজানের কফিন গ্রহণ করার জন্য রাবওয়া রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নানাজানের জানাযা পড়ান। রাবওয়া বেহেশতি মাগবেরাতে শোহাদার অংশে দাফন করা হয়। নানীজান ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। তাকেও বেহেশতি মাগবেরাতে দাফন করা হয়।

আমার আম্মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৩ সালের ২৯শে জুলাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। আব্বা ১৯৯০ সালের ১১ই মে তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন)। দুজনেই ঢাকায় বনানী কবরস্থানে সমাহিত আছেন। কাদিয়ানের বেহেশতী মাগবেরাতে দুজনেরই কদবা (নাম ফলক) লাগানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'লা উনাদের সবাইকেই যেন বেহেশতের উচ্চ মোকাম দান করেন। আমীন।

ফিরে দেখা দিনগুলো

মুসলেহা জাফর

প্রথমেই মহান আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেননা তারা আমাকে অভিব্যক্তি বর্ণনা করার সুযোগ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ২০১৩ সালে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ হতে বদলী হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছাই। চট্টগ্রামে সেদিন ছিল আমাদের প্রথম জুমুআর নামায। আমি নামাযের পরে স্টেজে দাঁড়িয়ে যখন সবার সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম তখন একজন ওয়াকেফিনে জিন্দেগীর পরিবারের প্রতি সেখানকার সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা এবং আন্তরিকতা দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। আল্লাহ তা'লার ফযলে প্রতিটি পরিবারের সাথে অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি পরিবার ভাবতেন মুরুব্বী সাহেবের সাথে তাদের সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেকেই সুখ-দুঃখের কথা মুরুব্বী সাহেবকে অবগত করতেন। আসলে প্রকৃত অর্থে এটিই খেলাফতের কল্যাণ। আমি মনে করি লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা আনুগত্যের দিক থেকে অগ্রগামী। যেকোন অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্ট সাহেবার নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘ সময় মসজিদে অবস্থান করে তা সাফল্যমন্ডিত করেন। অন্যান্য স্থানেও চট্টগ্রামের উদাহরণ দিয়ে সব সময় বলি যে উনারা মসজিদ কমপ্লেক্সকে নিজেদের সময় কাটানোর স্থান বানিয়ে নিয়েছেন। বরং বলা উচিত আনন্দের ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করেন। একবার আমার ঘরে একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর পরিবার জামা'তের কোন কাজে এসেছিলেন। উনাকে নিয়ে চট্টগ্রামের কয়েকজনের পরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। উনি অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন যে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্যগণ জামা'তের ওয়াকফে জিন্দেগীদের অনেক বেশী সম্মান করেন। আজ প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে সেখান থেকে চলে আসার। তবে সত্যিকথা হচ্ছে আজও প্রায় সময় নিজ পরিবার এবং অন্যদের সাথেও চট্টগ্রাম জামা'তের কোন না কোন কথা স্মৃতিচারণ করি। এমনকি আমার ছেলে মেয়েরাও অনেক সময় চট্টগ্রাম জামা'তের কথা বলে। জামা'তের সাবেক বর্তমান সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবা, জামা'তের কর্মকর্তাসহ সকল সাধারণ সদস্যাগণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মহান আল্লাহ তা'লার দরবারে দোয়া করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তা'লা আপনাদের এই মহান উদ্যোগকে সমস্ত দিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন এবং আপনাদের উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

যখন আমি নাসেরাত ছিলাম

তুবা আহমেদ

নাসেরাত থাকাকালীন সবচেয়ে পুরাতন যে স্মৃতির কথা মনে পড়ে তা হলো চাঁদরাতের কথা। ঈদের আগের দিন সেই দুপুর বেলাতেই আমরা নাসেরাতরা ঝাঁক বেঁধে মসজিদে চলে যেতাম। বিথী আপু, মুক্তা আপু, অপেক্ষা আপু, দোলা আপু, রত্না আপু, প্রিমা আপু সহ আরো অনেককেই আমরা মেহেদী লাগিয়ে দেওয়ার জন্য অতিষ্ঠ করে ফেলতাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আপুরাও প্রচন্ড ধৈর্য্য নিয়ে আমাদের একেকজনকে মেহেদি লাগিয়ে দিতেন। প্রতিবারই দেখা যেত কারো না কারো মেহেদির নকশা হাতে লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর এই জন্যে সে কি কান্না! আবার দুই হাতের এপিঠ ওপিঠ ভরে মেহেদি না দিলে যেন আমাদের ঈদ সম্পূর্ণ হতো না।

নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের কথা লিখতে গিয়ে যার নাম বারবার মনে পড়ছে তিনি হলেন যুঁথি আপু। সেই ছোট্ট থেকে উনি আমাদেরকে আগলে রেখেছেন, কোনো প্রতিযোগিতায় ভালো করতে না পারলে কোলে তুলে আদর করেছেন। যত যাই হোক না কেন, যুঁথি আপুর মিষ্টি হাসি মাখানো চেহারাটা দেখলে মনে হতো সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রত্যেক বছর আমরা নিজেরা দেয়ালিকা তৈরী করতাম। মাসখানেক ধরে সবার থেকে লেখা সংগ্রহ করে নাসেরাত দিবসের দু'তিন দিন আগে থেকে কাজ শুরু করতাম। দেখা যেত নাসেরাত দিবসের আগের দিন রাত ৮টা বেজে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তখনো মসজিদে। মুক্তি আপু, আমি, ফিজা, ঐশী আপু, উপমা সহ অনেকে মিলে আমরা দেয়ালিকা তৈরী করতাম। আবার একই সাথে অন্যান্য অনেক নাসেরাত মসজিদ সাজাতো।

নাসেরাত দিবসটা আমাদের জন্য মহা আনন্দের একটা দিন ছিল। প্রতি বছর সবাই অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম এই দিনের জন্য। সবার মনেই একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি করত তা হল শ্রেষ্ঠ নাসেরাত কে হবে? আর এই শ্রেষ্ঠ নাসেরাত হওয়ার আশায় সারা বছর জুড়ে আমরা সব কিছুতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতাম। নিয়মিত নামায আদায়ের অভ্যাসটা আসলে তখন থেকেই সবার মাঝে ধীরে ধীরে গড়ে উঠা শুরু করে। আর আমাদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল পুরষ্কার। সারাদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, খেলাধুলা করে দিনশেষে যখন পুরষ্কার পেতাম তখন মনে হত যেন এভারেস্ট জয় করে এসেছি! তখনকার এই ছোট ছোট খুশিগুলো আসলে আমাদের কাছে এখন মহামূল্যবান স্মৃতির ভান্ডার।

আরেকটা মজার স্মৃতি মনে পড়ে। তা হলো মসজিদে ওয়াকারে আমল করা। আমরা তখন খুবই ছোট, কাজ তেমন পারিনা। কিন্তু ওয়াকারে আমল শুনলেই আমি, ফিজা, সারা, ঐশী, নিতু সহ অনেক নাসেরাত আমাদের মা'দের হাত ধরে ছুটে চলে আসতাম। হয়তো খুব একটা সাহায্য করতে পারতাম না। কিন্তু আমরা মসজিদে যেতে পেরেই মহা খুশী!

বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য মসজিদ সাজানো, কোরাসে নযম প্র্যাকটিস করা, একসাথে সব নাসেরাত দল বেঁধে ক্লাস করা, ক্লাসে পড়া দেওয়া- এই সবকিছু এখন খুব মিস করি। নাসেরাত থাকা অবস্থায় শুধু মন চাইতো লাজনা হতে। কিন্তু লাজনা হয়ে এখন মনে হয় তখনকার সময়টাই আসলে সবচেয়ে সুন্দর ও সরল ছিল।

নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম আমার ছোটবেলাকে রঙিন করেছে। এত এত সুন্দর স্মৃতি রয়েছে যা দিয়ে হয়ত একটা উপন্যাসও লিখে ফেলা যাবে। আমি তাই সব বড় আপু, আন্টি ও আমার বন্ধু (যাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে সেই পিচ্চিকালেই) সবার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, আমার নাসেরাত জীবনটা এতটা সুন্দর করার জন্য। উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত অনেকেই এখন আর দেশে নেই। কিন্তু দোয়া করি যে যেখানেই আছেন, যেন ভালো থাকেন, জামা'তের ছায়ায় থাকেন।

আজ এখানেই শেষ করছি। সবার প্রতি অনুরোধ রইল আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি নিজেকে একজন আদর্শ লাজনা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

আমার আহমদীয়াত গ্রহণ এবং কিছু ঘটনা

তাহমিনা মোজাফফর

আমি তাহমিনা মোজাফফর, স্বামী: মোজাফফর আহমদ নিজামী। বিবাহসূত্রে বর্তমানে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্য। এই লেখনীতে আমি আমার আহমদীয়াত গ্রহণ এবং কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো।

প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য্য মহান আল্লাহ তা'লা যেন বাংলার গ্রামগুলিতে দান করেছেন। শান্ত পরিবেশ, গাছগাছালি, পাখির কলতান, ধোঁয়ামুক্ত নির্মল বাতাস, ফসলে ভরা ক্ষেত-খামার, পুকুর খাল-বিলে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ-এ সবই বাংলার গ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা।

এমনই ছায়াশীতল গ্রাম বানিয়াজন, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। যদিও সময়ের পরিক্রমায় প্রকৃতির রূপ মলিন হতে চলেছে।

আমার দাদা মরহুম আব্দুল হাকিম সাহেব ছিলেন সহজ সরল অন্য দশজন গ্রামের মানুষগুলোর মতই। তিনি ও আমার দাদী কেউই আহমদীয়াত গ্রহণ করেননি। ছোট্ট একটা দোহাই দিতো বারবার আমার দাদার ভাইকে যদি বুঝানো যায় এবং উনি যদি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তবে তিনিও বয়আত করবেন। সাবেক ন্যাশনাল আমীর শ্রদ্ধেয় মোবাশশের-উর রহমান এবং বর্তমান ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব অত্র এলাকায় বিভিন্ন জামা'তী প্রোগ্রামে আসলে তবলীগ করতেন কিন্তু আমার দাদা দাদীর সৌভাগ্য হয়নি সত্য গ্রহণের। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা সত্য ইসলামের পতাকার নীচে আসার সৌভাগ্য লাভ করি আমার বড় মামা মোজাফফর আহমদ (দাঈ ইলাল্লাহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এর মাধ্যমে। আমার মামা মোজাফফর আহমদ, মরহুম প্রফেসর আব্দুল জব্বার সাহেবের নিকট থেকে সুসংবাদটি পান এবং বয়আত গ্রহণ করেন। সেই সাথে আমার এক কাকাও বয়আত গ্রহণ করেন।

এর দু'বছর পর আমার মা ও খালাম্মা বয়আত করেন উনাদের তবলীগেই। আমরা মরহুম প্রফেসর আব্দুল জব্বার সাহেবকে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করতে এবং তাঁর সাথে আমাদের পরিবারের একটা আত্মীয়তার মত সম্পর্ক দেখেছি। এখানে উল্লেখ্য তখন আমার মা অবিবাহিতা ছিলেন, যখন তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

পারিবারিকভাবে উনারা আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য যতটা না তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী তিরস্কার এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন পারিপ্বার্শিকতা থেকে অর্থাৎ গ্রাম প্রতিবেশীদের দ্বারা। আমি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেই আহমদীয়াতের প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা দৃঢ় টান ও ভালোবাসা ছিল। কিন্তু কিছুই তখন বুঝিনা। ইমাম মাহদী (আ.), খিলাফত ইত্যাদি বিষয়ে কোন জ্ঞানই ছিলনা। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'লার যিনি আমাদেরকে সত্য চেনার ও গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন।

এখানে আমার মামা মোজাফফর আহমদ সম্পর্কে একটু বলি। উনার সমস্ত কাজই ছিল জামা'ত সংক্রান্ত। বই পড়া, কোরআন তেলাওয়াত এমনকি রাস্তায় এক টুকরো কাগজ পেলেও কুড়িয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। কেন্দ্রীয় চিঠি পত্রের জবাব ড্রাফট লিখে দিতেন আমি ফ্রেশ করে লিখতাম নিয়মিত। কোথাও থেকে কোন টাকা পয়সা হাতে পেলে চলে যাওয়ার আগে চাঁদা পরিশোধ করতেন। উনার আহমদীয়াত গ্রহণের পর অন্য মামারা এবং আত্মীয়স্বজনদেও সাথে তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠতা দেখিনি বরং উনাকে সবাই পরিত্যাগ করেছিল। আল্লাহ তা'লার অপার কৃপায় এখন মামারা সবাই এমনকি পুরো পরিবার খাঁটি ইসলামের ঝান্ডায় সমবেত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আহমদী হওয়ার আগে দেখতাম আমার বড়ভাই দুজন শুক্রবার হলে পালাতো কারণ আমাদের বাড়ির সাথে অ-আহমদী মসজিদ। শুক্রবার হলে পুরো পাড়ার লোক সেখানে নামায আদায় করতো। সামাজিকতার জন্যই হোক বা অন্য কারণে আমার জ্যাঠা মানে বড় চাচা আমার ভাইদের খুঁজতো মসজিদে নেয়ার জন্য। (সারা সপ্তাহ অবশ্য তাঁর নামাযের কোন তাগিদ ছিল না)। তাই উনারা সকালেই বাড়ি ত্যাগ করত আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হোসনাবাদে আহমদীয়া মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন কাঁচা রাস্তা ছিল, তেমন রিক্সা, ভ্যান কিছু ছিল না। তাই উনারা বাড়ির পাশের ক্ষেতের আইল ধরে সেখানে পৌছাতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার হাঁটা পথে হেঁটে উনাদের সাথে আমারও কয়েকবার আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়।

এভাবে চলতে চলতে বানিয়াজানে একটি ছোট্ট খড় ও পাটখড়ির বেড়া দেয়া নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়, হোসনাবাদের হালকা হিসেবে। সেই ছোট্ট মসজিদ একদিন গ্রামের কিছু যুবক এসে ভেঙে সামনে বড় পুকুরে ফেলে দেয়।, এরপর থেকে মাঝেমাঝেই

মোখালেফাত চরমে পৌঁছে। রাস্তাঘাটে অপমান, বাজারে যাওয়া বন্ধ, মারধর, ভীতি প্রদর্শন, মেয়েদের তুলে নিবে ইত্যাদি। আল্লাহর ফযলে সেই খঁড়ের মসজিদটি আজ বড় টিনের ও কাঠের মজবুত মসজিদ। আল্লাহ চাইলে সেটা একদিন পাকা মসজিদ হবে ইনশাল্লাহ। মসজিদ সংলগ্ন একট সুন্দর মুরুব্বী কোয়ার্টারও আছে।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, ১৯৯৮-এর শেষ দিকে এলাকার মাদ্রাসার এবং গ্রামের প্রভাবশালী লোকজন সালিশের আয়োজন করে সব কাদিয়ানীদের তওবা করতে হবে, না হলে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হবে। প্রচুর লোক সমবেত হয়েছে। তাদের মধ্যে আমার স্কুলের এক বান্ধবীর বাবা যিনি একটি কলেজে পড়ান এবং এলাকায় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু সুদের কারবার ছিল, উনার ভূমিকাই মুখ্য ছিল। সেই ঘটনাটি আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। আমি চিন্তা করি এদের সম্পদ প্রতিপত্তি আছে কিন্তু এরাতো মূর্খ ও অসৎ লোক। এমন অনেক ঘটনাই আছে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা– "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো।" তাই এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সহজেই আহমদীয়াতের বার্তা পুরো থানায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আশেপাশের কিছু লোকও সত্য গ্রহণের সুযোগ পান।

আমি ১৯৯৯ সালের মার্চে আমার মামার তবলীগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর এই সত্য জামা'তে দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। এক বছর পর আমার বাবা বয়আত করেন। আমার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমি স্টুডেন্ট অবস্থায়ই ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় শামিল হই এবং চাঁদা প্রদান করি, হুযূরের নিকট প্রতি মাসে না হলেও নিয়মিত চিঠি লেখা আমার অভ্যাস ছিল। একবার একটি চিঠি ফ্যাক্স করতে পারছিলাম না। কারণ ঐ মুহূর্তে আমার নিকট ফ্যাক্স করার মতো টাকা ছিল না। চিঠিটি আমার ব্যাগেই রইলো। মন খারাপ অবস্থায় বাসাই আসি কিন্তু সেই কাজ আমার হয়ে যায়, আল্লাহর দয়া ও করুনায়।

আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ এটা অনেক অনেক বড় নেয়ামত এইজন্য বলছি কারণ অ-আহমদী পরিবারে বিয়ে হলেই সে এই সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, ঈমানী দুর্বলতার কারণে। আমার ফুপুরা ও অন্য বোনদের যাদের অনেক আগে বিয়ে হয়েছে, উনাদের আফসোস, দীর্ঘশ্বাস ও ঈমানী দুর্বলতা দেখে শুধু শুকরিয়া আদায় করি সেই মহান খোদার যিনি অনেক বড় পরীক্ষায় আমাকে সহজেই পাশ করিয়ে দিয়েছেন। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আহমদীয়াতের নেযামের অনুশাসন মান্য করার ও সর্বদা পালন করার তৌফিক দান করুন মহান আল্লাহ তা'লা সবাইকে।

২০০১-২০০২/২০০৩ সালগুলোতে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে এলাকার প্রভাবশালী দু তিনটে পরিবারের সাথে দ্বন্দ দেখা দেয় এবং আমাদের মসজিদের সামনে একটি বড় পুকুর যা আমার নানাবাড়ীর সেটা নিয়ে মামলাও চলছিল। যা পরবর্তীতে আমার নানাদের পক্ষেই রায় হয়। আমার বোন/আন্টিদের বিয়ে নিয়ে কিছু দ্বন্দ হয়, কেন অ-আহমদীদের সাথে বিয়ে দিবে না। এই বিষয়গুলো নিয়ে ইউ.এন.ও স্যারসহ থানার ওসি এবং থানার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকা হয় (ডাকে অবশ্য বিরুদ্ধবাদীরাই)। আমাদের এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরাট মাঠে কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়। আমাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয় আমাদের পরিবারের কয়েকজন দুর্বল মানুষ (আমার এক নানা, বড় ভাই, আমার দুজন মামা, এর মধ্যে এক মামার হার্টের চিকিৎসা চলছিল অর্থাৎ রোগী)। যাই হোক সেই জনসমুদ্রের জনরোষ থেকে মহান আল্লাহ উনাদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনেন। সেই সময়গুলোতে বাজারে, রাস্তায়, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি জায়গায় আমাদের পুরুষ সদস্যদের বহু অপমানিত ও শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়।

আর আল্লাহ তা'লাও তাঁর প্রতিশোধ নেন দু'তিন জন দুষ্ট লোকের। রাজনৈতিক কারণে তারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হল এত প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও। আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন।

সম্প্রতি একটি ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করছি ২০১৪ সালের। গ্রামের বাসস্ট্যান্ডের অদূরে একটি কওমী মাদ্রাসা হয় কয়েক বছর আগেই। সেই মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক জড়ো করা হয় আহমদী বিরোধী আন্দোলনের জন্য। তারা একত্র হতে থাকে গ্রামের পশ্চিমে অর্থাৎ শেষ প্রান্তের বাজারে। তারা আহমদীয়া বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে যায়। প্রায় দশ হাজার লোক জড়ো হয়। আর প্রশাসনের সাহায্য চাইলে দুইজন পুলিশ মসজিদ পাহারায় দেন এবং আমাদের মুরুব্বী সাহেব ও কয়েকজন (৩/৪ জন হবে) আনসার ও খোদ্দাম মসজিদ আঙ্গিনায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন। বাজারে সেই জনসভায় আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহমদীয়াত সম্পর্কে এবং আমাদের সম্পর্কে সত্য তথ্য উপস্থাপন করেন এই জন্য তিনিও কটুক্তির স্বীকার হন। যাই হোক মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় সন্ধ্যায় জনসমাগম শেষ হলে তারা বিচ্ছিন্নভাবে যার যার গন্তব্যে ফিরতে থাকে। উল্লেখ্য যে, তারা মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে কিন্তু যেজন্য তারা জড়ো হয়েছিল সেই আহমদী মসজিদের দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই একটি ধর্মীয় সভায় সেই বিরুদ্ধবাদী মৌলভী পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নাজেহাল হয়ে এলাকা ত্যাগ করে। এই হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহর ইচ্ছা এবং শাস্তি।

সকল ক্ষমতার উৎস এবং নবীদের সাহায্যকারী খোদা তাঁর ধর্মকে বিনাশ হতে দিবেন না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী হউন। আমীন।

আমার পরম মমতাময়ী শাশুড়ি মায়ের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও সত্যস্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়া

নাসরীন আক্তার পপি

১নং ঘটনা:

আমার শাশুড়ি মা ছিলেন পরম মমতাময়ী একজন মেয়ে, মা, স্ত্রী, শাশুড়ি। ওনার নাম হলো মৃত: মিসেস খালেদা খানম। আর ওনার বাবার নাম হলো মৃত: ডাক্তার নূর হোসেন ও মা হলেন মৃত: মিসেস পরী বিবি। আর আমার শাশুড়ি মায়ের দাদার নাম ছিলো জমিদার পুচ বেপারী। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমার শাশুড়ি মায়ের দাদার মাধ্যমেই ওনাদের বাড়ীতে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে এবং এরপর ওখানের অনেকেই আহমদীয়াত গ্রহণের পরম সৌভাগ্য লাভ করে। আর এটি ঢাকার মুন্সীগঞ্জ জেলার রিকাবি বাজার জামা'ত নামে পরিচিতি লাভ করে। আর গ্রাম হলো নূরপূর। এছাড়া আমার শাশুড়ি মা ছিলেন ওনার বাবা মায়ের ৫ম কন্যা এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনের বোন। ওনার অর্থাৎ আমার শাশুড়ি মায়ের বিয়ে হয় ১৯৬০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসুদেব গ্রামের মৃত মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ভূঁইয়ার সাথে অর্থাৎ আমার শ্বশুর বাবার সাথে। উনিও অনেক পূন্যবান ঈমানধারী ব্যক্তি ছিলেন এবং এমনকি অনেক জীবন্ত সত্য স্বপ্নও দেখতেন। যাক পরবর্তীতে কখনও সুযোগ এলে আমার পূণ্যবান শ্বশুর বাবা সম্পর্কে লিখব। এখন লিখছি আমার শ্বাশুড়ি মায়ের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও সত্য স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়া সম্পর্কে।

আমার শাশুড়ি মাকে আমার বিয়ের আগে থেকে যতটুকু সময় আমি দেখেছি উনি ছিলেন পরম মমতাময়ী একজন আদর্শ ও পরিশ্রমী স্ত্রী, মা, শাশুড়ি। কিন্তু উনি আমার বিয়ের ২ বছর আগে অর্থাৎ ২০০০ সালের ৪ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন, তাই এটি ছিল আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আজ আমি অনেক খুশি কেননা এই পূণ্যবতী শাশুড়ি মা সম্পর্কে কিছুটা লিখতে পারার সুযোগ পেয়েছি, তাই মহান আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া। এখন আমি আমার শ্বাশুড়ি মায়ের সত্য স্বপ্নগুলো তুলে ধরছি আপনাদের সামনে।

আমার মেঝো ননাশ অর্থাৎ মিসেস ফেরদৌসি আক্তার (বুলবুলি), যখন ওনার ফাজিলপুরে বিয়ে হয় তখন উনি আশেপাশের যত গয়ের আহমদী আত্মীয়স্বজন পাড়া পড়শিদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। সে সময় গ্রামের মানুষরা খুবই দরিদ্র ছিল। আর আমার মেঝো ননাশের বিয়ে হয় ১৯৮৬ সালে। কিছুদিন পর উনার সম্পর্কে মামাতো দেবর (অ-আহমদী) ওনার বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য যান তখন আমার মমতাময়ী শাশুড়ি মা ছিলেন ওনার মেয়ের বাড়ীতে। এরপর যখন উনি শুনতে পেলেন আমার মেঝো ননাশের মামাতো দেবরের ক্যান্সার এবং ডাক্তার বলে দিয়েছেন ঐ মামাতো দেবর কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে। আবার ঐ মামাতো দেবর আমার শাশুড়ি মা বেড়াতে এসেছেন শুনে ওনার মেঝো মেয়ের বাড়ীতে উনি চা নাস্তার দাওয়াত করেন অর্থাৎ ঐ মামাতো দেবরের বাড়িতে। ঠিক ঐ দেবরের বাসা থেকে দাওয়াত খেয়ে এসে আমার মেঝো ননাশের বাড়ীতে শাশুড়ি মা

আসরের নামায পড়েন ও অনেকক্ষণ সময় ধরে খুবই বিগলিতচিত্তে দোয়ায় রত ছিলেন এবং তারপর উনি একসময় সালাম ফিরিয়ে বলেন আমার মেঝো ননাশকে বলেন দুলাল অর্থাৎ ওনার মামাতো দেবর মারা যাবেন না। উনি হেসে বলেন মা এটি কি করে সম্ভব, ডাক্তার তো বলেছেন মারা যাবে, এরপর আমার শাশুড়ি মা বলেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। ঠিকঠাকই মহান আল্লাহর দয়া ও আমার পরম মমতাময়ী শাশুড়ি মায়ের দোয়ার বরকতে কেটে যায় এক এক করে ২২টি বছর। আবার এর মধ্যে ৩টি সন্তানও জন্মগ্রহণও করে। আর এই ৩টি সন্তানকে মানুষ করার পর এবং ছেলেদেরকে সঠিকভাবে কাজকর্মে নিয়োজিত করার পর হঠাৎ একদিন সে বলছে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে, আমি মারা যাব এবং ঠিকই উনি অর্থাৎ আমার মেঝো ননাশের মামাতো দেবর মারা গেলেন। আর এটিই হলো আমার পরম মমতাময়ী আদর্শবান ও পূণ্যবতী শাশুড়ি মায়ের দোয়া কবুলিয়াতের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আমার শাশুড়ি মা নাকি ওনার সন্তানদের জন্যও খুব দোয়া করেছেন। ঠিকই উনি সন্তানদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করার পর অর্থাৎ ২২ বছর পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

২নং ঘটনাঃ

আমার ৪ ননাশ ও ২ ভাসুররা যখন ছোট ছোট ছিল তখন আমার দাদী শাশুড়ি বলেছিল আমার শাশুড়ি মা নাকি দোয়া করেছিলেন উনার জীবদ্দশায় কোন সন্তান যেন মৃত্যুবরণ না করে মহান আল্লাহর কাছে। ৬ বছর বয়সে আমার মেঝা ভাসুর অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঠিক তখনও ১ম দোয়া কবুলিয়তের ঘটনার মতো উনি মহান আল্লাহর উপর অঢেল ভরসা ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে দোয়া করতে থাকেন বিগলিত চিত্তে, আর পরম দয়াময় মহান আল্লাহ আমার শাশুড়ি মায়ের দোয়া কবুল করেন এবং আমার মেঝো ভাসুর সুস্থ হয়ে আমার শাশুড়ি মায়ের কোলে ফিরে আসেন। আর এগুলোই ছিল আমার মমতাময়ী শাশুড়ি মায়ের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে এর আমল ও নিজেদেরকে পূণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে তৈরী করার তৌফিক দান করুন। আমিন, সুম্মাআমিন।

সুন্দরতম ফুলের স্মরণে

ফিজা আহমেদ

জামা'তের যেকোন স্মরণিকায় আমরা সাধারণত তাদেরকেই স্মরণ করার চেষ্টা করে থাকি যাদের অবদান জামা'তে অনেক। কিন্তু লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৫০তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় আজকে আমি এমন একজন সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি যার সুযোগ হয়নি জামা'তে অবদান রাখার। কিভাবে হবে? সে যে মাত্র সাত বছর বয়সেই আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেছে মহান আল্লাহর কাছে। তবে সে অকৃত্রিম ভালোবাসার গভীর ছোঁয়া রেখে গেছে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। জি হ্যাঁ, আমি স্মরণ করছি আমাদের প্রাণপ্রিয় দানিয়াকে।

দানিয়া ছিল চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক আমীর মোহতরম মরহুম মুনায়েম বিল্লাহ সাহেবের নাতনি এবং আহমদ দাউদ আঙ্কেল ও খালেদা দাউদ সিমি আন্টির বড় সন্তান। দানিয়ার জন্মের পর যখন সিমি আন্টি প্রথম তাকে মসজিদে আনেন তখন থেকেই দানিয়া ছিল আমাদের এক বিশেষ কৌতুহলের কেন্দ্র। দানিয়ার ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা, একটু একটু করে কথা বলা, হাঁটতে পারা এসব যেন এইতো সেদিনের কথা। দানিয়া যখন একটু বড় হয় তখন সে প্রতিদিন তার দাদার সাথে চকবাজার মসজিদে আসতো। মসজিদ ছিল তার প্রিয় জায়গা। ছোট্ট দানিয়া প্রজাপতির মতো সারা মসজিদ ঘুরে বেড়াতো। আর শুক্রবার জুমুআর খুতবার সময় দেখতাম সে তার দাদির পায়ের কাছে বসে থাকতো। দানিয়ার মিষ্টি হাসি আমি আজও ভুলতে পারিনি। তার কণ্ঠ, তার কথাগুলো মনে হয় যেন এখনো কানে বাজে। একবার তাদের বাসায় গিয়েছিলাম। সে কি তার আনন্দ! যত খেলনা ছিল সব বের করে নিয়ে এসেছিল আমাদের সাথে খেলার জন্য। আজও ভুলতে পারি না সেই ছোট্ট দানিয়ার কথা। তার কথা মনে হলে অজান্তেই চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম জামা'তের মানুষের স্মৃতিতে দানিয়া অমর। দানিয়ার সাথে ছিল না আমাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক। কিন্তু মনে হয় যেন তার সাথে রয়েছে আমাদের সবার আজীবনের গভীর সম্পর্ক, প্রাণের টান। এরই নাম বোধহয় আহ্‌মদীয়াত। দানিয়ার উচ্ছলতা, প্রাণ-চঞ্চলতা আমাদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সে যেন ছিল বাগানের সবচেয়ে সুন্দর ফুল। সর্বদা এই দোয়াই করি যেন আমাদের ছোট্ট দানিয়া মহান আল্লাহর কাছে অনেক ভালো থাকে।

আমি কীভাবে তবলীগে ফিরে আসলাম

নাসরীন সুলতানা নিপা

সর্বশক্তিমান মহান দয়ালু ও রহমান আল্লাহ তা'লার নামে শুরু করছি।

যিনি আমাকে আল্লাহ ও সত্যকে জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করা শিখিয়েছেন। আহমদীয়াত যে সত্য জামা'ত তা বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি নাসরীন সুলতানা জন্মগত আহমদী হওয়া সত্ত্বেও সত্য জামা'ত ও আল্লাহকে চিনতে ও উপলব্ধি করতে অনেক দেরী হয়েছে। কিন্তু তারপরও আমি রহীম ও রহমান খোদার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে তাঁর নিকট থেকেও নিকটে রেখেছেন। এই কথা বলার একটি কারণ হল তিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর সত্য জামা'তের সেবা করার জন্য নিয়োগ দান করেছেন। আমি অনেক সৌভাগ্যবতী যে নিজের অনেক খারাপ বা মন্দ দিক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ আমার মত নগণ্য একজন মানুষকে নির্বাচন করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ)।

আল্লাহ নিজ ফেরেশতা দ্বারা বিভিন্ন কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছেন যা একজন সাধারণ সদস্যার জন্য বুঝার ও কাজ সম্পূর্ণ করা অনেক কঠিন।

আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর আমি আমার স্বামী ও শাশুড়ির কাছে কৃতজ্ঞ। আমি সত্যিই সৌভাগ্যবতী কারণ তারা আমাকে সাহায্য না করলে আমি জামা'তের কঠিন কাজগুলো করতে পারতাম না। আজকাল কেউ কারো কাজের দায়িত্ব নিতে চায় না। আমার শাশুড়ির বয়সের কারণে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার অবর্তমানে আমার বাচ্চাদের ও সংসারের দেখাশোনা করেছেন। যাতে করে আমি জামা'তের কাজ করতে পারি। আজ পর্যন্ত আমাকে জামা'তের কাজে সময় দেওয়ার জন্য "না" শব্দ শুনিনি। সব অবস্থাতেই যেতে দিয়েছে। যত সময়ই লাগুক না কেন কোন দিন রাগ করেন নি। আমার স্বামীও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এছাড়াও প্রশাসনিক কাজগুলো শিখতে বা কিভাবে জামা'তের কাজ করতে হয় জামা'তের বিভিন্ন সদস্যাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাদের মধ্যে খালেদা দাউদ, মুশাররাত আফরিন, তাহেরা মির্যা, নীলুফার মমতাজ, বুশরা মজিদ আরও অনেকে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমি তালিম, তরবিয়ত, তাজনীদ, অডিট এবং খেদমতে খালক বিভাগে সেবা প্রদান করেছি (আলহামদুলিল্লাহ)। আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমতে আমি তবলীগের কাজও করেছি। এই কাজ আমাকে প্রথম শিখিয়েছেন মোহতরমা রওশন জাহান (ছন্দা) আপা। উনার হাত ধরেই তবলীগের কাজ শুরু হয়। আরেকজনের কথা না বললেই নয়। তিনি রাজশাহীর মেয়ে মোবাশ্বেরা বেগম আঁখি। আমার এই স্বল্প জ্ঞানে আমি আমার জীবনে প্রথম তবলীগ করা শুরু করি ২০১৭ তে কিন্তু এর আগে থেকে বিভিন্ন সময়, অবস্থা বা পরিস্থিতি বুঝে আমি অল্প স্বল্প তবলীগ করতাম বা আহমদীয়াতের প্রচার করতাম।

২০১৭ সালে পি.এস.সি ও জে.এস.সি পরীক্ষার সময় সদর সাহেবার সাথে বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রে লিফলেট বিলি করার মাধ্যমে তবলীগ করা শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে তার মাধ্যমে মাত্র তিন দিনেই আমরা প্রায় ১৫০-২০০ জনকে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছাই। পরের বার যখন এই প্রচার করে আনন্দ উপভোগ করলাম। তখন নিজেই একা আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর জন্য গেলাম। এরপর আঁখি আপু আর আমি মিলে প্রায় ২০০ জনকে লিফলেট ও প্রচার করি। এইভাবে ক্ষুদ্র জ্ঞানে আল্লাহর সত্য জামা'তের প্রচার করি। ২০১৮ সালের শেষের দিকে আমি ঘরে বসে হোম কোচিং শুরু করি। সেই সাথে তিন ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করানো ও ঘরের কাজে অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তবলীগে কিছুটা পিছিয়ে যাই। অনলাইনে এর মাধ্যমেও স্বল্প পরিমাণে তবলীগ করতাম। সেখানেও একটু পিছিয়ে যাই। যেহেতু আল্লাহ তা'লা এই নগণ্য বান্দার মাধ্যমে জামা'তের সেবা করাবেন তাই তাঁর সিদ্ধান্তের বা পরিকল্পনার বাইরে বান্দা কিছুই করতে পারে না। আমিও তার ব্যতিক্রম হলাম না। অবশ্য এই দুর্বলতার জন্য আমি নিজে দায়ী। যেহেতু পাবলিক পরীক্ষার সময়গুলো তবলীগে আশারা করা হতো এই কথা আমি

সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নেই যে ছাত্র-ছাত্রীদের সকালবেলা পড়িয়ে ফেললে বিকালে আমি বাচ্চাদের পড়াতে পারব ও বিশ্রাম নিতে পারবো। মনে হয় আল্লাহ তা'লার পরিকল্পনা ছিল তিনি আমার দ্বারা আহমদীয়াতের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছাবেন।

তাই জে.এস.সি পরীক্ষার ঠিক দুই দিন আগে আমার টিউশনিটা চলে যায়। যাই হোক একদিন পর প্রেসিডেন্ট সাহেবা আমাকে ফোন করে বললেন তবলীগে আশারা শুরু হচ্ছে তোমাকে যেতে হবে। তবলীগ করলাম প্রায় ১৪৫ জনকে লিফলেট ও আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছালাম। কিন্তু মনের ভেতর একটু কষ্ট রয়েই গেল। হঠাৎ জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় দুপুরবেলা যোহরের নামাযের পর আমি শুয়ে শুয়ে তসবীহ পড়ছি চোখ বন্ধ করে। হঠাৎ উপলব্ধি হল যে আল্লাহ তা'লা তো চেয়েছেন আমার দ্বারা তবলীগ করাবেন আর তিনি আমাকে জাগতিক কাজ থেকে নিজেই বিরতি দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সত্য প্রচারের কাজ করাবেন। আমি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ আমাকে মনোনিত করেছেন। ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ দ্বারা জামা'তের প্রচার করাবেন। তাই তিনি একদিকে যেমন কাজ বন্ধ করলেন তেমনি যাতে আমি বুঝতে পারি যে আল্লাহ তা'লা চাচ্ছে না আমি কোন জাগতিক কাজ করি এবং শুধুমাত্র জামা'তের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাই তিনি এই ব্যবস্থা করলেন। আমার মনের কষ্টগুলো আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম এই জামা'তী কাজ যেহেতু আল্লাহ তা'লা নিজ হাতে ধরে শিখিয়েছেন তাই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন হবে না। তাই শেষ পর্যন্ত বি.এড. করেও কোথাও চাকুরী করলাম না।

আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমতে বুঝতে পারলাম জামা'তের সেবা দানের মাধ্যমেই আনন্দ অনেক প্রশান্তি। সেই সাথে সংসারের গুরুদায়িত্ব পালন করার ক্ষমতাও আল্লাহ বৃদ্ধি করলেন। দুর্বল ছিলাম, অসহায় ছিলাম, একা ছিলাম; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'লার উপলব্ধি আমাকে সবল করেছে, আস্থা দিয়েছে। একাকীত্বকে দূর করে পরম আপন করেছেন আল্লাহ তা'লা।

বর্তমানে তবলীগ আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন যেখানে সুযোগ হয় ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাওয়াত পৌঁছাতে পারলে আমি আনন্দিত হই। কখনো একা কখনো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এই দাঈ ইলাল্লাহর কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি।

আমরা সবাই যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এই কামনা করছি।

আগুন থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে কন্যাসন্তান

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যাকে শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে আর সে ধৈর্য ধারণ করেছে, সেই মেয়েরা তার ও আগুনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলা, বাবু মা জায়া ফিন্নাফাকাতে আলাল বানাতে ওয়াল ইখওয়াত)

জগতে এমন কে আছে, যার ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তি ও পাপ সংঘটিত হয় না? এমন কে আছে, যে আল্লাহর আশ্রয় পেতে চায় না? প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভের বাসনা রাখে। তাই কন্যাসন্তানের পিতাদের জন্য এ সুসংবাদ যে, মু'মিন মেয়েদের কারণে তারা খোদার নিরাপত্তায় এসে যাবে। কিছু সমস্যা দেখা দেয়, এগুলোর সমাধান করা উচিত। মেয়েদের কারণে এই সমাজেও অনেক সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলো সহ্য করা আর কোনভাবে মেয়েদের সামনে তা প্রকাশ পেতে না দেয়া এবং মেয়েদের কারণে মায়েদেরকে কটাক্ষের লক্ষ্যে পরিণত না করাই হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'লা বলেন, এ কারণে এ কথাগুলো তার ও আগুনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(খুতবা জুমুআ, তারিখ: ১৯ নভেম্বর, ২০১০, মসজিদ ফযল, লন্ডন)

আমি কীভাবে আহমদী হলাম এবং আমার অনুভূতি

নাজনীন আক্তার পিংকি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি পবিত্র ও ঐশী জামা'তের নাম। মহান আল্লাহ তা'লার নির্দেশে কোরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী এই মহান ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যার মহান দায়িত্ব আল্লাহ তা'লা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমীক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও এক মহা পুরষ্কার।" (সূরা মায়েদা: আয়াত ১০)।

আল্লাহ তা'লা কুরআনে আরো বলেছেন যে, "সেই সব লোককে শান্তির পথে পরিচালিত করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলে। আর তিনি নিজ আদেশে তাঁদেরকে আঁধার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরল সুদৃঢ় পথে তাদের পরিচালিত করেন। (সূরা মায়েদা: আয়াত ১৭)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমি হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, আমাকে হেদায়াতপূর্ণ জীবনের দিকে চলার তৌফিক দিয়েছেন। আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি আধ্যাত্মিক জামা'ত। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে জীবনে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি এবং এখনও হচ্ছি। তবে এখন বুঝতে পারি জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় যেন আল্লাহ তা'লা স্বয়ং আমাদের সাহায্য করে চলেছেন। এইবার বলি আমি কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানলাম।

তখন আমি সবেমাত্র এসএসসি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমি সবসময় খেয়াল করতাম আমার বড় বোনকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন বই পত্র পড়তে। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আমার বড় বোন কী করে? সেই তখন থেকে আমিও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন বই পত্র পড়া শুরু করি এবং সাথে সাথে বুঝতে চেষ্টা করতাম আসলে এর মধ্যে কি আছে। অবশ্যই তেমন একটা ভালো করে বুঝতে পারতাম না তবুও পড়তে ভালো লাগতো এবং অনেক বেশী করে জানার ও বুঝার ইচ্ছা আগ্রহ বাড়তে থাকলো। এভাবেই আমার শুরু হয় 'আহমদীয়াত' সম্পর্কে জানা ও বুঝার। এরপর থেকে আমিও মসজিদে নিজে নিজে আসা যাওয়া শুরু করি। তখনও কিন্তু আমরা কোন বোন আহমদী ছিলাম না। তবুও মসজিদে গিয়ে নামায পড়া এবং সবাইকে দেখতাম একসাথে মিলেমিশে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধর্মীয় ক্লাসগুলো নিতে। এগুলো দেখে খুব ভালো লাগতো। নিজের কাছেও জানার ইচ্ছা ছিল প্রবল। যদিও প্রত্যেক শুক্রবার মসজিদে আসতে হতো অনেক কৌশল করে। সকাল সকাল বান্ধবীর বাসা, এরপর আযান শুনলেই মসজিদে কেউ না দেখে মত ঢুকে পড়তে হতো। আমাদের পাশের এলাকায় আহমদী একটি পরিবার ছিল। উনারা খুবই ভালো মনের মানুষ ছিলেন। পার্শ্ববর্তী হওয়ার সুবিধার্থে আমাদের আসা যাওয়া থাকতো। যার কারণেও বলা যায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি ও বুঝেছি। এভাবেই প্রায় বছর কেটে গেল। এইবার মনস্থির করলাম আমিও বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হবো। আমি যে দিন বয়আত ফর্ম পূরণ করবো সেইদিন কীভাবে যেন বাসায় খবর চলে গেল। বিভিন্ন মানুষ এসে বললো আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা কাদিয়ানি মসজিদে যায়। তাদেরকে সামলান নয়তো আপনাদেরকেও এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেইদিন শুক্রবার ছিল আমি জুমার নামাযের পর বয়আত ফর্ম পূরণ করে বয়আত নিবো, তখনই খবর পেলাম মসজিদের গেইটের সামনে আমার বড় ভাই ও উনার বন্ধুরা মোটর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বার বার খবর পাঠাচ্ছে এখানে পাঁচলাইশ এলাকার (নাজনীন/পিংকী) নামে কেউ আসছে কিনা। যদি থাকে তবে ডেকে দিন নয়তো অসুবিধা হবে। বেশ কয়েকবার খবর পাঠালে আমি ভয়ে চুপ করে বসে থাকি। বয়আত হয়ে যাওয়ার পরে আমি মসজিদের পিছনের গেইট দিয়ে পালিয়ে বান্ধবীর বাসায় চলে যাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বাসায় গেলে আমাকে

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো তখন আমি সাহস করে কিছুই বলতে পারিনি কিন্তু আমি জানি আল্লাহ মানুষের অন্তর্যামী। তিনি প্রতিটা মানুষের মনের খবর রাখেন। যাই হোক না কেন। আলহামদুলিল্লাহ। অবশেষে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হয়েছি। তখন মনে হচ্ছিল আমার আত্মা তার শান্তি খুঁজে পেয়েছে। কারণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জোছনার আলোর মত, যার মাঝে নিজেকে জড়ালে শুধু ভালোই লাগে না বরং আত্মার শান্তিও খুঁজে পাওয়া যায়। এর আকর্ষণীয় সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে ও ঈমানী শক্তিকে আরো মজবুত করে। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার বড় বোন যে আহমদী হয়েছে তার খবরও পেয়ে যায় বাসায়। তখন অন্য মসজিদের ইমামকে আনিয়ে তওবা পর্যন্ত করিয়েছে। আমাকেও আর ঘর থেকে বের হতে দেয় না। আমাদের পাশের আহমদী পরিবারটি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন সামনে সালানা জলসা আন্তর্জাতিকভাবে হবে এবং সেখানে বিশ্ব বয়আত হবে, তখন আমরা দুই বোন যেভাবেই পারি লুকিয়ে মসজিদে যাই। এরপর থেকেই আমাদের পরিবারে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে- বলতে গেলেই আমাদেরকে উনারা মেয়ে বলেই অস্বীকার করেছে এবং আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এরপর আমাদের বিয়ে হয়ে যায় আহমদী ছেলের সাথে। উনারা অনেক ভালো মানুষ। দীর্ঘ দশ বছর পর মা-বাবার সাথে হুযূরের দোয়ায় ও আল্লাহর রহমতে সম্পর্ক ঠিক হয়েছে কিন্তু আগের মতো নয়।

যাক এতে আফসোস নেই বরং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া জানাই যে, আমরা আলোর সন্ধান পেয়েছি। আমি এই জামা'তে এসে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি আর মনের দিক থেকে নিজেকে অনেক সাহসী ও অদ্ভুত শান্তি অনুভব করি। আমি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি পবিত্র ও ঐশী জামা'তের সাথে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাদের সবার উচিত অল্প করে হলেও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়া, মসজিদে নিয়মিত আসার চেষ্টা করা, হুযূরের খুতবা শোনা, জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ঐশী জামা'ত সম্বন্ধে আরো ব্যাপক ধারণা পেতে পারি। এতে আমাদের জামা'তের প্রতি ভালোবাসা আরো বাড়বে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ও সহায়ক হবে। আর সব কিছুর উপর নামায পড়া, যার মাধ্যমে বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থায় উন্নতি সম্ভব। আমারও সবসময় এই অনুভূতি হয় যে, যেকোন বিপদে আল্লাহ তা'লা আমাদের রক্ষা করেন শুধুমাত্র আহমদী হওয়ার কারণে এবং আমাদের যুগ খলীফার দোয়ার বরকতে। আমরা যেন নিজেকে একজন প্রকৃত আহমদী হিসেবে গড়ে তুলতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করুন। আমীন।

খলীফা মাসরূর

আমাতুল নাজিম কুদসিয়া

মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর
দূর হতে শুনি তব ভুবন ভোলানো মোহনীয় সুর।

তব স্মরণে চোখে আসে জল,
হৃদয় হয় ব্যাথাতুর।
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

তুমি আমাদের বেঁধেছ
এক পবিত্র বাঁধনে।
সে বাঁধন আরো দৃঢ় হয়
হৃদয়ের টানে।
খেলাফতের রজ্জু ধরে যাবো বহুদূর।
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

তব হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠে
ঘুমন্ত প্রাণ।
হৃদয় বীণার তারে বেজে উঠে
সুরেলা গান।
কলরবে মুখরিত হয়ে উঠে
মৃত হৃদয় অন্তঃপুর।
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

তুমি শান্তির দূত, দিকে দিকে লয়ে যাও শান্তির বাণী।
ঘৃণা নয় প্রেম দিয়ে মুছে দাও
সব হৃদয় গ্লানি।
দূর হতে শুনি সেই শান্তির সুর।
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

তুমি আমাদের রুহ, আমাদের প্রাণ।
প্রতিনিয়ত পাই তব
সুরভিত ঘ্রাণ।
দিগন্তে ঐ শোনা যায় এক অলৌকিক সুর
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
হৃদয় সিংহাসনে নিয়েছ যে ঠাঁই।
পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার সময় তো নয় বহুদূর
মাসরূর, মাসরূর, মাসরূর।

আমি কীভাবে আহমদী হলাম

উম্মে হাবিবা রিমু

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহহু। আমি সর্বপ্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংবাদ পাই আমার বড় ভাইয়ের কাছে। আল্লাহ তা'লার সাহায্যে বড় ভাই অনেক চেষ্টার পরে ৫ই এপ্রিল ২০১৯ সালে বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার পর নানার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি। বড় ভাই মামা-মামি পরিবারকে সবাইকে এই জামা'তের সংবাদ দেয়। আমার খুব আফসোস লাগে পৃথিবীতে শেষ যুগে ইমাম মাহদী আসবে এই কথা ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়স্বজন, পাড়ার প্রতিবেশী কারো থেকে শুনি নাই। বড় ভাই বলার পর মামা থেকে শুনেছি একজন ইমাম মাহদী আসবে। আমাদের শহরে বাসা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবারকে জামা'তের সাথে সংযুক্ত করা। ৬ মে ২০১৯ সালে (১লা রমযান) আমরা বাসায় আসছি। রমজান মাসে ইফতারের পর দুই ভাইয়ের মাঝে তর্ক বিতর্ক শুরু হলে সেহরির সময় শেষ হয় যায়। আব্বু বাসায় আসলে আরো ঝগড়া বেড়ে যেত। কারণ সমাজে এমনকি আত্মীয় স্বজন কেউ এই জামা'তে আসে নাই। মানুষের কাছ থেকে শুনেছে ঘর-বাড়ী ছাড়তে হবে এমনকি নির্যাতিত হতে হবে। বড় ভাই আমাকে জামা'তের বিভিন্ন বই পড়তে বলতো। বইগুলো যত পড়ি তত ভালো লাগে। মা-বাবাকে বুঝাতাম কোরআনের আয়াতের অর্থ এবং বিভিন্ন হাদীস এর অর্থ পড়লে খুবই ভালো লাগতো।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। (আবু দাউদ, মিশকাত)

আরেক হাদীসে বলেছেন–

যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে অজ্ঞতার (জাহেলিয়াতের) মৃত্যুবরণ করবে (মুসনাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)।

আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করি এই যুগের ইমাম কে? আমরা তো যুগের ইমাম মানি নাই। ভাইয়া আমাকে বললো আহমদীদের আলেমরা তের শতাব্দী পর্যন্ত আগমনকারী যুগের ইমাম কে উল্লেখ করেন কিন্তু চৌদ্দশতাব্দী যুগের ইমাম আগমন হয়েছে কিনা তা বলতে চান না। শুধু বলে ইমাম মাহদী আসবে। বড় ভাই বলল চৌদ্দ শতাব্দীতে ইমাম মাহদী এসেছে বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। সারা বিশ্বে ইমাম মাহদী ও খলীফার হাতে বয়আত নিয়ে মানুষ আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত রসূলাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপরও সে সকল অবস্থা আসবে যেরুপ বনী ঈসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে। এমনকি তাদের মধ্যে হতে যদি প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রূপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে এরূপই করবে। বনী ঈসরাইল তো ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকে জাহান্নামে যাবে কেবল মাত্র এক ফিরকা ব্যতীত। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই ফিরকা কোনটি? তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকা থাকবে। (তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান)। এটা পড়ার পর আমি আরো বেশী ভয় পেতাম। আমরা কোন ফিরকার মধ্যে আছি।

সূরা মুমিনুন (৫৪-৫৫)-এর অর্থ: "কিন্তু লোকেরা তাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মাঝে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলেছে। যা তাদের নিকট আছে তা নিয়েই প্রত্যেক দল গর্ব করছে। অতএব, তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে থাকতে দাও।"

সাহাবীদের পথ ও কার্যাবলীয় দৃষ্টান্ত এ ছিল যে, যতদিন নবী করীম (সা.) সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তাঁরা তাকে

সর্বান্তঃকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করে গিয়েছেন। হুযূর আকদাস (সা.)-এর ইন্তেকালের পরক্ষণেই তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের একটি কেন্দ্র ছিল। তাদের বায়তুল মাল ছিল। খলীফাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মজলিসে শুরা ছিল। তাদের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল একে অপরের জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তর বস্তু এমনকি জীবন পর্যন্ত কোরবান করতেন। তারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন।

সূরা নূর এর ৫৬ নং আয়াতে খিলাফত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন–

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন।"

আমি এরপর ভাইকে জিজ্ঞেস করি এই কর্মপদ্ধতি কোন দলের মধ্যে রয়েছে? ভালো করে যাচাই কর কোন দলে আছে? ভাইয়া আমাকে বললো আমি সুন্নি পরিবেশে বড় হয়েছি ঐখানে দেখি নাই। পাশে ওয়াহাবি ছিল তাদের মাঝে দেখিনি। জামা'তে ইসলাম থেকে বড় চার বোন আমাদেরকে দাওয়াত দিতে এসেছিল তখন জেএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। তাদের মাঝে বিভিন্ন রকমের ভালো বৈশিষ্ট্য দেখেছি সারাদিন কীভাবে চলবো ঠিক এরকম একটা রুটিন দিয়েছে। সাহাবাদের সব বৈশিষ্ট্য ওদের মাঝেও নাই। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে বড় ভাই এই জামা'তে আছে বলে স্বীকার করতো। আমার মেনে নিতে খুব কষ্ট হত। একদিন আমি কাপড় পরিষ্কার করছি তখন হঠাৎ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। শুধু মনে হয় দুনিয়াতে বেশিদিন বাঁচব না। এই কথা যখন মনে আসে তখন বেশি কান্না করতাম। একা হলে আরো বেশি কান্না করতাম। আম্মু আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করতো কেন কান্না করি। আমি বলতাম সবার জন্য খারাপ লাগে তাই। আমার শরীরে কোন অসুখ হলে ভয় পেতাম। যখন আমার টাইফয়েড হয়েছে তখন আমি মনে মনে খুব ভাবতাম আমি এখনও যুগের ইমামকে মানি নাই শুধু এই ভয় কাজ করত আর কান্না করতাম অনেক বেশি। আল্লাহ তা'লার কাছে শুধু ইবাদতে কান্না করতাম সত্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমতে আমার কাছে কেন মনে হত এই জামা'ত সত্য। একদিন আমি মসজিদে আসার জন্য বাসায় কাউকে না বলে ইংরেজী কোচিং এ গিয়েছিলাম ছুটি হলে মসজিদে যাব কিন্তু ঐদিন কোচিংটা বন্ধ ছিল আর যেতে পারি নাই। এরপর ভাইয়াদের সাথে আমার মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ বেড়ে যায়। কোরআনের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে এবং ভাইয়াদের সাহায্যে আমাকে সত্য পথ খুঁজার অনেকটা সহজ হয়েছে। ইমাম মাহদী আসলে, বিভিন্ন লক্ষণ আছে। চন্দ্র-গ্রহণ সূর্য-গ্রহণ হয়েছে ১৮৯৪ সালে রমজান মাসে পূর্ব গোলার্ধে, ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে। তার নাম, বংশ, জন্মস্থানের বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে সত্য প্রমাণ পেয়েছি। আল্লাহ তা'লা বলেছেন ইমাম মাহদী আসলে বরফের মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার হাতে বয়আত নিতে। তার আদেশ অনুযায়ী চলতে বলেছে। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকেই সালাম পৌঁছে দিতে বলেছে। সত্যের সন্ধানের জন্য বড় ভাই-বোন, মসজিদের লাজনা নাসেরাত ও জামাল ভাই ও ভাবির কাছ থেকে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আল্লাহ তা'লার সাহায্যে আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। আল্লাহ তা'লার অশেষ রহমতে আমি ৮ই নভেম্বর ২০১৯ সালে বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্তর্ভূক্ত হই। এরপর আমার মেজ ভাই ১৫ নভেম্বর ২০১৯ সালে বয়আত নিয়েছেন। তারপর আম্মু বড় বোন ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে বয়আত নিয়েছেন। ছোট বোন, খালাতো বোন ৩রা জানুয়ারি ২০২০ বয়আত নিয়েছে। ৪ই জানুয়ারী আমার ছোট ভাই আরফাতুল আলম এবং এরপর আব্বু বয়আত নিয়েছে। আল্লাহ তা'লার সাহায্যে আমাদের পুরো পরিবার জামা'তের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর একটি পথনির্দেশ

"আমাদের ধর্ম নারীর ওপর ঘরের তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃত অর্থে চিনতে না পারবে আর নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে না পারবে ততক্ষণ তোমাদের ঘরে শান্তি আসতে পারে না।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)

অর্ধ-শতবার্ষিকীতে আধডজন স্মৃতিচারণ

সারাহ সাঈদ (দোলা)

আসসালামু আলাইকুম। আজ লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৫০তম বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন হতে যাচ্ছে (আলহামদুলিল্লাহ)। ছোটবেলা থেকেই এই জামা'তের প্রত্যেকটি ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতাম। কিভাবে যেন ৫০টি ইজতেমা সম্পন্ন হয়ে গেলো, ভাবতেই অবাক লাগছে। নাসেরাত হিসেবে কোরআন তেলাওয়াত, নযম,বক্তৃতা তে; প্রস্তুতি থাক বা না থাক, নামটা লিখে দিতাম। সবার সাথে এই দ্বীনি প্রতিযোগিতায় লড়াই করার মজাই ছিল আলাদা যা আসলে কোনদিনই ভুলবার নয়। ইজতেমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব ছিল পুরষ্কার বিতরণী। প্রেসিডেন্ট সাহেবা পুরষ্কারভর্তি টেবিলের সামনে দাড়িয়ে যখন নাম ঘোষণা করতেন; একদম সামনের সারিতে বসে বুক কাঁপতে থাকতো আর অপেক্ষায় থাকতাম, "ইশ!! এইবার যদি আমার নাম ডাকে!" আল্লাহর ফযলে কোন না কোন প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার পেতামই। জার্মানিতে এসেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক পুরষ্কার পেয়েছি কিন্তু ওই কাচের প্লেট, বাটি আর গ্লাস পাওয়ার মধ্যে যে কি পরিমাণ একটা বৈপ্লবিক আনন্দ ছিল, সেটা আসলে অতুলনীয়। আজ অনেক দূরে আছি কিন্তু সেইসব পুরষ্কার, আজও শোকেসে সাজানো। কখনো ব্যবহার করতাম না, ভেঙে যাবে বলে। যত্নে সাজিয়ে রাখতাম।

বড়বেলায়, আল্লাহর অশেষ ফযলে জেনারেল সেক্রেটারী হওয়ার সুবাদে প্রতিযোগী থেকে হয়ে গেলাম আয়োজক (যদিও চুপি চুপি ইজতেমায় অংশ নিতাম, আর সবাই আমাকে বকতো বাকিদের সুযোগ নষ্ট করছি বলে.. কি করবো, প্রতিযোগী হওয়ার যে মজাটা ছোটবেলায় পেয়েছিলাম, সেটা মিস করতে চাইতাম না) যাই হোক , আয়োজক হিসেবে মাস দেড়েক আগে থেকে শুরু হতো প্রস্তুতি পর্ব। আমেলার মিটিংগুলো এত প্রাণবন্ত হতো; আজও মনে হলে মন আনন্দে ভরে যায়। নিলু আন্টি (নিলুফার মমতাজ), তাহেরা আন্টি (তাহেরা মির্জা), সূচী ফুপ্পি (রওশন আরা আহমদ), নাঈমা আন্টি (নাঈমা বুশরা), সিমি আপু, নিপা আপু, যুথী আপু,কণা আপু, মুক্তা আপু, রোকসানা আন্টি, খুশি আন্টি উনাদের সবার মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতায় ইজতেমা সম্পন্ন হতো। (কারো নাম বাদ পড়ে গেলে ক্ষমাপ্রার্থী)। ইজতেমার আগের দিন লাজনা হলে বসতো চাঁদের হাট। ছোট ছোট বাচ্চারা, মধ্য বয়সী বা বয়স্কা নানুরা যে যেভাবে পারতেন চলে আসতেন মসজিদ সাজাতে। ফিজা, তুবা, মুক্তি, সারা, বুশরা, ইমা এই ছোট বোন গুলা ছাড়া যেন ইজতেমা অসম্পূর্ণ লাগতো। মুক্তা আপু, আমি আর নাঈমা আন্টি যেতাম পুরস্কার কিনতে। সে আরেক মজার অভিজ্ঞতা। বলতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে আর সবাই মনে মনে বকবে। কুইজ প্রতিযোগিতাতে চলতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আমি সঞ্চালনা করতে গিয়ে নিজেই ধাঁধায় পড়ে যেতাম, কাকে ছেড়ে কাকে বলি। সবাই হাত তুলে উত্তর দিতে প্রস্তুত। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ থাকতো সেশনটা। ইজতেমা শেষ হলেই মন খারাপ হয়ে যেত।

চট্টগ্রাম জামা'ত অনেক প্রাণের আর ভালোবাসার একটি জামা'ত। অনেক বুজুর্গদের হারিয়েছি। শিখেছি অনেক কিছু। শতবার্ষিকীতে অংশ নেওয়ার তৌফিক আল্লাহ দিবেন কিনা জানিনা, তবে এটুকু বলতে পারি চকবাজারের বায়তুল বাসেতের লাজনা হলের তৃতীয় তলাটা, অফিস রুমের আলমারির আয়নাটা, বেসিনের নষ্ট কলটা, দেওয়ালে লাগানো বড় ঘড়িটা, হাতে লেখা গোটা দশেক পোস্টার, মাইক্রোফোনের প্যাঁচানো তারটা, আর ডায়াসের কুচকুচে কালো রঙটা এদের প্রচন্ড ভালোবসি। ভালোবাসি জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি লাজনা বোনদের। অনেক শুভকামনা রইল আগামী দিনের।

সোনালী স্মৃতি– খলীফা রাবে (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাত

তাহেরা হাসান দিবা

আলহামদুলিল্লাহ্। ২০০২ সালের জুলাই-আগস্ট মাস আমার জীবনের এক অসাধারণ ও স্মরণীয় সময় ছিল। যখন আমার স্বামী আমাকে বললেন যে, আমাদের চার সন্তানসহ সবারই ইংল্যান্ড জলসার আমন্ত্রণপত্র এসেছে এবং তার পরপরই আমাদের ইংল্যান্ডের ভিসা হয়। আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনেক শুকরিয়া জানাই। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জামা'ত থেকে আমাদের ১৬ জনের একটি গ্রুপ লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

জলসা চলাকালীন, খলীফা রাবে (রাহে.) যখন লাজনাদের অংশে আসেন, তখন তাঁর নূরানী চেহারা ও ব্যক্তিত্ব দেখে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। জলসায় অনেক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করি এবং নিজেকে আরো পরিপূর্ণ মনে হয়। জলসা শেষ হওয়ার পর আমরা ৬ জন হুযূর রাবে (রাহে.)-এর সাথে দেখা করি। এ যেন এক চমৎকার অভিজ্ঞতা, অতুলনীয় স্মৃতি। হুযূর রাবে (রাহে.) আমাদের সাথে অনেক আদর-স্নেহের সহিত কথা বললেন। আমি যখন নিজেকে নিজামউদ্দিন সাহেবের মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিলাম, তখন তিনি খুশী হয়ে বললেন, "ওহ নাযমো-ওয়ালে নিযামী সাহাব!" আমার পিতা অনেক ভালো নযম গাইতেন তা হুযূর রাবে (রাহে.)-এর জানা ছিল, তাই তিনি আমার পরিচয়ে আপ্লুত হলেন।

এখানে আমার পিতা নিজামউদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালে বিয়ে করে ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে এখনের বাংলাদেশে আসেন। তিনি চট্টগ্রামে ইস্পাহানী কোম্পানীতে চাকরি করতেন। যদিওবা আমাদের বাসা চকবাজার আহমদী মসজিদের কাছে ছিল, তিনি সেই মসজিদের সামনে দিয়েও যেতেন না আর আহমদীয়াত সম্পর্কে ভালো ধারণাও রাখতেন না। তবে একদিন নিজামউদ্দিন সাহেব সত্য আহমদীয়াত জানতে পারেন ইস্পাহানী কোম্পানীতে তারই একজন সহকর্মী মরহুম খাজা সাহেব-এর কাছ থেকে। মরহুম খাজা সাহেব ও দুজন আহমদী মুরুব্বী নিজামউদ্দীন সাহেবকে তবলীগ করলেন। তারা এটি স্পষ্ট করেন যে, নবী ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছে এবং তার কবর কাশমিরে রয়েছে। একই সাথে তারা নিজামউদ্দীন সাহেবকে ইমাম মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দেন। আগ্রহী হয়ে তিনি জামা'তের বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়েন ও আহমদীয়াতের সত্যতা বুঝতে পারেন ও তা গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

হুযূর রাবে (রাহে.)-এর আরো মনে ছিল যে তিনি আমার নিকাহ পড়িয়েছিলেন ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। আর ১৯৮৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি, আমার রুকসাতির দিন হুযূর রাবে (রাহে.) আমাদেরকে মোবারকবাদ জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠান।

জলসার পর, একটি প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে, আমার স্বামী হুযূর রাবে (রাহে.)-কে কাগজে লিখে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটি ছিল, "আমার জন্য কোন ব্যবসা সবচেয়ে ভালো হবে?" হুযূর (রাহে.) প্রপার্টির ব্যবসার কথা বলেন। তাঁর অলৌকিক পরামর্শ ও আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতের ফলে আমার স্বামীর প্রপার্টির ব্যবসা অনেক সফল হয়। আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শুকরিয়া, সত্যিই আমরা খিলাফতের উজ্জ্বল আলোয় জীবন যাপন করতে পারছি।

এই স্মৃতিগুলো কখনো ভুলবার নয়, এগুলো আমার মনে সর্বদাই গোলাপ ফুলের মতো পবিত্র ও রঙিন হয়ে থাকবে। সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি যেন আমি ও আমার পরিবার সারাজীবন খেলাফতের ছায়ায় থাকতে পারি। জাযাকাল্লাহ।

দোয়া কবুলিয়াতের ঘটনা

আমাতুল নাজিম কুদশিয়া

১.

আমি আমাতুল নাজিম কুদশিয়া। স্বামী মৃত নাজিম উদ্দিন, পিতা-মৃত মীর্যা আলি আখন্দ। আজ থেকে ১৫/১৬ বছর আগে স্বামীর কর্মসূত্রে গাজীপুর বসবাস করতাম ও গাজীপুর জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বে ছিলাম। একদিন 'আহমদী পথিক' এ জনৈক আহমদী সদস্যার সাথে হুযূর (আই.)-এর একটি সাক্ষাৎকার পড়ি। লেখাটা এতটাই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, আমি কাঁদতে শুরু করি। তখন থেকেই আমি হুযূর (আই.)-এর সাক্ষাতের জন্য অনেক বেশী দোয়া করতে থাকি। একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম হুযূর (আই.) বাংলাদেশে এসেছেন। আমি উনার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। অনবরত দোয়ার কারণে মনে হত লাগল কখনও হুযূর (আই)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হতে পারে। তখন আমার আর্থিক অবস্থাটাও ছিল না যে, লন্ডনে যেয়ে আমি সাক্ষাত করি। অবশেষে ২০১৫ সালে কানাডায় মেয়ের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়। ভিসা হওয়ার পরও কিছু পারিবারিক কারণে পরের বছর আমি কানাডায় যাওয়ার কিছুদিন পর শুনতে পাই এ বছর জলসায় হুযূর (আই.) কানাডায় আসছেন। মহান আল্লাহ আমার বাসনা পূরণ করেছেন। কানাডার Peace Village-এ হুযূর (আই.)-এর সাথে আমার মোলাকাত হয়। যুগ-খলীফার সাক্ষাৎ আমার একান্ত ইচ্ছা ও দোয়া কবুলিয়তেরই একটি নিদর্শন।

২.

এবার আমি আমার দোয়ার কবুলিয়াতের আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যা মহাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরুপ।

আজ থেকে প্রায় ১২/১৩ বছর আগে আমি চোখের এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হই। প্রথমে আমি ঢাকা বারডেম হাসপাতালের চিফ-আই সার্জন কে আমার চোখ দেখাই। তিনি আমার চোখ পরীক্ষা করে বলেন যে, আমার চোখের কর্ণিয়ায় মারাত্মক রোগ হয়েছে। যার কোনো চিকিৎসা নেই এবং আমি খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলব। তখন আমি খলীফা হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখি এবং আমি নিজেও দোয়া করতে থাকি। সেই সময়ে আমি স্বপ্নে দেখি যে, খলীফা হুযূর আমার চোখে হাত রেখে বলছেন যে, তোমার চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে। তখন আমি স্বপ্নের মধ্যে খুব আশ্চর্য হই এই ভেবে যে,ডাক্তার বলেছেন যে, আমি সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলব অথচ হুযূর বলছেন যে আমার চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে। তখন স্বপ্নের মধ্যে আমার মনে হলো যে নিশ্চয়ই আমার চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে। নাহলে তো হুযূর এমনি এমনি কথাটা বলেনি। এরপর আমি নিজেও দোয়া রত অবস্থায় একদিন স্বপ্নে দেখি যে, একজন লোক আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। যাকে আমার স্বপ্নের মধ্যে আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ চোখের ডাক্তার বলে মনে হলো। তিনি আমাকে বললেন যদিও আপনার চোখের রেটিনাতে মারাত্মক অসুবিধা হয়েছে কিন্তু আপনার চোখ ভালো হয়ে যাবে। তখন আমি ওনাকে প্রশ্ন করলাম সত্যিই আমার চোখ ভালো হয়ে যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ আপনার চোখ ভালো হয়ে যাবে। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর আমি এই কথা মনে করে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি যে,ডাক্তার বলেছেন আমার কর্ণিয়ায় অসুখ হয়েছে অথচ স্বপ্নে দেখা ডাক্তার বললেন যে আপনার চোখের রেটিনায় অসুখ হয়েছে। এরপর আমি চোখের চিকিৎসা করাতে চট্টগ্রাম এর পাহাড়তলীতে অবস্থিত চক্ষু হাসপাতালে আসি। আমার ছোট মেয়ে ফাহমী রাহাত সিলভি আমাকে চট্টগ্রাম এর চোখের ডাক্তার কে দেখাতে বলেন। চট্টগ্রামে ডাক্তার দেখানোর পর, ডাক্তার বলেন যে আপনার চোখের রেটিনায় অসুখ হয়েছে যার কোনো চিকিৎসা নাই তবে আমরা ইনজেকশন দিব কিন্তু যার কোনো গ্যারান্টি নাই। তখন ঢাকার বারডেম হাসপাতালের ডাক্তারের প্রেসকিপশন দেখাই এবং বলি যে আপনারা বলছেন যে, চোখের রেটিনাতে অসুখ হয়েছে অথচ বারডেম হাসপাতালের ডাক্তার বলেছেন আমার চোখের কর্ণিয়ায় অসুখ হয়েছে। তখন চট্টগ্রামের ডাক্তার বললেন উনি (ঢাকার বারডেম হাসপাতালের ডাক্তার) ভুল বলেছেন। ডাক্তার আমাকে চোখে ইনজেকশন

দেওয়ার কথা বলেন এবং সেই সাথে এই কথাও জানিয়ে দেন যে,এই ইনজেকশন এর কোনো গ্যারান্টি নাই। কিন্তু আমি তারপরও আমি মহান আল্লাহ তায়ালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইনজেকশন নিতে রাজি হলাম। প্রথম ইনজেকশন নেওয়ার সাতদিন পর ডাক্তার আমাকে দেখা করতে বলে। সাতদিন পর ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে বলেন, আমার চোখ এর কোনো উন্নতি হয় নাই। আমাকে এক মাস পর আবারও দেখা করতে বলেন। একমাস পরে আমি ডাক্তারের সাথে দেখা করতে আসি উনি আমার চোখ পরীক্ষা করে এবার খুব খুশির সাথে বলেন যে আপনার চোখ অর্ধেক ভালো হয়ে গিয়েছে এবং ডাক্তার আমাকে বলেন খুব তাড়াতাড়ি আরেকটি ইনজেকশন নিতে। ২য় ইনজেকশন নেওয়ার পর আমার চোখ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। যা ডাক্তার এর ভাষায় অলৌকিক ব্যাপার ছিল। ডাক্তার আমাকে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে বলেন যে, আপনার সাথে আমরা আরো অনেকের চোখে এই ইনজেকশন দিয়েছি কিন্তু কারো চোখ ভালো হয় নাই একমাত্র আপনার চোখ ভালো হয়েছে। ডাক্তরের পরামর্শ মতে আমি দুই চোখে লেন্স বসাই। এর ২/১ বছর পরে আমার চোখে আবার সমস্যা শুরু হয়।তখন আমাকে ডাক্তার 'রে' দিতে বলে, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক যা ব্রেনে আঘাত করতে পারে। এবার আমি আবার খলীফা হুযূরের কাছে চিঠি লিখি এবং আমার ইচ্ছা ছিল যে,খলীফা হুযূরের এর চিঠির উত্তর পাওয়ার পর আমি চোখে 'রে' দিব কিন্তু তখন আমাকে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর সাহেব (সেলিম সিরাজি) সাহেব বলেন যে, আপনি যখনই খলীফা হুযূরকে চিঠি লিখেছেন তখনই আপনার জন্য খলীফা হুযূরের দোয়ার কার্যকারীতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি দেরি না করে চোখে 'রে' দিয়ে দেন। তখন আমি 'রে' দেওয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেন যে, প্রথমেই আপনার চোখে 'রে' দিব না আগে লেজার দিব কারণ এই লেজার 'রে'-এর পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে আপনার চোখ কে বাঁচাবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, চোখে লেজার দেওয়ার পরে আমি সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তার ভীষণ অবাক হয়ে যান। কারণে লেজারে তো আমার চোখ পরিষ্কার হওয়ার কথা না। পরবর্তীতে আমাকে আর 'রে' নিতে হয় না-ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহর সাহায্য ও খলীফা হুযূরের এর দোয়ার বরকতে আমি চোখের 'রে' দেওয়ার মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাই। এখন পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছাই সম্পূর্ণভাবে নিজের চলাফেরা, রান্না-বান্না সহ ঘরের যাবতীয় সকল কাজ সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দিতে পারছি।

পরিশেষে আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবারও শুকরিয়া জানাচ্ছি এই বলে যে, ডাক্তারের ঘোষণা মতে আজ থেকে ১২/১৩ বছর আগে ডাক্তারের ভাষায় আমি সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলব এই ঘোষণা সত্বেও এখনো চোখে ভালো দেখে বেড়াচ্ছি এবং নিজের সবকিছু দেখাশোনার আঞ্জাম দিচ্ছি।

আমি আমার এই লেখার ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সুচীর কাছে এবং আমার নাতী মোহাম্মদ হাসান এর কাছে।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য।

যুগ খলীফা (আই.)-এর একটি নির্দেশনা

"একথা প্রত্যেক আহমদী দম্পতির মনে রাখা উচিত, নিজেদের জীবনের জন্য যদি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারিত থাকে সেক্ষেত্রে নবদম্পতি নিজেদের জীবনে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক তারা সব সময় এই চিন্তা মাথায় রেখেই অগ্রসর হবে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার একটি আদেশ পালনকল্পে এ কাজটি করছি। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে তখন তার চিন্তাধারার প্রতিটি আঙ্গিক সেই অভিমুখী হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুন ২০১২)

আমার অনুভূতি ও একটি সত্য স্বপ্ন

রোকসানা বেগম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম রোকসানা বেগম। আমি চট্টগ্রাম জামা'তের একজন সদস্য। চট্টগ্রাম জামা'তে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সেক্রেটারী ইশায়াত ও সেক্রেটারী খেদমত এ খালক হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় যখন জামা'তে কাজ করছিলাম বা সেক্রেটারী ছিলাম মনে হত যে আমি একটা নেয়ামত পেয়েছি। কাজ করে যে কত আনন্দ পেতাম তা বলে শেষ করা যাবে না এবং আমার অসুখ বিসুখ কম হত। সব সময় জামা'তের সব অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করতাম অত্যন্ত আনন্দের সাথে।

২০২০ সাল থেকে আমি আমেলার সদস্য নই। সাধারণ সদস্য হিসাবে এখনো যখনই সুযোগ হয় কাজ করে যাচ্ছি। আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ হচ্ছে তবলীগ করা। এই তবলীগের নেশাটা আমরা পেয়েছি আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বা মরহুম সাইদুল হক সাহেবের কাছ থেকে। আমি বর্তমানে একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। আগে এন.জি.ও- এর স্কুলে শিক্ষক ছিলাম। আমার কর্মক্ষেত্র ও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে আমি 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিত। আমার এই পরিচিত মহলে আমি তবলীগ করি। ইমাম মাহদী (আ.)-এর বই, লিফলেট সব সময়ই দিয়ে থাকি। বিভিন্ন সময়ে আমার কলিগরা মসজিদে এসেছেন। চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক। প্রত্যেক সদস্যকেই মনে হয় পরিবারের কেউ। মহান আল্লাহ যেনো আমাদের এই বন্ধনকে অটুট রাখেন।

এখন আমার জীবনের একটি সত্য স্বপ্ন বর্ণনা করছি। রাজশাহীর দুইজন ছেলে চট্টগ্রামের বায়তুল বাসেতে আশ্রয় নেয় এবং বয়আত গ্রহণ করে। ঐ দুই ছেলের মধ্যে একজন যার নাম নূরুল ইসলাম তার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর বাবা ও মায়ের আশ্রয়ে বসবাস করতে লাগলাম। কিন্তু স্বামীর কোন উপার্জন ছিল না। এভাবে চার বছর কেটে গেল। এর মধ্যে আমি এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পাশ করি। আল্লাহর ফজলে আমি শ্বশুর বাড়ীতে অর্থাৎ রাজশাহীতে চলে গেলাম। সেখানে অভাব অনটনে দিন কাটতে লাগল। বাবা মাঝে মাঝে ঈদ উপলক্ষ্যে কিছু টাকা পাঠাতেন। এভাবে কোন রকমে দিন কাটতো। বাচ্চা না হওয়াতে গ্রামের লোকেরা আর ননদরা আমাকে নিয়ে সমালোচনা করত, যে আমার কোন ছেলেমেয়ে নাই, এভাবে দিন কাটতে লাগলো। আমি নিয়মিত তাহাজ্জুদ এর নামায পড়তাম।

একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম– "এক বুযুর্গ লোক বোতল ভরে লাল ঔষধ নিয়ে এল এর সাথে আমার মাও ছিল। মা বললো এই ঔষধ খাও। আমি বললাম আমাকে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।" আমি ঔষুধ খেয়েছি কিনা আমার মনে নাই। তখন থেকে আমার গর্ভে সন্তান আসলো। ৯ বছর পর আমার মেয়ে হয়েছিল। মেয়ে হওয়ার ২ বছর পর আমি চট্টগ্রামে চলে এলাম। সেখানে স্থানীয় স্কুলে আমি চাকুরী করতে লাগলাম। মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আমার স্বামীও আবুল খায়ের কোম্পানিতে চাকরী করতে লাগলো। আমার স্বামী স্ট্রোক করে ২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্কুলের চাকুরী আমার একমাত্র ভরসা ছিল। অপরদিকে আমার মেয়ে ডিগ্রি ২য় বর্ষের ছাত্রী ছিল। ২০১৯ সালে স্কুল কমিটির প্রধান আমাকে স্কুল থেকে অব্যাহতি দেয়। পরে মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমি আমার স্বামীর রেফারেন্সে আবুল খায়ের কোম্পানিতে যোগদান করি। কিন্তু করোনা ভাইরাস শুরু হল এবং আমি যে স্কুলে চাকুরী করতাম ঐ স্কুলের শিক্ষকদের বেতনও কমে গেল। ঐ স্কুলের করুণ অবস্থা। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এখন আমি ভালো আছি। আমি ও আমার মেয়ে ওসীয়্যতকারী, আলহামদুলিল্লাহ।

স্মৃতির স্মরণে

তানভিয়া আক্তার জেমি

আমাদের সবচেয়ে বড় আদর্শ হযরত মোহাম্মদ (সা.)। শ্রেষ্ঠ নবী ও আত্মত্যাগী সাহাবীদের জীবনাচরণ অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আত্মাকে সৎকর্মে ধাবিত করতে পারি। তাই ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবনে পরলোকগত সৎকর্মশীল নারী ও পুরুষের ভাল গুণাবলী চর্চা ও তাদের স্মরণের মাধ্যমেও আমরা সৎকর্ম অনুশীলন জারী রাখতে পারি। এই উদ্দেশ্য থেকেই আমরা মৃত ব্যক্তির সৎ গুণাবলী আলোচনা করি।

আজকের এই ছোট প্রবন্ধে আমি আমার শাশুড়ি মরহুমা আজিজা আক্তারের স্মৃতিচারণ করবো। আমার অল্প সময়ে দেখা একজন আদর্শ নিষ্ঠাবান, সহনশীল ও দানশীলা মহিলা। বগুড়া জেলার সান্তাহার থানার দমদমা গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আমার শ্বাশুরীর জন্ম। পিতা: মৃত মেজর আব্দুর রহিম, মাতা: মৃত ময়মনা খাতুন। মেজর আব্দুর রহিম ছিলেন একজন মোখলেস আহমদী। জামা'তের বুযুর্গ ও আহমদী মানুষের আনাগোনায় পরিপূর্ণ ছিল মেজর আব্দুর রহিমের বাড়ী। ছোটকাল থেকেই এ মেহমানদারীর আয়োজন দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার শাশুড়ির এবং সেই অভিজ্ঞতাই তিনি তার পরবর্তী জীবনে কাজে লাগিয়েছেন। আমার শাশুড়ির বিবাহ হয় আখাউড়া জেলার খরমপুর গ্রামের প্রখ্যাত বুযুর্গ গোলাম মওলা খাদেমের বড় পুত্র মরহুম প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেবের সাথে। মরহুম প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেবের কথা না বললে লিখাটা অনেকটা অসম্পূর্ণ হবে। তিনি জামা'তের একজন আন্তরিক সেবক ছিলেন। নুসরাত জাহান স্কীমের অধীনে ওয়াকফ জিন্দেগী করেন। মরহুমা আজিজা আক্তার এই মুখলেস আহমদীর সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মরহুম প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব ঘানা ও সিয়েরা লিওনে জামা'তের কাজে অবস্থানকালে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে সাত সন্তানদের আগলে রেখেছেন ও আল্লাহ তা'লার উপর ভরসা রেখে অত্যন্ত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে সকল বিপদ আপদ মোকাবিলা করেছেন কখনও বিচলিত হননি বরং স্বামীর উৎসর্গীকৃত জীবনের সাথে একজন যোগ্য সহচরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আহমদীদের মেহমাননেওয়াজী ও জামা'তী কাজে উনার স্বামীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে কখনও কার্পণ্য করেননি।

আল্লাহ তা'লার উপর বিশ্বাস ও তার একত্ববাদের নজির তার মধ্যে প্রগাঢ় ছিল। সন্তানদের নিয়মিত নামায পড়ার তাগিদ দিতেন। সাদকা ও পবিত্র রমযানে ইফতার সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে উনার তাকওয়াশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার দেখা ৭ বছরের স্বল্প সময়ে আমি উনাকে পেয়েছি অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতার মাঝে। এত অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত নামায পড়তেন এবং রমযান মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবগুলো রোযা রাখতেন ও কোরআন খতম দিতেন।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার এই নিদর্শন আমাদের মতো বর্তমান প্রজন্মের জন্য অবশ্যই অনুসরণ করার যোগ্য। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আল্লাহ তা'লা উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন।

চট্টগ্রামের দিনগুলো

ডা. তাহেরা হালিম

২০০৬ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তি হওয়ার সুবাদে নিজের বাবা-মা, বাসা আদ্যোপান্ত পরিচিত ঢাকা শহর ছেড়ে আমার চট্টগ্রামে যাওয়া। যেহেতু মেডিকেলে পড়তে যাচ্ছি দীর্ঘ একটা সময় বাড়ী থেকে দূরে থাকতে হবে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি স্বাভাবিকভাবেই ছিল আমার কিছুটা হলেও। তবে রক্ষণশীল এবং আহমদী পরিবার হিসেবে অবিবাহিত একা মেয়েকে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ী ছেড়ে বহুদূরে হোস্টেলে পড়তে পাঠানোর ব্যাপারটা আমার বাবা-মায়ের জন্য কতটা দুশ্চিন্তা-উদ্রেককারী; সেটা ঐ সময়ে আমার ধারণারও বাইরে ছিলো। যাইহোক, আব্বুর সাথে মেডিকেলে ভর্তির সব দৌড়ঝাঁপ শেষ করে একটু অবসর পাওয়ার পরেই আব্বু চট্টগ্রাম জামা'তের তৎকালীন আমীর মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেবের সাথে দেখা করে সম্ভবত আমার খোঁজখবর রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম জামা'তে আব্বুর পরিচিত আরো যারাই ছিলেন সবাইকে আমার কথা জানিয়ে রাখেন।

চট্টগ্রামে গিয়েই আমরা প্রথমত পা রাখি যেখানে সেটা হল জামা'তের সাবেক ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ছোট ভাই, সোহেল ভাইয়ের বাসায়। পরিচয়পর্বে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পাই ঢাকার মিরপুর জামা'তের পরিচিত মুখ, প্রিয় সুমি আপুর; যিনি সোহেল ভাইয়ের স্ত্রী হয়ে এসেছেন চট্টগ্রামে। নেহায়াত মুখ চেনা পরিচিতির মানুষটা এবং তার পুরো পরিবার আমাকে গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতার সাথে এমনভাবে আপন করে নেন যে, বাড়িছাড়া আমি এক মুহূর্তেই আরেকটা নতুন ঠিকানা খুঁজে পেলাম নিজের। পরবর্তী প্রায় সাড়ে সাত বছরের সুদীর্ঘ সময়ে যেকোন প্রয়োজনে, বিপদ-আপদে সবসময় সুমি আপু আর সোহেল ভাই দম্পত্তির বাড়ির দরজা আমার জন্য অবারিতভাবে খোলা থেকেছে, সবসময়।

হোস্টেল জীবনের শুরুতে একটা বিষয়ে আমি দারুণভাবে চমৎকৃত হয়েছিলাম। আমার মেডিকেল কলেজ এবং হোস্টেল, চকবাজারের মোড়ে অবস্থিত মসজিদ 'বায়তুল বাসেত' থেকে ভীষণ কাছে- হেঁটে গেলেও বড়জোর পাঁচ মিনিটের দূরত্ব। এটা আমার কাছে খুবই দারুণ একটা ব্যাপার বলে মনে হতো, যেহেতু ঢাকায় আমরা মসজিদ থেকে বেশ দূরে থাকতাম। আমাকে চট্টগ্রামে রেখে চলে যাবার আগে আব্বু বলে যায়, যত যাই হোক, পড়াশোনা বা অন্যকিছুর দোহাই দিয়ে যেন কখনো মসজিদ না ছেড়ে দেই। পরবর্তী বছরগুলোতেও আম্মু সবসময় এই কথাটাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিতো। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পর্বে আমার জীবনে অনেকগুলো গুরুতর উত্থান পতন ঘটে; কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও আমি আমার বাবা-মায়ের এই একটা উপদেশ খুব জোর দিয়ে মেনেছি। আর এটার ফলও আমি লাভ করেছি– প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি সবার। বাবা-মা নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে হোস্টেলে থেকেছি; কিন্তু কখনো মনে হয়নি আমি একা।

আমি হোস্টেলে ওঠার একদিন পরই সেখানে এসে হাজির হন জামা'তের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম মাহমুদ আহমদ সিরাজী সাহেব এবং আমাকে গেস্ট রুমে ডাকিয়ে নিয়ে কথা বলেন। আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম রাশভারি এই মানুষটিকে দেখে। এখন বুঝি, কতটা গুরুত্বের সাথে আমার অভিভাবকের দায়িত্বটা গ্রহণ করেছিলেন এই মানুষগুলি। ২০১০ সালের মাঝামাঝি আমি একটা বিশ্রী একসিডেন্ট করে পা ভেঙে ফেলি। মরহুম আমীর সাহেবের বিবি আমার সাথে দেখা করার জন্যে নিজে আমার হোস্টেলে চলে আসেন। আমীর সাহেবও তাঁর সাথে এসেছিলেন, কিন্তু ছাত্রী হোস্টেল হওয়ায় তাকে গেস্টরুমেই অপেক্ষা করতে হয়।

মসজিদে আসা যাওয়া করতাম জুম্মার দিনগুলোতে, প্রথমে সুমি আপু ছাড়া কাউকেই চিনতাম না। নামাযের পর অন্যরা নিজে থেকেই এসে আমার সাথে পরিচিত হতেন। ধীরে ধীরে মুখগুলো পরিচিত হয়ে স্নেহপরায়ন হিসেবে লাভ করলাম। তিনি আমাদের লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয়া রওশন আরা আহমদ সূচী আন্টি। মসজিদে আমি খুব যে বেশী সামাজিক ছিলাম, তা না। অন্যরাই নিজে থেকে আমার খোঁজ-খবর করতেন, সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে চাইতেন। সূচী আন্টি অনেকটা জোর করেই আমাকে সামাজিক বানালেন। হঠাৎ একদিন অফিসিয়াল লেটার দিয়ে বললেন যে আমাকে সেক্রেটারী সেহতে জিসমানী করা হয়েছে। আমি তো হতভম্ব, কারণ এটার কাজ কী, কীভাবে করবো, কিছু জানিনা। কিন্তু আন্টি সাহস

দিলেন, "চেষ্টা করো। শুরুটা তো করো, পারবে। খুবই সহজ দায়িত্ব এটা, তাছাড়া আমরা তো আছিই তোমার সাথে!"

যত যাই ঘটুক, হাতে গোনা কিছু মানুষ কখনই আমার উপর থেকে বিশ্বাস হারায়নি। সূচী আন্টি তাদের একজন। আমি ভীষণ ফাকিবাজ ছিলাম। মাসিক সাধারণ সভাগুলোতে সেহতে জিসমানীর কোন বক্তব্য রাখা হলেই যেকোন অযুহাতে পালাতে চেষ্টা করতাম। মসজিদ ভর্তি মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে মাইক্রোফোনে কথা বলার সময়- এটা ভাবলেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হত। আন্টি একদিন জোর করে আমাকে মাইক ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও কথা বলো! ডাক্তার হয়ে যাচ্ছো আর মানুষের সামনে কথা বলতে লজ্জা পাও, কী বলো এইসব?!"জীবনে খুব কঠিন কিছু মুহূর্তে যখন অসম্ভব একাকীত্বে ভুগেছি চারপাশের মানুষগুলোর আচরণ অচেনা মনে হয়েছে তখনও এই সূচী আন্টি আমাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। আমার আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন- আমার দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন। আরও একটা বড় উপকার করেছেন উনি আমার- লাজনা আমেলায় কাজ করার সময় একটা ভুল করা থেকে আমাকে বার বার বিরত রেখে। আমি ছিলাম সেহেতে জিসমানীর সেক্রেটারী। কিন্তু মেডিকেলের পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপে আমি মসজিদে বা জামা'তের কর্মকান্ডে বেশি সময় দিতে পারতাম না এবং আমার দায়িত্বে থাকা কাজগুলো প্রায়ই করা হত না। এসব আমাকে মানসিকভাবে খুব চাপে ফেলতো, বিবেকে খোঁচা লাগতো। তাই আমি দুএকবার আন্টিকে বলেছি যে যেহেতু আমি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না, সেহেতু একটা দরখাস্ত করে আমেলার কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেই বরং। শুধু শুধু একটা পদ দখল করে রাখার তো কোন মানে হয় না। কিন্তু আন্টি বাধা দিয়ে বলেছেন, 'তুমি নিজে থেকে এমন করো না। জামা'তের দায়িত্ব কখনো ফিরিয়ে দিতে হয় না। আমরা যদি মনে করি তোমাকে দিয়ে চলবে না; জামা'ত নিজেই তোমাকে বাদ দিয়ে নতুন সেক্রেটারী নিয়োগ করবে। তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও।' পরবর্তীতে আমাকে একজন সহকারী দেন আন্টি- স্নেহের ফারহানাকে। এখন বয়স অনেকটা বাড়ার পর বুঝতে পারি জামা'তী কাজের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেয়াটা কত বড় অদূরদর্শী কাজ। আমেলার অন্যান্য সদস্য সবার নাম এখন আর মনে নেই। তবে শ্রদ্ধেয়া তাহেরা মির্যা আন্টি সম্ভবত জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, আর উনার পরে তাহেরা মজিদ বিথী। সেক্রেটারী মাল মুক্তা, নাইমা বুশরা আন্টি, রত্না ভাবী এদের কথা এখনো মনে পড়ে। প্রত্যেকেই আমার প্রতি ভীষণ সহনশীল ছিলেন এবং যেসব ব্যাপার বুঝতাম ন সবাই খুব ধৈর্য্যের সাথে বুঝিয়ে দিতেন। শুক্রবারে আরেকজন চাঁদা নিতে বসতেন, পাকিস্তানী। খুবই মিষ্টভাষী। উনার নামটা এখন আর মনে নেই। যদিও উনার ভাঙা ভাঙা বাংলা-ইংরেজী আর উর্দু মেশানো কথা এখনো আমার কানে বাজে। শেষের দিকে কিছুদিনের জন্য জেনারেল সেক্রেটারীর সহকারী হিসেবে কাজ করারও অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। তাহেরা মজিদ বিথী আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে ঐ সময়টাতে।

আমেলার বাইরেও কতশত পরিচিত মুখ মসজিদের ভিতরে খুশী আপা আর তার ছোট মেয়ে সারাহ, মুক্তির আম্মু (আন্টির আসল নামটা জানা হয়নি কোনদিন), রেহানা আর রোখসানা আপা, চৈতী, প্রিমা, মরহুমা জাহানারা রাজা আন্টি, বুশরা, মুন্নি আন্টি, জুয়েল আন্টি, মিসেস তবশির আন্টি আর হৃদিতা, শ্রদ্ধেয় ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকি সাহেবের পরিবার (যদিও উনারা কিছুদিন পরই চট্টগ্রাম থেকে চলে যান ঢাকায়) এবং আরো আরো অনেকেই যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এছাড়া মসজিদের আব্দুল মজিদ আঙ্কেল, সদা হাস্যমুখী আবুল খায়ের আঙ্কেল, মুরুব্বী আব্দুল মতিন সাহেব- বিভিন্ন সময়ে বিপদাপদে এদের পাশে পেয়েছি।

২০১৩ সালে চট্টগ্রাম ছেড়ে আসার আগে আগে দারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব বাংলাদেশে আসেন এবং প্রথমেই সম্ভবত তিনি চট্টগ্রামের জলসা সালানায় অতিথি হয়ে আসেন। আমি এবং আরো কয়েকজন লাজনা জলসার এক ফাঁকে তার সাক্ষাত লাভের সুযোগ পাই। এটা ছিল আমার জন্য অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা! হুযূর (আই.)-এর খুব কাছের কোন মানুষের সাথে এটাই আমার প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা।

লিখতে বসেছিলাম লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামে আমেলা সদস্য হিসেবে কাটানো দিনগুলির স্মৃতিচারণমূলক একটা লেখা। কিন্তু লেখা শুরু করার পর হাজারো স্মৃতির ঠেলাঠেলিতে চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে বারবার। পরিচিত প্রিয় মুখগুলোতে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতির ভীড়ে আমি বারবার লেখার খেই হারিয়ে ফেলছি। এই মানুষগুলোর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ঋণ আমার এই ক্ষুদ্র এক জীবনে কখনো শোধ করতে পারবো না। লিখতে বসে চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মসজিদ বায়তুল বাসেত! গ্রীষ্মের সময় মসজিদে যাওয়ার পথটুকুর এক রূপ, বর্ষার সময় অন্যরকম; আবার শীতের আগে, হেমন্তের আগে অন্যরকম। এই সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে আমার চট্টগ্রামের স্মৃতির সাথে। ছেড়ে এসেছি বেশ অনেকগুলো বছর হয়ে গেল তবুও কেন যেন এখনো চট্টগ্রামের কথা উঠলেই মনে হয় "আমার জামা'ত"। যদিও এখন আর এটা আমার জামা'ত নেই। চট্টগ্রাম জামা'তের স্মৃতি আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সময়টার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে থেকেই আজকের 'আমি' হয়ে উঠি। ভাল থাকুক প্রিয় চট্টগ্রাম, ভাল থাকুক চট্টগ্রাম জামা'তের প্রতিটি আহমদী সদস্য। মহান আল্লাহ তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষকে নিরাপদে উজ্জ্বল রাখুন এবং এই জামা'তকে উত্তোরত্তর উন্নতি ও বরকত দান করুন। আমীন।

স্মরণে ও বরণে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম

আমাতুস সালাম তামান্না

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম-এর বার্ষিক ইজতেমার সুবর্ণ জয়ন্তীতে শামিল হতে পেরে খাকসার নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার ছোটবেলা, বেড়ে ওঠা এবং জামা'তের কাজে সম্পৃক্ততা সবকিছুর হাতে খড়ি এই চট্টগ্রামের 'বায়তুল বাসেত'-এ।

জামা'তের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকায় অনেক স্মৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি অনেক দায়িত্বের মাঝে মানুষের ভালোবাসা ও আন্তরিকতাও পেয়েছি। স্মৃতির কথা যদি বলতে হয় তবে চট্টগ্রামের বার্ষিক ইজতেমার কথাটাই বেশি মনে পড়ে। সারাদিন ব্যাপি আমরা ইজতেমার জন্য প্রস্তুতি নিতাম। আনন্দঘন পরিবেশে সবার সাথে দিন অতিবাহিত হত। সে এক অন্যরকম অনুভূতি। সবাই খুব আন্তরিক ছিলেন বরং এখনও আছেন। তাই তো এতটা সময় পরেও আমাকে তাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে স্মরণ করেছেন (জাযাকাল্লাহ)।

ইজতেমায় আমাদের মূল আকর্ষণ ছিল প্রতিযোগিতা এবং পুরষ্কার। খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় পুরষ্কার প্রদান করা হতো। আমার মনে আছে একদিন ইজতেমার আগের সন্ধ্যায় পুরষ্কার কিনে আনা হলো। সেবার আমার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। কিন্তু পুরষ্কারগুলো দেখার পর এত ভালো লাগল যে এক রাতের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিই আর আল্লাহ তা'লা আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করে সেই পছন্দের পুরষ্কারের অংশীদার করে দিলেন। তাই আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়, নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা উচিত। বেশ কিছু পুরষ্কার পেয়েছি আর এখনও কিছু পুরষ্কার ও সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করে রেখেছি। সেই সার্টিফিকেটগুলোতে প্রেসিডেন্ট মুখতার বানু খালাম্মা, প্রেসিডেন্ট ইসরাত জাহান মঞ্জুর আপা, প্রেসিডেন্ট নাসিরা আখতার খালাম্মার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। "বায়তুল বাসেত" এর পুরানো মসজিদে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই বরেণ্য ব্যক্তিদের এমন সান্নিধ্য, আদর, ভালোবাসা পেয়েছি যা এখনও দোয়া ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

১৯৯৬-৯৭ সালের কথা। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে পড়ি। তখন আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক ডঃ ইমাম আলি ধর্ম বিষয়ে একটি গবেষণা করছিলেন এবং তিনি জানতে পারেন যে আমি আহমদী সম্প্রদায়ের সদস্যা। তাই তিনি এ বিষয়ে পূর্ণ গবেষণার জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে আমাদের মসজিদে আসেন, সেখানে জুম্মার নামায আদায় করেন এবং আমাদের সম্পর্কে জেনে খুব আনন্দিত হয়ে ফিরে যান। ২০২০ সালে চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে যখন স্যারকে আবার দেখলাম তখন ঢাকায় থেকে মনে হচ্ছিলো চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্যদের আন্তরিকতার কারণেই তিনি আমাদের মসজিদে পুনরায় এসেছেন। এ ঘটনাটি আমার কাছে অত্যন্ত স্মৃতিবহুল।

১৯৯৮-৯৯ সালের কথা। তখন আমি সেক্রেটারী মালের সহকারী হিসেবে চট্টগ্রাম জামা'তের সেবা করার সুযোগ পাই এবং ২০০০ সালে সেক্রেটারী মাল হিসাবে দায়িত্ব পাই। (আলহামদুলিল্লাহ)। আমার কাজের সূচনা বলতে গেলে চট্টগ্রাম জামা'তের ছোট ছোট দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে। সেখানে সাধারণ সদস্য, আমেলার সদস্য এবং সকলের মাঝে এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাযের পর চাঁদা সংগ্রহ করে ও হিসাব করে আব্দুল্লাহ চাচাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতাম। এ কাজে ছিল অন্যরকম আনন্দ। তখন আব্দুল্লাহ চাচা ছিলেন জামা'তের সেক্রেটারী মাল, অত্যন্ত ভালো মানুষ। এভাবে নাসেরাত থেকে লাজনা হওয়ার সোনালী দিনগুলো চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে কেটেছে।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবা, সকল আমেলা ও সাধারণ সদস্যদের অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই এবং এই দোয়াই কামনা করছি যে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম এমন সফলতার সাথে সুবর্ণজয়ন্তী থেকে শতবর্ষ পালনের দিকে এগিয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ।

পুরানো সেই দিনের কথা

আমাতুল কাইয়ুম

চট্টগ্রাম। আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটি নাম। আমার জন্মভূমি, শৈশব, কৈশোরের খেলার মাঠ, প্রথম ধর্মীয় ও জাগতিক পাঠশালা, সংসার জীবনের শুরু, প্রথম সন্তানের মুখ দেখা এ সবকিছুই আমাকে দিয়েছে আমার প্রিয় চট্টগ্রাম শহর।

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম তাদের ৫০তম ইজতেমা উদযাপনকে সামনে রেখে একটি স্মরণিকা বের করবে। আমাকে বলা হলো আমি যেন এই স্মরণিকার জন্য একটি লেখা লিখি। শুনেই মনটা কেমন জানি আনন্দে ভরে উঠলো। ভাবলাম কত কথা লিখব, পুরনো স্মৃতি গুলো ভাগাভাগি করে নিব সকলের সাথে। কিন্তু লিখতে বসে মনে হচ্ছে কাগজ কলমের এই স্বল্প পরিসরে সব কথা হয়তো লেখা হয়ে উঠবে না। তবুও চেষ্টা করেছি কিছুটা স্মৃতিচারণের।

চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে আমার সম্পৃক্ততা জন্মসূত্রে। কলকাতায় বয়আত গ্রহণের পর আব্বা মোহাম্মদ লিয়াকত উল্লাহ সাহেব চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং চাকুরী শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বিয়ে করেন সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে সৈয়দা আমাতুল মজিদকে। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আমার নানা সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের বাড়িতেই। আমি ছিলাম আমার নানা নানুর সবচেয়ে আদরের নাতনী। নানা দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট থাকার কারণে বিভিন্ন সময়ে অনেক আহমদী ব্যাক্তি আমার নানা বাড়িতে আসতেন এবং আমাদেরও সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের সান্নিধ্য লাভের। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাহেবজাদা মির্যা নাসের আহমদ এবং সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ যারা পরবর্তীতে জামা'তের যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন।

মহান সৃষ্টিকর্তার পরেই আমি কৃতজ্ঞ আমার আব্বার কাছে। কারণ জামা'তের সাথে আমার সম্পর্ক, ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের মাধ্যমেই। আমাদের বাসা থেকে চকবাজার আঞ্জুমানের আজান শোনা যেত। খুব ছোটবেলা থেকে আব্বার সাথে ফযরের নামায পড়তে আঞ্জুমানে যেতাম। আমার কায়দা পড়তে শেখাও তাঁদের কাছেই।

সুবর্ণ-স্মৃতি

ব্যবসায়িক কাজে মির্যা সিদ্দিক আহমদ নামে একজন আহমদী আমাদের বাসায় থাকতেন। আমরা তাঁকে সিদ্দিক চাচা ডাকতাম। তাঁর কাছে আমি কুরআন পড়া বিশেষ করে উর্দু শেখার চেষ্টা করতাম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমার উর্দু শেখার হাতেখড়ি হয়েছে রহিম সাহেবের বিবি রাবেয়া রহিম সাহেবার কাছে। আমি এবং উনার ছেলে সিদ্দিক রহিম সমবয়সী হওয়ার কারণে আমরা একসাথে উনার কাছে উর্দু পড়তাম।

সে সময়ের কথা লিখছি যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। আমরা ছিলাম পাকিস্তান অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। আর পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কারণে জামা'তের তৎকালীন কেন্দ্র রাবওয়া থেকেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। যেমন চাঁদা প্রদান, ইজতেমা এ সবকিছুতেই আমরা পাকিস্তানের একটি জামা'তের সদস্যা হিসেবেই অংশগ্রহণ করতাম। আর সবকিছুতেই চট্টগ্রাম জামা'ত অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, আতিথেয়তা এবং আন্তরিকতার জন্য চট্টগ্রাম জামা'ত বরাবরই সুপরিচিত। বন্দর নগরী হওয়ায় ব্যবসায়িক কারণে অথবা চাকরী সূত্রে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অন্য এলাকার তুলনায় পঞ্জাবী এবং উর্দু ভাষাভাষী আহমদী সংখ্যায় বেশি ছিল। রেলওয়ে সিএমও সাহেব, সাদি সাহেব, ইউসুফ সাহেব, বাজওয়া সাহেবের পরিবার ছাড়াও আরো অনেকেই চট্টগ্রামে থাকতেন। স্বাধীনতার পরে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যান, আবার অনেকেই রয়ে যান এদেশের হয়েই। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকল আহমদী ছিল এক আত্মার আত্মীয়। জামা'ত ও হালকা গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন আমি দেখেছি চট্টগ্রামে। সে সময়ে হালকা মিটিং গুলোতে কেবল ধর্মীয় আলোচনাই হতো না, বরং রান্না ও সেলাই ইত্যাদি শেখানো হতো। কেউ যদি জানতেন কারও আর্থিক অবস্থা ভাল না, অন্য কাউকে না বলে নিজেরাই যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করতেন।

চট্টগ্রাম জামা'তের কথা বলতে গেলে কয়েকজনের নাম না উল্লেখ করলেই নয়। তাদের মধ্যে দুইজন হলেন গোলাম আহমদ ফালু মিয়া সাহেব এবং তার স্ত্রী মুখতার বানু সাহেবা। আমরা উনাদেরকে মসজিদের নানু বলেই ডাকতাম। দুজনেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জামা'তী কাজকর্ম আমি উনাদের কাছ থেকেই শিখেছি। বিশেষ করে চাঁদা নেয়া সংক্রান্ত কাজ। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা করার চেষ্টা ছিল। ১৯৭০ সাল হতে সেক্রেটারী মাল হিসেবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম লাজনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে জোহরা খালাম্মা, নাসিরা খালাম্মা, মোহসেনা নানু, ইশরাত জাহান সাহেবা যাকে আমি ইশরাত বাজি বলেই ডাকতাম এমন আরো অনেকের সাথে কাজ করার এবং কাজ শেখার সুযোগ হয়েছে।

১৯৮১ সালে স্বামীর চাকরীর সুবাদে রাজধানীতে আগমন। কিন্তু ঢাকায় আসার পর চট্টগ্রাম জামা'তের জন্য সবসময়ই কেমন ব্যথা অনুভব করতাম। রাজধানীতে জামা'তের সেই আন্তরিকতাটা খুঁজে পাইনি। তবে সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে মন বসে গেল।

১৯৯৬ সাল। দীর্ঘ ১৫ বছর পর আবারো চট্টগ্রামে আগমন। মনে হলো যেন শান্তির জায়গায় এসেছি। সুযোগ পেলাম আরো একবার চট্টগ্রাম জামা'তের সেবা করার। ইশরাত জাহান সাহেবা তখন চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট। দায়িত্ব পেলাম উনার জেনারেল সেক্রেটারির। পরবর্তীতে কিছুদিনের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবেও জামা'তের সেবা করার সুযোগ হয়েছিল। এরপর স্বামীর সাথে তুরস্ক যাত্রা এবং ফিরে এসে আবার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।

দূরে থেকেছি কিন্তু চট্টগ্রাম এবং এর মানুষগুলোর প্রতি ভালোবাসা কখনোই কমেনি। বরং যখনই চট্টগ্রামের কারো সাথে দেখা হতো মনে হতো যেন পরিবারেরই কারো সাথে দেখা হয়েছে, পুরনো কথা মনে করতাম ফিরে যেতাম সেই সোনালী অতীতে।

একটি ঘটনা দিয়ে লেখাটা শেষ করছি। আমার আম্মাকে চট্টগ্রামে সবাই ছুট্টি বলেই ডাকে। ছোটরা ছুট্টি আপা বা খালাম্মা আর উর্দু ভাষীরা ছোটি আপা ডাকতেন। ২০০৫ সালে কাদিয়ান জলসায় যোগদান ও হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে সপরিবারে কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই বছর হুযূর (আই.)-এর আগমন উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বের প্রায় ৭০ হাজার আহমদী কাদিয়ান জলসায় যোগদানের জন্য এসেছিল। লন্ডন থেকে এসেছিল সাদী সাহেবের ছেলেরা। জিল্লি ভাইয়ের সাথে মওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেবের দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন বাংলাদেশ থেকে কারা এসেছে, চট্টগ্রাম থেকে কেউ এসেছে কিনা। আমরা এসেছি শুনে জিজ্ঞেস করলেন ছোটি আপা এসেছেন কিনা, আম্মা কেমন আছেন। এমনই ছিল তখনকার আহমদীদের মাঝে আন্তরিকতা।

বেঁচে থাকুক চট্টগ্রাম জামা'ত, এগিয়ে যাক চট্টগ্রাম লাজনা। যাদের পরিশ্রম এবং ত্যাগের বিনিময়ে আজকের চট্টগ্রাম জামা'ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের উত্তম পুরস্কার দান করুন। বর্তমান প্রজন্ম যেন তাদের অগ্রজদের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে সৃষ্টিকর্তার কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমার দেখা আধ্যাত্মিক এক মিলনমেলা ও সম্প্রীতির স্রোতস্বিনী চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন

আমাতুল মুজিব খুশী

২০০৪ সালের প্রারম্ভে বৈবাহিক সূত্রে আমার চট্টগ্রামে আসা। জন্মের পর থেকেই আত্মার খোরাক মেটানো মানে মসজিদে যাওয়াকেই বুঝতাম। সেই প্রাণের টানেই চট্টগ্রাম আসার পর থেকেই মসজিদে যাওয়া ছিল নিজ চাহিদাগুলোর একটি। ২০০৯ সাল পর্যন্ত লেখাপড়ার জন্য বছরের বেশীরভাগ সময়ই ঢাকায় কাটাতে হতো আর মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে। তখন চট্টগ্রামের কয়েকজন লাজনা বোন যেমন আরজু খালা, নিলু আন্টি, তাহেরা মির্যা আন্টি, রেনু আন্টি, নাঈমা আপা, সূচী ভাবী যারা পারিবারিক অথবা জামা'তী সূত্রমতে আমার বাবাকে চিনতেন বা জানতেন তাদের হাত ধরেই আমার প্রাণের চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে ঘনিষ্ঠতার শুরু। মনে আছে নিলু আন্টি, তাহেরা মির্যা আন্টির সাথে পরিচয়ের প্রথমেই উনারা বলেছিলেন উনারা পাক্ষিকে আমার বাবার লেখা পড়েন। সেদিন আবেগ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম আমার বাবার সুখ্যাতি দেখে। আর তখন থেকেই যেন আন্টিরা আমার আপন কেউ হয়ে গেলেন।

এরপর ২০১০ সালের দিকে খাকসার নাসেরাতদের নিগরান হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাই। সেই সুবাদে সেই বছর ইজতেমার সময়ে নাসেরাতদের কোন এক গ্রুপের হাদীস পরীক্ষা নিতে গিয়ে একটা হাদীস আমার জীবন পাল্টে দেয়। হাদীসটি ছিল– খায়রুজ জাদেদ তাক্বওয়া। আসলে হাদীসটি আমার ছোটবেলা থেকেই মুখস্ত ছিল কিন্তু এর অর্থ জানতাম না। ঐদিন নাসেরাতদের হাদীস পরীক্ষা নিতে গিয়ে হাদীসের অর্থটা আমার মনে দাগ কাটলো। আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম আর সেদিন থেকে অনুভব করলাম, তাইতো! তাক্বওয়াই উত্তম পাথেয়। সেদিন থেকেই যেন হৃদয়ে গেঁথে ফেললাম আমারও একমাত্র পাথেয় হবে তাক্বওয়া আর তখন থেকেই ইতিবাচক পরিবর্তনের হাওয়া যেন আমার জীবনকে সুশীতল করছে।

সেই বছর থেকেই এখনও পর্যন্ত প্রতিটা ইজতেমার আধ্যাত্মিক মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে পরবর্তী বছরের ইজতেমা আসা পর্যন্ত হৃদয় পবিত্র রাখার খোরাকটা জোগাড় করার চেষ্টা করি। ২০১০ সালের পর থেকে চেষ্টা করেছি আয়োজকদের দলে না থেকে প্রতিযোগি হিসেবে নিজে কিছু শিখতে। আর চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর প্রতিটি টি.টি. ক্লাস, পরীক্ষা ও ইজতেমার অনুষ্ঠানগুলো এতটাই প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী হয় যে, প্রতিটা অনুষ্ঠানের সমাপনী অধিবেশনে এক মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে যাই।

২০১৭ কি ২০১৮ সালের লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমার এক বক্তৃতার বিষয় ছিল বয়আত গ্রহণের ১০টি শর্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ। এই বক্তৃতায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ১০নং শর্তটা বার বার আমার হৃদয় নাড়িয়ে দিচ্ছিল। সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম আর চোখ ছল ছল করে উঠল। ভাবলাম, এই লাজনা সংগঠনের সবাই যে আমার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের চেয়ে বেশী কাছের হয়ে গেছে মাত্র এই কটা বছরেই। বয়আতের এই ১০নং শর্তের এই শিক্ষাটা পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে আত্মস্থ করলাম সেদিন থেকেই।

সেদিনের পর থেকেই যেখানেই ভ্রমণে যাই দেশ কিংবা বিদেশে, অথবা বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে বা কোন রেষ্টুরেন্টে যেন জামা'তের কোন বোন বা তার পরিবার সাথে থাকলে হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যায়। যেন তারা ছাড়া আমি বা আমার পরিবার একা। তাইতো কোন লাজনা বোনের ছেলেমেয়েদের ভালো রেজাল্টে আমিও পুলকিত হই আবার কোন লাজনা বোনের বিবাহযোগ্য মেয়েকে নিয়ে আমিও চিন্তিত হই। কোন লাজনা বোনের ছেলেমেয়েদের বিয়ের আয়োজনে শরীক হতে পেরে আনন্দিত হই আবার আমাদের ছোট্ট দানিয়াকে হারিয়ে মনে হয়েছে আমার পেটের

সন্তানকেই হারিয়েছি। আরজু খালাকে হারিয়ে নিজেকে অভিভাবকশূণ্য মনে হয়েছে।

এ যেন এক প্রাণের টান যা জগতের সকল আত্মীয়তার সম্পর্কের উর্ধ্বে।

২০১০ সালের মার্চ-এপ্রিল তখন রত্না ভাবী তৎকালীন মুরুব্বী সাহেবের মিসেস ছিলেন। সম্ভবত, মুরুব্বী সাহেব জামা'তী ট্যুরে বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। আর রত্না ভাবী সোজা বাচ্চাদের নিয়ে আমার বাসায় হাজির কয়েকদিন থাকবে বলে। যেন আমারই আপন বোন আমার বাসায় এসেছে ভরসার স্থল হিসেবে।

২০১১ সালের ঈদ-উল-ফিতর এর দিন। মসজিদে নামায পড়ে আমরা পুরো পরিবার গেলাম সূচী ভাবীর বাসায়। সেখানে তাৎক্ষনিক পরিকল্পনায় আমরা দুই পরিবার গেলাম কক্সবাজার ভ্রমণে। আমার ছোট্ট সারা আর সূচী ভাবীর ময়না পাখি দুইটা ফিজা আর তুবা। এদের তিনজনের ছুটাছুটিতে তখন মনে হচ্ছিল যেন তারা সহদরা।

২০১২ সালের মাঝামাঝি রত্না ভাবী আর আমরা দুই পরিবার মিলে গিয়েছিলাম মানিকছড়ির গহীন পাহাড়ী এলাকায় কিছু জেরে তবলীগ পরিবারের খোঁজে। আসার পথে ভাবী গাড়িতে বমি করে খুবই ক্লান্ত হয়ে গেল। আমার কাঁধে ও বুকে মাথা রেখে কি পরম শান্তির ঘুম দিলেন যেন আমরা সহদরা।

২০১১ কি ২০১২ সালে আমরা চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর পিকনিকে উদালিয়া চা বাগানে গিয়েছি। সেখানে কুকুরের ধাওয়া খেয়ে সূচী ভাবীর ছোট্ট মেয়ে পিচ্চি তুবার সে কি বেহাল দশাই না হলো। আমি দৌড়ে গিয়ে কুকুরের কামড় থেকে বাঁচাতে কোলে তুলে নিলাম টু অথবা থ্রিতে পড়া পিচ্চি তুবাকে। মেয়েটা যে কতক্ষণ ভয়ে আমার বুকে মাথা গুজে রেখেছিল যেন মায়ের কোলের প্রশান্তিটাই সে অনুভব করেছে।

২০১১ কি ২০১২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমরা কয়েকজন যুথী, আমি, দোলা, রিনা ভাবী, সাফিয়া নুসরাত আন্টি, আরও দুই একজন (সঠিক মনে নেই) শুরার প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম ঢাকার কেন্দ্রীয় ইজতেমায়। যাওয়ার পথে ট্রেনে ছাড়পোকার অত্যাচারে প্রথমে যুথী এরপর দোলা আমার সাথে আমার গাঁয়ের চাদরে এমনভাবে নিজেদেরকে মুড়িয়ে নিয়েছে যেন আমি ওদের কত আপন কেউ। সেদিন থেকে তাদের প্রতি আমার স্নেহের দৃষ্টিটা যেন কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ই আগস্ট আমার বড় ছেলে হাসির জন্মগ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম সূচী ভাবীই তাকে কোলে নিয়ে উষ্ণ আদর দিয়েছেন। হাসপাতালের দিনগুলোতে ভাবীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় এতটা সিক্ত হয়েছিলাম যে হাসপাতালের বেডে শুয়েই ভাবছিলাম শুধুমাত্র আহমদীয়াতই আমাকে এত কিছু দিয়েছে।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমার মা তখন আমার কাছে ছিলেন। তৎকালীন মুরুব্বী সাহেব ছিলেন আমাদের ছোটবেলার পরিচিত জাফর ভাই। আমরা মুসলেহা ভাবীর (মুরুব্বী সাহেবের স্ত্রী) পরিবারসহ গিয়েছিলাম কক্সবাজার। তাতে আমাদের মধ্যে আন্তরিকতা বেড়ে গেল। মুসলেহা ভাবীও কোন রকম জড়তা ছাড়াই চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন। উনার মেয়ে সাবু আর ছেলে আনসার খুব আদর করতো আমার বড় ছেলে হাসিরকে। উনারা এখান থেকে চলে যাওয়ার দিন শুক্রবার ছিল। আমরা লাজনা বোনেরা উনার বাসায় উনাদেরকে বিদায় জানাতে গেলে দোয়া করার সময় মুরুব্বী সাহেব ও মুসলেহা ভাবী হু হু করে কেঁদেছিলেন। আমাদের চোখও ছল ছল করে উঠলো। মায়ায় জড়ানো ছিল উনাদের বিদায় বেলাটা। আত্মার এক টান অনুভব করেছিলাম সেদিন।

২০১৭ সালের এপ্রিল-মে মাস। আমার বড় ছেলে হাসির তার বাবার সাথে কাদিয়ান গিয়েছিল। তখন সূচী ভাবীরাও পুরো পরিবারসহ কাদিয়ান গিয়েছিলেন। ভাবী মায়ের মত আমার ছোট হাসিরের খেয়াল রেখেছেন সে সময়। আমি তো ভাবী আছে বলে বাংলাদেশে তখন নিশ্চিন্তেই ছিলাম। ভাবা যায়, একজন আহমদী বোন কতটা ভরসার স্থল হতে পারে?

২০১৭ সালের ২৮ কি ২৯ ডিসেম্বর। আমার মেয়ে সারার পিএসসি পরীক্ষা শেষে আমরা বগুড়া হয়ে রাজশাহীর বাঘায় গিয়েছিলাম আমার মেজো বোনের বাসায়। বগুড়ায় যাওয়ার ঠিক আগের জুমাবার মসজিদে রোকসানা আপার সাথে দেখা হলে তিনি রাজশাহীতে তার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন বলে জানালেন। এরপর আমরা যেদিন আমার বাবার বাড়ী বগুড়া থেকে রাজশাহীর বাঘায় যাচ্ছিলাম তখন ফোনে জানতে পারি রোকসানা আপা রাজশাহী মেডিকেলে আছেন, উনার স্বামীর অবস্থা গুরুতর। আমরা বোনের বাসায় বিকালে পৌঁছাই। সেখানে আমার মেয়ে সারাকে রেখে আমার ছেলে দুইটাকে নিয়ে আমরা আমাদের গাড়ীতে করে বাঘা থেকে রাজশাহী শহরে যাই। উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটা সিল্ক শাড়ী কিনব আর আসার পথে মেডিকেলে রোকসানা আপার অসুস্থ স্বামীকে দেখে আসব সেখানে রোকসানা আপা ও উনার মেয়ে এপিও ছিল। আমরা সন্ধ্যার একটু পর রাজশাহী শহরে পৌছালাম। পথে কোন কুয়াশা ছিল না। প্রথমে কয়েকটা দোকানে গেলাম সিল্ক শাড়ী কিনবো বলে। কিন্তু কি যেন মন সায় দিচ্ছিলনা। আমার স্বামী শিহাব জিজ্ঞাসা করল আমি শাড়ী কিনছি না কেন? আমি জবাব দিলাম দেখো বেঁচে থাকলে অনেক শাড়ী কিনতে পারব তার চেয়ে এই টাকাটা রোকসানা আপার হাতে দিব। জানিনা বেচারা কোন হালে হঠাৎ করে অসুস্থ স্বামীর কাছে এসেছে, হাতে টাকা পয়সা আছে

কিনা। কথাটা আমার স্বামীর মনে ধরল। আমরা মেডিকেলে গেলাম, দেখলাম রোকসানা আপার স্বামী কোমায় আছেন। আমরা ওখানে সবাই মিলে হাত তুলে দোয়া করলাম। আসার সময় আমার শাড়ী কেনার টাকাটা রোকসানা আপার হাতে দিলাম। বেচারা বিপদের সময় আমাদের সামান্য সহযোগিতা পেয়ে কেঁদে দিলেন। আসার সময় ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা।

তখন রাত ৯.৩০-১০.০০টা। আমরা মেডেকেল থেকে রওনা হয়েছি বাঘায় যাব বলে। শহরের শেষ দিকে আমরা যখন রাজশাহী হাইওয়েতে উঠব ঠিক তখনই রাতের কুয়াশা আমাদের গাড়ীটাকে ঘিরে ফেলল। আমাদের ড্রাইভার তখন গাড়ী থামিয়ে দিল। ঠিক হাত সামনে-পিছনে বা ডানে-বামে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কোন গাড়ী সামনে থেকে আসছে কিনা, পেছন থেকে কোন গাড়ী ধাক্কা দিচ্ছে কিনা বা আমাদের গাড়ীটা রাস্তার বাইরে চলে যাচ্ছে কিনাকিছুই বোঝার উপায় নাই। আমার স্বামী বড় ছেলেকে বুকে নিয়ে আর আমি ছয় মাসের ছোট ছেলেকে বুকে জাপটে ধরে হাত তুলে তাৎক্ষণিক আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুরু করলাম। একি আল্লাহর কি মোযেজা, আমার দোয়া শেষে চোখ খুলেই দেখি রাজ্যের কুয়াশা কোথায় হারিয়ে গেল। বাঘায় বোনের বাসায় পৌঁছা পর্যন্ত আর এক মুহূর্তের জন্য কুয়াশার দেখা পেলাম না, আলহামদুলিল্লহ। যেন আল্লাহ তা'লা কিছুক্ষণ আগে আমাদের খোদাভীতিরই পুরস্কার দিচ্ছেন। আমরা দেড় ঘণ্টার পথ পৌনে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করলাম। সেদিন যেন আরেকবার হৃদয় থেকে অনুভব করলাম 'খায়রুখ যাদেদ তাক্বওয়া' আর 'আলায়সাল্লাহু বে কাফেন আবদাহু' এর সমার্থ।

২০২০ এর ফেব্রুয়ারি মাস। সানিয়া ভাবীর পরিবার দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চায়। তখন শিহাব তাদের কাদিয়ান যাওয়ার পরামর্শ দিল। শিহাব যখন সাইফুল ভাই (সানিয়া ভাবীর স্বামী) কে কাদিয়ানের কাদিয়ানের কথা বলছে আমার মনটাও কাদিয়ানের জন্য আনচান করল। কারণ কোন আহমদী পরিবারের সাথে ভ্রমণ করে যে প্রশান্তি আমি পাই তা লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু কাদিয়ান যাওয়া আসায় কয়েকদিন লাগবে। অফিস থেকে ছুটি পাবো কিনা, তাছাড়া অনেকগুলো টাকাও লাগবে। মনে মনে কাদিয়ানের ভাবনাটা আমাকে আনমনা করে ফেলল। দোয়া করতে থাকলাম আর আমার আকুতি আল্লহকে জানালাম। এর দুই তিন দিন পরে সানিয়া ভাবী আমাকে ফোনে বলল, উনাদের কাদিয়ানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কনফার্ম। আমার কষ্টটা আরও বেড়ে গেল। কোন রকম ভয় ছাড়া আমার ম্যানেজার কে ছুটির কথা বললাম। উনি ছুটি দিতে রাজি হলেন। আমি শিহাবকে ফোন করলাম ছুটির কথা জানাতে আর ওমনি শিহাব বলল যাবে নাকি ভাবীদের সাথে কাদিয়ান? হ্যা বলার সাথে সাথে ভিসা করতে দিল শিহাব। রওনা দেওয়ার দুদিন আগে ব্যাগে কাপড়চোপড় গোছানোর জন্য আলমারী খুলে আমার জামা বের করতেই দেখি টাকার মত কি যেন দেখা যায়, দেখলাম ৪০টা ৫০০ টাকার নোট। শিহাবকে জিজ্ঞাসা করলাম টাকার ব্যাপারে, না সেও রাখেনি, আমিও কোনদিন রেখেছি বলে তখন মনে পড়ছে না। এখনও মেলেনি সেই হিসাব কোথা থেকে এল আমার কাদিয়ান যাওয়ার টাকা। আবারও অনুভব করলাম খায়রুখ যাদেদ তাক্বওয়া। চোখ আল্লাহর শুকরিয়ায় ছল ছল করে উঠল। এযে আমার জীবন্ত খোদার জলনন্ত নিদর্শন তার পবিত্র ভূমিতে নিয়্যত করেছি তাই। আমরা দুই পরিবার যেন দুই সহোদর কিংবা দুই সহোদরার পরিবার। ভারতে আমরা যতদিন ছিলাম আমাদের তিন ছেলে মেয়ে আর সানিয়া ভাবীর তিন ছেলেমেয়ে যেন আমারই ছয় ছেলে-মেয়ে। যেখানেই বাচ্চারা ছুটাছুটি করেছে সেখানে, হোক না আমার বাচ্চা, ভাবী নিজের বাচ্চার মতোই আমার বাচ্চাদের দিকেও খেয়াল রেখেছে। আমাদের সার্বক্ষণিক মনে হয়েছে যেন আমরা দুই বোন। আহমদীয়াত ছাড়া এমন নজির আর কোথায় পাবো?

২০২০ সাল, করোনার কালো থাবায় যখন প্রায় স্থবির সারা বিশ্ব ঠিক তখনই মুন্নী আপার চমৎকার আইডিয়ায় গ্রুপভিত্তিক অনলাইনে কোরআন প্রশিক্ষণ চালু হলো। ঠিক তখনই আমাদের গ্রুপের টিচার ছিল আমাদের ময়না পাখি - ফিজা আর আমার বান্ধবী সেক্রেটারী অডিট, উর্মি। আর আমরা গ্রুপ সদস্য ছিলাম আমি, নাজনীন আন্টি, দিবা ভাবী, আমার পরম স্নেহতুল্য তৃষা। আমাদের নির্বাচিত সূরা ছিল "সূরাতুল গাসিয়াহ"। আমাদের গ্রুপ পারফরমেন্সের শেষের দিন রাতে পর্যালোচনা মূলক অনলাইন মিটিং এ নাজনীন আন্টি যেভাবে কান্না করেছেন মনে হয়েছিল আমরা সবাই যেন কত দূরে দূরে চলে যাচ্ছি। ইশ কি মায়ামাখা ছিল সেই দিনগুলো।

২০২১ এর সেপ্টেম্বর মাস, ৪৯তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমার আগে আমাদের কত চিন্তা। কিভাবে মসজিদ সাজাবো, কোন গ্রুপের জন্য কোন খেলার আয়োজন করবো, পুরস্কারের জন্য কি কি কিনব, যেন আনন্দ আর চিন্তায় ঘুম হারাম। সেই আধ্যাত্মিক আনন্দের বর্ণচ্ছটা লেগে থাকুক না আমার আত্মায়, হৃদয়ে স্বপ্নে ৫০তম ইজতেমা আসা পর্যন্ত।

দোয়া করি আমরা যারা বর্তমানে আছি সবাই মিলে যেন অংশগ্রহণ করতে পারি আধ্যাত্মিক মিলনমেলা স্বপ্নের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমায়। সম্প্রীতির স্রোতস্বীনি বহমান থাকুক বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, সুবর্ণের পর শতবর্ষে, শত বর্ষের পর শত শত বছরব্যাপী দূর অনাগত প্রজন্মের জন্য শুধু আজ দোয়াই রেখে যাই "রাব্বিজ'আলনী মুক্বীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়াই, রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়ে ওয়ালিল মুমীনিনা ইয়াওমাল ইয়াকুমুল হিসাব।"

দোয়া কবুলীয়তের ঈমানবর্ধক ঘটনা

জনিয়া আশা

আমার বাড়ী পঞ্চগড় জেলা আহমদনগর গ্রামে। বর্তমানে আমি আমার স্বামী মওলানা খোরশেদ আলম মুরুব্বী সিলসিলাহ এর কর্মস্থল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামে অবস্থান করছি। প্রায় তিন বছর যাবত আমি চট্টগ্রামে আছি। লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রামের ৫০তম ইজতেমায় আমরা সবাই আনন্দিত। আমাদের এই আনন্দ মহান আল্লাহ যেন দীর্ঘস্থায়ী করেন।

আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার জীবনের একটি দোয়া কবুলীয়তের ঘটনা বর্ণনা করতে চাই। যা অনেকের আল্লাহর উপর ভরসা ও ঈমান বর্ধনের কারণ হবে।

২০২১ সালে আমাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনায় বদলী হওয়ার সৌভাগ্য হয়, আলহামদুলিল্লাহ। আর খুলনা জামা'ত সাত শহীদের জামা'ত, তাই আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে খুলনা জামা'তে প্রায় সাত বছর থাকার তৌফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমার সাহেবের এবং আমার নিজের অনেক ইচ্ছা ছিল যে, আমাদের দ্বিতীয় সন্তান আমরা খুলনা সাত শহীদের জামা'ত থেকে নিয়ে যাব। আমার বড় একটি সন্তান আছে, তার স্কুলে যাওয়ার মতো বয়স হয়েছিল। কিন্তু আমার আর দ্বিতীয় বাচ্চা হচ্ছিলনা। আমি হুযূরের কাছে বারবার চিঠি লিখতাম। হুযূর আমার চিঠির উত্তরও দিতেন। এভাবে আমি যতদিন সন্তান সম্ভাবনা না হই হুযূরের কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করিনি। হঠাৎ আমি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং চেকআপ করি। কিন্তু আমার প্রেগনেন্সির কোন রিপোর্ট তখনও আসেনি। কিন্তু আমি দোয়া করছিলাম। একজন নারী যখন মা হতে যায় তার মধ্যে অনেক লক্ষণাবলী থাকে। আমার মধ্যেও তা ছিল। আমি আমার সমস্যার কথা একজন লাজনা বোনকে বলি। সে আমাকে পরামর্শ দেয় আপনি ভালো একজন গাইনি ডাক্তার দেখাতে পারেন। পরেরদিন আমি তাকে সাথে নিয়ে ভালো গাইনি দেখাই। ডাক্তার দেখানোর সাথে সাথে আমি জানতে পেরেছি, আমি মা হতে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। তখনই আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলাম। প্রেগনেন্ট অবস্থায় মেয়েদের যে স্বাভাবিক অসুস্থতা থাকে আমি ঠিক তেমনি অসুস্থ ছিলাম। যাই হোক আল্লাহ তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি সুন্দর-সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিব। এরপর থেকে আমি প্রতি মাসে ২-৩বার ডাক্তার এর চেকআপ করাতাম। ডাক্তার আমাকে পুরোপুরি বিশ্রাম দিয়েছে।

কিন্তু আমার তো আরো একটি সন্তান রয়েছে, তাকে স্কুলে আনা নেওয়া করা, সংসারের কাজকর্ম করা সব তো আমার একা হাতে করতে হতো। এছাড়া আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে সেভাবে কোন নিয়ম-কানুন না মেনে চলিনি। তাছাড়া খুলনায় কোয়ার্টার ছিল দুইতলা। আমার একদিন পেটে বাচ্চার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমি ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তার আমাকে বলে আপনি আজকে ভর্তি হয়ে যান। আপনার অপারেশন করাতে হবে। কিন্তু প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। পরের দিন ভর্তি হই। অপারেশনের আগ মুহূর্তে ডাক্তার আমার আল্ট্রা করে এবং বলে যে আমি কিছু জানি না কি হবে। ডাক্তার অনেক চিন্তিত ছিল, বলছে বাচ্চার এক পা খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক আল্লাহর অশেষ ফযলে আমার অপারেশন হয় এবং আমি সুন্দর-সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা জন্ম দিই। (আলহামদুলিল্লাহ)। আমি যে বাচ্চা জন্ম দিই সে ওয়াকফে নও বাচ্চা ছিল। আমার বাচ্চাকে যখন ডাক্তার বের করে তখন সে পেটে থেকে হাত দিয়ে ডাক্তারের কাঁচি ধরে নেয়। ডাক্তার তো ভয় পেয়ে যায় যদি না তার হাতের আঙ্গুল কেটে পড়ে। যাই হোক আল্লাহ তা'লা সর্বোত্তম রক্ষাকারী রক্ষা করেছেন। আমাকে যখন (OT) থেকে নামিয়ে বেডে নেয়া হয়, এক নার্স এসে আমার শরীরে ভুলক্রমে অন্য আরেকজন রোগীর রক্ত আমার শরীরে পুশ করে। আর যখনই রক্ত আমার শরীরে প্রবেশ করতে লাগলো আমার তখন খিচুনি শুরু হয়ে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসেরও কষ্ট হচ্ছিল। যাকে বলে উপরটান। এ থেকেও আমাকে আল্লাহ তা'লা অলৌকিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এজন্য আমি আল্লাহর নিকট আবারও বারবার শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তা'লা তার বান্দাকে দোয়ার মাধ্যমে কীভাবে রক্ষা করে আমি আমার বাস্তব জীবন থেকে উপলব্ধি করেছি।

স্মৃতিবিধুরতা

তাহেরা মাজেদ রাফা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইজতেমা!!! নামটাই যেন আনন্দের। সেই ইজতেমা যখন ৫০ এ পা দেয় সেটা যেন এক অন্যরকম অনুভূতি। আমি চট্টগ্রাম এর মেয়ে না। আমার বেড়ে ওঠাটাও চট্টগ্রামে না। মূলত: বিয়ের এক বছর পর আমি এখানে আসি। প্রথম দিকে মসজিদে আসতে আমার কেমন একটু লাগতো। এজন্য না যে আমি মসজিদে যেতে পছন্দ করি না। বরং এজন্য যে আমি তো কাউকেই চিনি না। যাইহোক। সবার প্রথমে আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবা যিনি ছিলেন তখন (নাঈমা বুশরা) আন্টি উনার সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম। উনি এতো আবেগ নিয়ে বলেছিলেন কথা যে কিছু জড়তা সেদিনই কেটে গেছিলো। প্রথম যেদিন মসজিদে গেলাম সুচি আন্টি (রওশন আরা আহমদ) আমাকে দেখে বলেছিলেন "যাক আমরা আরেকজন কর্মী পেলাম।" আমি বরাবরই জামা'তের কাজ করতে চাইতাম। সেই সুযোগটা আমি এসেই পেয়ে গিয়েছিলাম। শুরুতে কয়েকদিন নাসেরাত সেক্রেটারী এবং বর্তমানে ইশায়াত সেক্রেটারী হিসেবে আমি কর্মরত আছি। শুরুতে খুব ভয়ে ভয়ে থাকলেও মুক্তি, ফিজা, তুবা, প্রজ্ঞা এদের সাহায্য আমি বরাবরই পেয়েছি আমার সব কাজে। আমার মনে আছে মুক্তা আপুর কথা। প্রথম দিনই আমাকে জোর করে বসিয়ে দিয়েছিলেন চাঁদা কালেকশনে। আমি আপুকে আস্তে আস্তে বলেছিলাম "আপু আমার তো মালের সেক্টর সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই।" আপু শুধু বলেছিলেন "আমি বলে দিবো। সব পারবা তুমি।" এরপর মুক্তা আপু পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বলতেন অমুক চকবাজার হালকা, অমুক অক্সিজেন হালকা, অমুক বিশ্ববিদ্যালয় হালকা। আপুর কনফিডেন্স দেখে আমিও আস্তে আস্তে চাঁদা তুলতে একটু ভরসা পেলাম। কিছু ধারণাও হলো। প্রথম ইজতেমাটা আমি ভুলবো না। আমি একদম নতুন। আমার নযম তখনো চট্টগ্রামে কেউ শুনে নাই। ইজতেমার কয়েকদিন আগে আমি বাসায় ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম ফিজার কল। ভাবলাম ভুলে কল দিয়েছে হয়তো। ধরলাম ফোন। ওপাশ থেকে শুনলাম, "আপু মসজিদে আসতে পারবেন? আমরা নযম প্র্যাকটিস করছি। আপনি জয়েন করতে পারেন আমাদের সাথে।" আমি জয়েন করেছিলাম। প্র্যাকটিস করেছিলাম। প্রতিযোগীতা আগে হয়ে যাওয়ায় সেবার আমার অংশগ্রহণ করা হয়নি। ইজতেমার দিন দলীয় নযমের সেশন এর জন্য আমাদের সবার প্রস্তুতির যেন কোনো শেষ ছিল না। চট্টগ্রাম এর ইজতেমার সমাপনীর দিন আমি সবার সাথে দলীয়ভাবে নযম গেয়েছিলাম। নতুন কাউকে এভাবে হয়তো আহমদীরাই পারে আপন করে নিতে। নিলু আন্টির কথা মনে আছে আমার। উনি উনার ওসীয়্যত নিয়ে লেখা একটা লেকচারে আমার আব্বুর (শহীদ ডা. এম এ মাজেদ সাহেব) কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে একজন শহীদ পরিবারের সদস্যা আমাদের এখানের সদস্যা হয়ে এসেছেন।" আমি মনে হয় এতটা সম্মান পাবো এত তাড়াতাড়ি সেটা কোনদিন ভাবিও নাই। এছাড়াও দরসে আসা, ওয়াকারে আমলে আসা, জলসার আগে ও ইজতেমার আগে মসজিদ সাজানো এইসব ব্যাপারে আমাকে সবসময়ই অনেক কাছে টেনেছে। এর পাশাপশি তাহেরা আন্টি, নিপা আপু, খুশী আপু, নীতু, পলি আপু, বুশরা, বিথী আপু (সবার নাম লিখতে ইচ্ছা করলেও সম্ভব হচ্ছে না) সবাই কোন না কোনভাবে আমাকে হেল্প করতেন। এখনো করেন। মনে আছে আমার, আমি মসজিদে গেলে আমার ছোট বাচ্চা আমার কাছে রাখতে হতো না। ও থাকতো সবার কোলে। আমাকে মসজিদের কাজে কোনদিন আমার ছেলের জন্য কোন সমস্যা হবে এই সুযোগটা কেউই দেয়নি। কাজ করেছি অনেক আনন্দের সাথে। যতটা না কাজ করেছি তার থেকে বেশী সহযোগিতা, আদর, ভালোবাসা পেয়েছি সবসময়ই। সবাই বলে চট্টগ্রাম এর মানুষ নাকি আপ্যায়নে সেরা। সেটার প্রমাণ আমি বরাবর পেলেও আরো একটা কথা আমি বলবো সেটা হলো, চট্টগ্রাম এর সবাই দূরের মানুষকে আপন করে নিতে আরো বেশী পারদর্শী। বর্তমানে আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমি ও আমার পরিবার 'নুসরাত জাহান স্কিম'-এর অধীনে জিন্দেগী ওয়াকফ করে লাইবেরিয়ায় জামা'তের সেবায় রত আছি। এতো দূরে থেকেও প্রতিদিন চট্টগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে। সবশেষে একটা ছোট্ট কথা বলবো– কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলেছিলেন, "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন।" আমি নিঃসন্দেহে বলবো চট্টগ্রামের প্রত্যেকের মধ্যে সেই প্রতিভার কোন কমতি আল্লাহ দেননি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার প্রেরণার উৎস

নাজমা রহমান দীপা

আটলান্টিকের ওই পূর্ব পাড়ে
উঠলো বেজে তুর শহরে
একি সুর ভেসে আসে
জেগে উঠি আমি অন্তরে
হ্যায় দারদে দীল কি দাওয়া
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

প্যারিস থেকে TGV ট্রেনে করে তুর শহরে আসতে সময় লাগে এক ঘন্টা। উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সের দ্রুতগামী ট্রেনে দূর-দূরান্তে যেতে সময় কম লাগে। তুর (Tours) শহরের শম্রে (Chambray) নামক স্থানে আমার বাসা। এখানে উল্লেখ করত চাই যে, লা-লোয়াখ (La-Loire) নদীর তীরে তুর শহর, আর শম্রে লেক থেকে আমার বাড়ীতে আসতে সময় লাগে মাত্র দশ মিনিট। ভোর বেলা প্রাতঃভ্রমন করে লেক থেকে ঘুরে আসা যায়। গাছপালায় বাহারী পাতায় ভরপুর চারিদিকে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য সবাইকে পুলকিত করে। প্যারিসের মসজিদে মোবারক থেকে আমার বাসাটি প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সুচী আমাকে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকাতে একটি লেখা দিতে বলায় আমি লিখবো লিখবো করে দেরী হয়ে গেল। যাহোক, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশে এসে বড় ভাই (ফুলু ভাই) অর্থাৎ আমার দাদার বাসায় এসে লিখতে বসলাম। বড় ভাইকে আমরা দাদা ডাকি।

জামা'তী কর্মকান্ডে **"আমার প্রেরণার উৎস"**, এ বিষয়ে লিখার প্রয়োজন অনুভব করেছি। তাই এ নিয়ে লিখলাম। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহ আমার সাথে আছে।

খোদা তা'লাই আমার প্রেরণার মূল উৎস।

আমার গর্ভধারিণী মা স্মৃতি কণা, যার পরম স্নেহ যত্নে আমার বেড়ে ওঠা।

মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগ-তিতিক্ষায় আমার শৈশব যতদূর স্মরণ আছে, আমার দিনগুলি ভালোভাবে কেটে গেছে। আমার মা সারা দিন সংসারের কাজ করতেন, স্বামী ও সন্তানের যত্ন করে, অবসরে বই পড়তেন। আমার মা একদিন বাবার সাথে বাবার পাশে এক সাথে (বাজামা'ত) নামাযে ও অংশ নিয়েছিলেন । আমাকে জোহরা খালা বলেছিলেন, "দীপা! তোমার মা কিন্তু আহমদী হয়ে যেতেন; তোমার বাবা তোমার মাকে একটু সময় দিলে, বোধ করি তোমার মা ও ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করতেন।" এটা আমরাও অনুভব করেছি। আল্লাহ গাফুরুল ওয়াদুদ। মা-বাবা সহ যদি একটি ঈদ উদযাপন করতে পারতাম, তাহলে সেটি হতো আমাদের জন্য ঈদ-আনন্দ। আসলে এক জীবনে সবার বেলায় সব কিছু হয় না। আমরা ভাই-বোনেরা একটি করুণ অধ্যায় পার করে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। ঘরে মা না থাকলে, সেখানে পরিবারের ঐক্য ধরে রাখা কঠিন। মায়া-মমতা, ভক্তি-ভালোবাসা ইতাদি অনেক কিছুর ঘাটতি হয়। ছেলে-মেয়েদের বিকাশ হতে বাধা আসে। তবে এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহ্ আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। **"যালিকা ফজলুল্লাহে ইউতিহী মাইয়া শাউ ওয়াল্লাহু যুল ফজলীল আযীম"** (৬২:৫) অর্থ : এটা আল্লাহর ফজল, তিনি যাকে চান এটা দান করেন, এবং আল্লাহ পরম ফজলের অধিকারী।

আমার পিতামহ যোগেন্দ্র লাল দাস, তাঁর একমাত্র পুত্র বিমলেন্দু

দাস। বিমলের ডাক নাম মন্টু, মন্টু বাবু'র পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) মন্টু বাবু'র নাম রাখলেন- 'বদর উদ্দিন'। আমার বাবা ছেলেমেয়েদের তালীম তরবিয়ত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। আমাদেরকে কুরআন শিখতে, নামায কায়েম করতে, এবং দোয়া-দরুদ পাঠ করতে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, আমার বাবা আমাদের ছোটবেলা থেকে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, মসজিদে জুম্মার নামাযে বা যে কোন অনুষ্ঠানে, বা হালকা মিটিংয়ে তিনি আমাদের সব ভাই-বোনকে অংশগ্রহণ করাতেন। জামা'তের বই-পুস্তক পড়া ও ছেলে-মেয়েরা যেন ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে সেদিকে গভীর দৃষ্টি দিতেন। আমরা যেন সঠিকভাবে কুরআন পড়া শিখতে পারি, সেজন্য তিনি চট্টগ্রামে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে আমাদের নিয়ে বি-বাড়ীয়া চলে যান। সেখানে আমরা বি-বাড়ীয়া জামা'তের মক্তবে কুরআন পড়া শিখি। বাবা হুযূরের কাছে চিঠি লিখতে ও আমাদের উৎসাহ দিতেন। সে সময় চিঠি পাঠানো কঠিন ছিলো। তাই বাল্যকাল থেকে জামা'তের কাজে আমি উদ্বুদ্ধ হই। আল্লাহর ফজলে খাকসার চট্টগ্রামে লাজনা ইমাইল্লাহ'র তালিম, তরবিয়ত, জিয়াফত বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। বাবা যে আদর্শ নিজে অনুসরণ করেছেন এবং আমাদের সামনে রেখে গেছেন- সেই পথ লক্ষ্য করে আমরা এতদূর এসেছি। আমি চট্টগ্রামের সরকারি ড: খাস্তগীর গার্লস স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করি। এসএসসি পাশ করার পর চট্টগ্রাম সিটি কলেজ মহিলা শাখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। এরপর ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নাই। প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব আমাকে বাসায় এসে প্রাইভেট পড়াতেন। তিনি আমাকে শুধু English পড়াতেন। তিনি বলতেন যে, "দীপা যা মুখস্থ করেছো, সেটি লিখে ফেল" প্রয়োজনে একাধিকবার লিখবে। প্রিন্সিপাল সাহেব ডবল এম.এ. পাশ ছিলেন। আমি তাঁর এই শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। একজন ছাত্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সফল হতে পারে।

১৯৭১ সালে মামুন সাহেব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সিলেট ১১ নম্বর সেক্টরের একজন সফল মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রধান সেনা নায়ক এম.এ.জি. ওসমানীর কাছ হতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ পত্র লাভ করেন। দেশপ্রেম এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর ছিলো অগাধ ভালোবাসা।

মামুন সাহেব ১৯৭২ সালে এসএসসি পাশ করেন। সিলেট বিয়ানী বাজার কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৭৯ সাল জনাব মোহাম্মদ সোয়াইবুর রহমান মামুন সাহেবের সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমি স্বামীর সাথে ২০০১ সালের মার্চ মাসে কোলকাতা, দিল্লী, আগ্রা, পাঞ্জাব, কাদিয়ান প্রভৃতি স্থানে সফর করি। ২০০১ সালের জুন মাসে মামুন সাহেব স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যে জার্মানীতে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি প্যারিসে সিলেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০০৫ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমি চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই।

লাজনা ইমাইল্লাহ'র স্মৃতিচারণ করতে গেলে যাদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ হয়, তাঁরা হলেন সর্ব মোহতরমা মুখতার বানু, জোহরা নূর, নাসিরা আখতার খান, ইসরাত জাহান, তাহেরা মীর্যা, আমাতুল কাইয়ুম (টুটু) প্রমুখ। এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লাজনা ইমাইল্লাহ'র কর্মকান্ডে আরো উদ্বুদ্ধ হই। উপরোল্লিখিত প্রত্যেকেই ছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া এরা সবাই স্কুল শিক্ষিকা। এদের সবার সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। উনারা প্রত্যেকেই চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহ'র ইতিহাসে একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এখানে উল্লেখ করছি মুখতার বানু সাহেবা বিভিন্ন সময়ে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন খাকসার তাঁর সাথে হালকা পরিদর্শনে যেতাম, জামা'তের ছোট-বড় যে কোন কাজে তিনি বেশ তৎপর থাকতেন। কখনও কোন কাজে ভুল করলে তিনি আমাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিতেন। একবার আমি প্রতিশ্রুত মাহদী বিষয়ক রচনা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করি। এতে তিনি আমার প্রতি খুবই আনন্দে আপ্লুত হয়ে যান। এবার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যাঁকে, তিনি 'জোহরা নূর'। এই মহীয়সী নারী ছিলেন, একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। খুব তবলীগ প্রিয় মানুষ ছিলেন। জোহরা নূর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি সরকারি খাস্তগীর গার্লস হাই স্কুল এবং নাসিরাবাদ গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। এবার এমন একজনের কথা উল্লেখ করছি, যিনি আমার খুবই প্রিয়, তিনি হলেন প্রয়াত নাসিরা আখতার খান। তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সহজ সরল সাদা মনের মানুষ। তিনি জামা'তের কাজের পাশাপাশি মেয়েদেরকে পড়া শুনার ব্যাপারে অনেক তাগিদ দিতেন এবং খুব সহযোগীতা করতেন। উল্লেখ্য যে, বড়দের মধ্যে নিলুফার মমতাজ (নিলু আপা), লাইলা আপা উনাদের কেও স্মরণ করি। যাদের কাছে অনেক উৎসাহ পেয়েছি।

২০০৫ সালে চট্টগ্রামের লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রেসিডেন্ট পদে আমি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আমার ভাবনায় আসে যে, এই চট্টগ্রামের প্রত্যেক হালকাকে বিশেষ করে লাজনার সদস্যগণকে আপগ্রেড করা দরকার। লাজনা এবং নাসেরাতের সদস্যগণ যেন দায়িত্বশীল এবং তাদের মধ্যে যেন কর্তব্য বোধ সৃষ্টি হয়, সেভাবে

তাদেরকে গড়ে তোলাই ছিলো আমার একমাত্র লক্ষ্য। সেই কারণে এই মহতী দায়িত্ব লাভের পর প্রায় প্রত্যেকটি হালকায় আমি গিয়েছি। সদস্যগণের সাথে বাসায় গিয়ে সাক্ষাত করেছি। তখন আমাকে অনেকে বেশ সহায়তা দিয়েছে, আমি ডাকলে ওরা সাথে সাথে সাড়া দিত। এদের কয়েকজন, আমার প্রিয় বোনদের, যাদের কথা না বললে আমার স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আমি স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তাদের স্মরণ করছি। শর্মী, তানিয়া, জুলিয়া, ইসরাত, সীমা, হেবা, মাকসুদা, মনসুরা, লাকী, জুয়েল প্রমুখ। এছাড়া আরো কয়েকজন যাদের নাম স্মরণে নাই।

বর্তমান লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রেসিডেন্ট মোহতরমা রওশান আরা আহমদ সূচী যিনি একজন উচ্চ শিক্ষিতা, যার হাতে আমি বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে আমার প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব (২০০৫ সালে মাঝামাঝি সময়ে) অর্পন করেছিলাম। যিনি সাফল্যের সাথে আজ অবধি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। এতে আমি খুবই আনন্দিত। যদি ও আমি আজ চট্টগ্রাম থেকে সুদূর ফ্রান্সে অবস্থান করছি, কিন্তু চট্টগ্রাম জামা'তের স্মৃতি আমার হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ'র আরও অগ্রগতি ও উন্নতি কামনা করি।

আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে আমি বর্তমানে ফ্রান্সের যে বাসাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি, এটা দারুস সালাম হালকার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জামাতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। বিগত ২০১১ সাল থেকে এই অনলাইন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০০৬-২০১১ ফ্রান্সের প্রতিটি সালানা জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করি।

আমার একজন ব্রিটিশ বয়স্ক বান্ধবী আছে। তাছাড়া আমার কয়েকজন মরোক্কান বান্ধবী ও আছে। অ-আহমদীদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত মহিলা আছে। যাদেরকে আমরা তবলীগি সেমিনারে আমার বাসায় আমন্ত্রণ করেছিলাম। তবলীগ করার জন্য আমার কথা বলতে তেমন অসুবিধা হতো না। আল্লাহ তায়লার ফজলে আমি বাংলা, ইংরেজি, উর্দ্দু, ফ্রেঞ্চ বিভিন্ন ভাষায় কমবেশি কথা বলতে পারি। তাছাড়া তবলীগি মাসলা মাসায়েল সামান্য বলতে পারি। ২০০৭-২০১১ সালে আমার শন্ত্রের বাসায় বিভিন্ন সভা, সেমিনার প্রায়ই নিয়মিত প্রোগ্রাম হতো। একবার দুইদিনব্যাপী একটি তবলীগি সেমিনার আয়োজন করেছিলাম। এই সেমিনারে ৯ জন (বিদেশী এবং কেন্দ্র থেকে আসা) মেহমান উপস্থিত ছিলেন। রাতেও তারা অবস্থান করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা ছিলো। এখানে কোন অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা জামা'ত থেকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করি নাই। সেদিন ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। বরং আমার স্বামী নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী ছিলেন। জামা'তী কর্মকান্ডে আমার স্বামী আমাকে সবসময় দেশ বিদেশে সমর্থন দিয়েছেন। বিদেশেও তিনি আমাকে স্বশরীরে অনেক সহায়তা দেন।

আমরা প্যারিস থেকে জলাসায় গিয়ে বেশী করে বই-পুস্তক নিয়ে আসতাম। তাছাড়া সেখান থেকে অনেক বই কিনে আনতে হয়। আমার বড় ছেলে সালমান ইদানীং এমটিএতে আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক সংবাদ পাঠ করে। দ্বিতীয় ছেলে মাহবুবুর রহমান প্যারিসে থাকে, এবং মেয়ে তাশহুদা এবং জামাতা শামস সবাই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত আছে। ২০১১ সালে তুর শহরের কাছে একটি রাজপ্রাসাদে হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ লাভ হয়েছিলো।

২০১২ সালের ৭ই মার্চ আমার স্বামী মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান মামুন সাহেব ৬২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী মানুষ। সংসারের প্রতি ছিলেন খুবই দায়িত্বশীল।

ফ্রান্সের তুর শহরের ইভ নামক মুসলিম কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেখানে তাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে।

২০১২ সালে আমি জার্মানীর জলসায় যোগদান করি। এবছর আমার ভাই শাহাদাৎ আমিন এর বাসায়, বেলজিয়ামে বেশ কিছুদিন ছিলাম। সেখানে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ২০১৮ সালে UK জলসায় যোগদান করি। ২০১৯ সালে হুযূর (আই.) ফ্রান্সে আসলে ছেলে সালমান সহ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করি।

২০১৯ সালে, করোনাকালে তুর শহরের কাউন্সিল অফিসের আহবানে আমরা মাস্ক সেলাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমার এই কর্মকান্ডে তারা অভিভূত হয়ে আমাকে সম্মাননা প্রদানের জন্য অভিনন্দন পত্র লিখে পাঠায়। ফ্রান্সের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং তুর শহরের মেয়র এখনো আমাকে তাদের সমাজসেবামূলক কোন অনুষ্ঠান হলে আমন্ত্রণ জানান। আমি তখন কয়েকশ মাস্ক সেলাই করে দিয়েছিলাম। এর জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করি নাই।

২০২১ সালে আমি আমার বোন রেশমার বাসায় সুইডেনে ও গিয়েছিলাম। ২০২২ সালে আমি বাংলাদেশে এসে এবার আমি আমার হিস্সায়ে জায়েদাদ চাঁদা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি একজন মুসীহ্। সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

আল্লাহ তা'লার ফজলে আমি যেখানে থাকিনা কেন দুনিয়ার উপর ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করি।

আল্লাহ পাকের দরবারে এটাই চাওয়া, ইসলাম-আহমদীয়াত কায়েম হোক।

স্মৃতির বনভোজনগুলো

ফিজা আহমেদ

বনভোজন!!! কথাটি শুনলেই যেন মন আনন্দে নেচে উঠে সবার। তাই না? জি হ্যাঁ, ঠিক সবার মতন আমিও একজন বনভোজনপ্রেমী। আর যদি সেটা হয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের বনভোজন, তাহলে তো কথাই নাই। আল্লাহর অশেষ কৃপায় বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম প্রতিবছরই খুবই উৎসাহের সাথে বনভোজন আয়োজন করে আসছে। তাই আজ একটু অতীতে গিয়ে আমাদের সেই বনভোজনগুলোর কিছু আনন্দময় স্মৃতি জানাব আপনাদেরও।

পিকনিক অ্যাট পটিয়া: সালটা ২০১০, ডিসেম্বর মাস। খাকসার তখন বেশ ছোট। সেই বার আমরা গিয়েছিলাম আমাদেরই সম্মানিত সদস্যা, নুসরাত আন্টি ও নাঈমা আন্টির শ্বশুড়বাড়ি পটিয়ার আশিয়া গ্রামে। বনভোজনের এক সপ্তাহ আগে থেকেই যেন সবার মধ্যে এক অন্যরকম আনন্দ, প্রথমবার আমরা যাচ্ছি একসাথে কোথাও। কাঙ্খিত দিনে আমরা সকাল সকাল আমাদের চকবাজার মসজিদে গিয়ে হাজির। একটু পরেই আমাদের রিজার্ভ করা বাস চলে এলো। সবাই দোয়া করে উঠে পড়লাম। বাসের মধ্যে আনন্দ করতে করতে প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম। নুসরাত আন্টি এবং তার পরিবার আগে থেকেই সেখানে আমাদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাস থেকে নেমে, নাস্তা খেয়ে আমরা নুসরাত আন্টির দুই মেয়ে শমী আপু ও ঐশী আপুর সাথে অনেকেই বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের চারিদিক দেখতে। সবুজ-শ্যামল গাছপালা, পুকুর-ঘাট ঘুরে দেখতে বেশ ভালো লেগেছিল। দুপুরের খাবারের আগে আন্টিদের বাড়িতে সব লাজনা-নাসেরাত বাজামা'ত যোহর-আসরের নামায আদায় করে। পিছনে মাটির চুলায় লাজনা বোনেরা গ্রামীণ পরিবেশে রান্না করেন এবং সেই রান্না হয়েছিল অসাধারণ। দুপুরে পেট-পুরে খাওয়ার পর লাজনা-নাসেরাত সবার জন্য খেলাধুলা ও কুইজের ব্যবস্থাও ছিল। বাড়ির এই খোলামেলা পরিবেশ পিকনিকের জন্য বেশ উপভোগ্য ছিল।

আনোয়ারা পার্কি বীচ

আনোয়ারা পার্কি বীচ

বিকালের দিকে আমরা সেখান থেকে যাই আরেকটি পিকনিক স্পটে, নাম আনোয়ারা পার্কির চর। সমুদ্র দেখতে অনেকেই এখানে আসে। সমুদ্র উপভোগ করলাম, আনন্দ করলাম। সারাদিন আমরা ভালোই সময় কাটালাম। সন্ধ্যার দিকে যখন

আমরা আবার চট্টগ্রাম শহরে ফেরত আসবো, ঠিক তখনই কোনো এক কারণে আমাদের বাস হয়ে যায় নষ্ট। এরকম শীতের সন্ধ্যায় আমরা এতজন লাজনা-নাসেরাত, এই সময় হঠাৎ বাসটা নষ্ট হয়ে গেল, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, নির্জন এলাকা, আশেপাশে কোনো গাড়িও তেমন নেই, আমরা খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। হাঁটতে থাকলাম আর সবাই খুব দোয়া করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি দূর থেকে একটি বাস যেন আমাদের দিকেই আসছে, এটা ছিল অন্য একটি বাস। আমাদের কাছে এসে একটু পর বাসটি থামলো। জানতে পারলাম এই খালি বাসটি চট্টগ্রামেই যাচ্ছিল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম, এ যেন দোয়া কবুলিয়তের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ্ যে আমাদের দোয়া শুনেন ও তিনিই যে একমাত্র সাহায্যকারী তা আমরা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বুঝতে পারি। তারপর বাসে উঠে আমরা সহি-সালামতে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ্। রোমাঞ্চকার এই বনভোজন আমাদের মনে সদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

উদালিয়া চা-বাগান: বছর ঘুরে আবার সময় হলো পিকনিকে যাবার। সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে ঠিক করা হলো যে আমরা এবার "উদালিয়া চা-বাগান"-এ যাচ্ছি।

উদালিয়া চা-বাগান

বড় বড় দুই বাসে করে ২০১১ সালের কোনো এক শীতের সকালে আমরা চা-বাগানের উদ্দেশ্যে লাজনা-নাসেরাত বোনেরা রওনা হই। ফটিকছড়ি উপজেলার উদালিয়া চা বাগানটি ৩০৪৪ একর পাহাড়ি টিলা ও সমতল ভূমিতে গড়ে উঠা। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে সবুজের মধ্য দিয়ে প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা সময় লাগল আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে। আমরা প্রথমে চা-বাগানের বিশাল বাংলোতে যাই। বাংলো দেখে আমাদের মন জুড়িয়ে গেল। বাংলোর চারিদিকে গাছপালা, সামনে ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। লাজনা নাসেরাত বোনেরা হাত মুখ ধুয়ে হালকা নাস্তা করে এদিক সেদিক ঘুরলাম। আর কয়েকজন আন্টি মিলে শুরু করলো দুপুরের খাবারের জোগাড় করা। আমার যতটুকু মনে পড়ে যে বাংলোর পিছনের দিকে মাটির চুলায় বড় হাড়িতে দুপুরের রান্না করা হয়েছিল।

উদালিয়া চা-বাগান

যাই হোক, একটু পরে আমরা বাংলো থেকে বের হই চা-বাগান দেখতে। পাহাড়ের উপরে চা-বাগানের মনোরম দৃশ্য দেখে সবাই যেন সবুজের মধ্যে হারিয়ে গেল। বাগানে কাজ করছিল অনেক উপজাতি বোনেরা। চা-বাগানের আরেকটু সামনেই ছিল একটি ফ্যাক্টরী। আমরা সেখানেও গেলাম ঘুরতে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম কিভাবে চা-পাতা তৈরি হয়, সেগুলো প্রসেস হয় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। ঘুরাঘুরি শেষে আবার ফেরত আসি বাংলোতে। সবাই ওযূ করে যোহরের নামায আদায় করি। তারপর দুপুরের খাওয়া শেষে বাংলোর সামনের জায়গাতে আমাদের সবার খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। গ্রুপ করে কিছু খেলা হয় আবার আলাদা করেও হয়। যখনই কোনো পিকনিকে যাই তখনই একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি যে কখন খেলাধুলার পর্ব শুরু হবে। উদালিয়া চা-বাগানের বাংলোর সামনের বড় জায়গাতে একটি সুইমিং পুলও ছিল। আমরা যে সময় যাই তখন পুলে কোনো পানি ছিল না। শুকনো এই পুল হয়ে গিয়েছিল আমাদের বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ির জায়গা। পুলের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামছিলাম আর উঠছিলাম। আহা সে কি দিন ছিল! ছবিও তুলেছিলাম। কিন্তু আজকের দিনের মতো আমাদের সেসময় কারোর কাছেই স্মার্টফোন ছিল না। সেই পুরনো ধাঁচের ক্যামেরা দিয়েই কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম বলে মনে পড়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই জায়গা ছেড়ে আমাদের কারোরই আসতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু বিকালের পরেই রওনা দিতে হলো। এই চা-বাগানের স্মৃতিময় বনভোজন আমরা কখনোই ভুলব না।

বান্দরবন: লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের বনভোজনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ২০১৯ সালের বান্দরবন যাত্রা। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ, বুধবার। প্রতিবারের মতো আমরা একটি বাস ভাড়া করে

সকাল সকাল চকবাজার মসজিদ থেকে দোয়া করে উঠে পড়ি। পাহাড়ি আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লাগল পৌঁছাতে। প্রথমে আমরা যাই বান্দরবন ক্যান্টনমেন্টে। যেখানে আমাদেরকে স্বাগতম জানান আমাদেরই জামা'তের সদস্য কর্ণেল ড. মাহফুজ সাহেব ও তার পরিবার। বাস থেকে নেমে আমরা নাস্তা করি ও ক্যান্টনমেন্টে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই। তারপর দুপুরের এক এলাহী ভোজনের পর আমরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে যাই বান্দরবনের কিছু পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখার জন্য। কর্ণেল সাহেব আমাদেরকে একটি ছোট বাসের ব্যবস্থা করে দেন যেটিতে করে আমরা প্রথমে যাই "মেঘলা" নামের এক স্পটে। বান্দরবন এলে এই জায়গাটিতে সবাই ঘুরতে আসে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি এই মেঘলা। আমরা এখানে সবাই মিলে ঘুরলাম আর অনেক ছবি তুললাম।

মেঘলা, বান্দরবন

বিকেলের দিকে আমরা আরেকটি স্পটে যাই যেটার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমরা গিয়েছিলাম বান্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট "নীলাচল"-এ।

নীলাচল, বান্দরবন

নীলাচল থেকে পুরো বান্দরবন শহর এক নজরে দেখা যায়। ঠান্ডা বাতাস বইছিল সে সময়। সিঁড়ি বেয়ে সবাই উঠে গেলাম পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের চূড়া থেকে যখন আশেপাশে তাকাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন মেঘের উপর আছি। আমি, তুবা, সারা, প্রজ্ঞা আপু, তাহিনা আপু সবাই একসাথে অনেক ছবি তুললাম। সব লাজনা নাসেরাত শিশুরা এদিক সেদিক ঘুরে দেখছিল। সাবু, রিমি ওরাও অনেক মজা করছিল। আমাদের মুক্তা আপু তার বাসা থেকে একটি ছোট লাল রংয়ের স্পিকার নিয়ে এসেছিলেন। সেটিতে নযম চালিয়ে আমরা পাহাড়ের উপর "পিলো পাসিং" গেম খেললাম। খুশি আন্টি বয়স্ক লাজনাদের নিয়ে একটি মজার খেলার আয়োজন করলেন। খেলার নিয়মানুযায়ী সবাইকে নিজেদের ফোন নাম্বার বাংলায় মুখস্ত বলতে হবে! নিলু আন্টি, আম্মু, কাজল আন্টিসহ সব খেলোয়াড়রা পড়ল টেনশনে। শুরু করল প্রস্তুতি নেওয়া। কেউ একপাশে বসে মুখস্ত করছে আবার কেউবা এক কোণায় দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ আবার হাতে লিখে পড়ে পড়ে মুখস্ত করছে। সে কি আনন্দ সবার! হাসাহাসি, খেলাধুলা, হৈ চৈ করে আমরা নীলাচলে বিকালটা পার করলাম। নীলাচল পাহাড় থেকে নামার জন্য সিঁড়ির পাশে চারটি বড় স্লিপারও রয়েছে বাচ্চাদের জন্য। আমি আর তাহিনা আপু বাচ্চাদের সেই স্লিপারে করে নিচে নামার সময় কি কান্ডটাই না ঘটিয়েছিলাম! সে সবই এখন স্মৃতি। মনে পড়লে খুব হাসি পায়। সারাদিনের ঘোরাফেরা শেষে আমরা এবার ফেরত যাচ্ছিলাম বান্দরবন ক্যান্টনমেন্টে। ফেরত যেতে যেতে পাহাড়ি রাস্তায় ছোট বাসের মধ্যে আমরা অনেক আনন্দময় সময় পার করি। সবাই মিলে নযম ও দেশাত্মবোধক গান করতে থাকি। আমাদের এই বাচ্চাদের হৈচৈ তে আমাদের আন্টিরাও সামিল হন। কাজল আন্টি, খুশি আন্টি, নাঈমা আন্টি সবাই আমাদের সাথে গানে গলা মেলান। আমাদের যেন আনন্দের সীমা ছিল না। ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করলাম সবাই। কর্ণেল সাহেব আবার আমাদের জন্য সন্ধ্যাকালীন নাস্তারও আয়োজন করেছিলেন। আমাদের এই বান্দরবন পিকনিক আয়োজনে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য কর্ণেল মাহফুজ সাহেব ও তার স্ত্রী মৌসুমী আপুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। নাস্তা খেয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আমাদের বড় বাসে উঠে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সবাই আল্লাহর রহমতে ঠিকভাবে পৌঁছে যাই যার যার বাসায়। এই পিকনিকে আমরা এতোটাই মজা করেছিলাম যে এখনও পিকনিক নিয়ে গল্প করতে বসলে বান্দরবনের কথা উঠে আসে। বাংলার প্রকৃতি যে কতো সুন্দর তা বান্দরবন গেলে উপলব্ধি করা যায়।

নিরিবিলি পার্কঃ চট্টগ্রাম শহর থেকে খুব কাছেই রয়েছে একটি সুন্দর পিকনিক স্পট। নাম তার নিরিবিলি পার্ক। ২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সেখানে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম আয়োজন করে বার্ষিক বনভোজনের। শীতের তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও সকাল সকাল সবাই সময়মতো পৌঁছে যাই মসজিদে। একটু পরে রিজার্ভ করা আমাদের বাস দুটো চলে আসে। যথারীতি দোয়া করে উঠে পড়ি

সবাই বাসে। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে যাই আমাদের গন্তব্যে। বাস থেকে সবকিছু নামিয়ে নিয়ে প্রথমে পার্কের রেস্টুরেন্টে বসে সবাই সকালের নাস্তা করি। গ্রামীণ একটা পরিবেশ ছিল। আশেপাশে গাছপালা ও সবুজের সমারোহ ছিল। বাচ্চাদের খেলা করার জন্য ছিল স্লিপার, দোলনা, ছোটো ঘোড়া ইত্যাদি। আমাদের রোকসানা আন্টি তো বরই গাছ দেখেই খুশি হয়ে গেল, গাছে দিল ঝাঁকি। আমি টুক করে সে দৃশ্যের একটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম। সেই বার পিকনিকে সাবু (মওলানা জাফর আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে) ছিল আমাদের সাথে। সেই ছোট্ট সাবু এখন পঞ্চগড় থাকে। এতদিনে বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। খুব মনে পড়ে ওর কথা। ঐবার পিকনিকে আরও ছিল আমাদের সবার প্রিয় রত্না আপু। উনি তখন বেড়াতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। এছাড়াও আরও অনেকে যেমন ফারিহা ফাইরুজ আপু, ফালাক আপু ও উনার দুই মেয়ে; নাঈমা আন্টি ছিলেন যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের বাইরে থাকেন। কিন্তু মনে পড়ে সবার কথাই।

নিরিবিলি পার্ক

গুলিয়াখালী সী-বীচ

সকালের নাস্তা শেষ করে ও আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করতে করতে মুক্তা আপু শুরু করলো ডাকাডাকি কারণ খেলাধুলার পর্ব শুরু হবে। প্রথমে নাসেরাত ও শিশুদের খেলা হলো। সবাই খুব উৎসাহের সাথে অংশ নিল। তারপর মুক্তা আপু শুরু করল লাজনাদের খেলা। আমাদের সবাইকে বাসে থাকতেই একটুকরো কাগজ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কে কোন গ্রুপে তা লিখা ছিল। যার যার কাগজে লেখা গ্রুপ অনুযায়ী সবাই নির্দিষ্ট গ্রুপ করে দাঁড়াল। ভাগ্যক্রমে আমি, মুক্তা আপু, প্রজ্ঞা আপু, ফারিহা আপু, খুশি আন্টি, উর্মি আন্টি আর সানজিদা পড়লাম এক গ্রুপে। ব্যাস হয়ে গেল! আমাদেরকে আর কে হারায়! বাকি গ্রুপ গুলোর সাথে কম্পিটিশন করে খুব ভালোভাবেই জিতেছিলাম আমরা। সত্যি কথা বলতে মসজিদের যেকোনো কিছুতে ভালো ফলাফল করলে পরে এখনও বাচ্চাদের মতো খুশি লাগে, আনন্দ হয়। হোক সেটা খেলা কিংবা কুরআন প্রতিযোগিতা। আমাদের লাজনাদের খেলা যখন হচ্ছিল তখন খেলার মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে ভেড়ার পাল যাওয়া শুরু করে। আর আমরা কয়েকজন ভয়ে খেলা, মোবাইল, চেয়ার ফেলে চিৎকার করে এদিক ওদিক ছুটছিলাম। নিলু আন্টিও এমন ভয় পেল যে, কি বলব! পরে অবশ্য আমাদের কয়েকজনের ভয় পাওয়া নিয়ে সবাই খুব হাসাহাসি করলো।

তারপর খেলাধুলা শেষ করে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গেলাম আরেকটু দূরে। সেখান থেকে দেখা যায় সমুদ্র। সমুদ্রের সামনে খোলা মাঠে চেয়ার টেবিল বিছানো ছিল। বসে পড়লাম সবাই ফুচকা-চটপটি খেতে। ঐসময় সেহলা সুরাইয়া মুন্নি আন্টি শুরু করলেন কুইজ। যেই সঠিক উত্তর দিচ্ছিল তাকেই মুন্নি আন্টি পুরস্কার দিচ্ছিলেন। আমরা অনেক উৎসাহ ও আনন্দ পেলাম আন্টির এই উদ্যোগে। অনেক অজানা বিষয়ও জানা হলো কুইজের মাধ্যমে। বাচ্চারাও এতো বড় ও খোলা জায়গা পেয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা ও খেলাধুলা করছিল। আমি, মিথিলা আপু, তুবা, সারা আবার একটু ব্যাডমিন্টনও খেললাম। সমুদ্রের কাছে ছবি তুলে আমরা এবার রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি যোহরের নামায পড়তে ও দুপুরের খাবার খেতে। খাবারের পর খুশি আন্টি বয়স্ক লাজনাদের নিয়ে খেলা শুরু করলেন। উনাদের জন্য ছিল ঐবার স্মৃতিশক্তি খেলা। কিছু জিনিস দেখানোর পর উনাদেরকে সেগুলো মুখস্ত বলতে বলা হয়েছিল। আমাদের আন্টি-দাদিরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েন লাইনে, সবাই রেডি মুখস্ত বলতে! সবকিছুতে উনাদের আগ্রহ আর উৎসাহ দেখলে আমি প্রেরণা পাই। যাই হোক, সবশেষে পুরস্কার বিতরণী ও অনেকের কাছ থেকে পিকনিক কেমন লাগল সেই অনুভূতি গ্রহণের পর আমরা সন্ধ্যার আগে রওনা দিই বাসায় ফেরার উদ্দেশ্যে। এভাবেই শেষ হয়ে যায় আমাদের বনভোজনের সুন্দর দিনটি। এটা ছিল করোনার আগে আমাদের শেষ পিকনিক। মহামারীর কারণে গত দুই বছর পিকনিক আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তবে সামনে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই আবার খুব শীঘ্রই বনভোজন করতে পারব বলে আশা রাখি।

এছাড়াও লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম কাপ্তাই, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর স্থানে সফলভাবে বনভোজন আয়োজন করেছে আলহামদুলিল্লাহ্। সেই সমস্ত স্মৃতি আজ ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারলাম না। তবে আমাদের অন্তরের অন্তরস্থলে সযত্নে গুছিয়ে রেখেছি সেই স্মৃতিতে ভরপুর দিনগুলো। সবসময় পিকনিক আয়োজন করার আগে আমাদের যতোটা উল্লাস থাকে, পিকনিকের দিনটা শেষ হয়ে গেলে ঠিক ততটাই মন খারাপ হয়। অপেক্ষা শুরু হয় পরবর্তী পিকনিকের।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম সবসময়ই চেষ্টা করে মসজিদ কমপ্লেক্সের বাইরে পিকনিক আয়োজন করতে। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবছর আমরা বনভোজন করে থাকি। আমাদের আনন্দ-উল্লাস ও ভ্রমণের জন্য এরকম একটি সুযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমরা লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-কে ধন্যবাদ জানাই। বনভোজনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা অনেক আকর্ষণীয় স্থান দেখার সুযোগ পাই তেমনি এর মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

প্রতিবারই পিকনিক আয়োজনে আমরা আল্লাহর অশেষ রহমত ও জামা'তের জন্য কিছু নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সহযোগিতা পাই যাদেরকে ছাড়া সফলভাবে বনভোজন আয়োজন সম্ভবপর হয় না। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি যেন মহান আল্লাহ্ তাদের নিঃস্বার্থ সেবা কবুল করেন। আর প্রতিবছর যেন আমরা লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম এভাবেই মহা আনন্দের সাথে সবাই মিলে একসাথে বনভোজন করতে পারি সেই জন্যও দোয়া চাইছি।

সমাজে মহিলাদের ভূমিকা

আহমদীয়া জামা'ত ঘানার ২০০৪ সনের সালানা জলসার বক্তৃতায় হযূর বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশ্যেও কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"সমাজে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন নারীর মৌলিক ভূমিকা তার ঘর থেকে আরম্ভ হয়, যেখানে সে একজন স্ত্রী এবং একজন মা হিসেবে অথবা বিয়ে না হয়ে থাকলে ভবিষ্যৎ মা হিসেবে নিজ ভূমিকা পালন করে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, সর্বদা তাকওয়ার পথে পদচারণা কর। মহিলারা যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারে এবং খোদা তা'লাকে ভয় করে আর তাকওয়ার পথে পদচারণা করে তাহলে তারা সমাজে এক বিপ্লব সাধনের যোগ্যতা অর্জন করবে। একজন নারী নিজের স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এবং সন্তানদের যথার্থ প্রতিপালনের দায়িত্ব তার।"

পুনরায় তিনি (আই.) বলেন–

"অতএব হে আহমদী নারীগণ! আপনারা নিজেদের এই উচ্চ মর্যাদা অনুধাবন করুন আর নিজ বংশধরকে সমাজের মন্দ বিষয়াদি থেকে রক্ষা করে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্রে গড়ে তুলুন। এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন না যারা তাঁর নির্দেশাবলীকে গুরুত্ব দেয় না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে নিজেদের প্রকৃত পদমর্যাদা বোঝার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক তত্ত্বাবধানের তৌফীক দান করুন। আমীন।"

(ঘানার সালানা জলসা-২০০৪, আলআযহারো লেযাওয়াতিল খিমার, 'ওড়নী ওয়ালীওঁ কে লিয়ে ফুল', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ)

সত্যের পথে আলোকবর্তিকা এক নও-মুসলিম ‘নুরুল ইসলাম চক্রবর্তীর’ জীবন কথা

নুসরাত জাহান (মরহুমের মেয়ে)

১৯৯২ সাল, আমি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজে বি.এ ক্লাসের ছাত্রী। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের আমীরের দায়িত্বে ছিলেন আনু মিয়া সাহেব। তিনি আমার বাবার কাছে আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ছেলে চট্টগ্রামের, পেশায় ঠিকাদার এবং সাথে ছোটখাট ব্যবসা করেন। বায়োডাটা দেয়া হলো। ছেলের বায়োডাটা হাতে নিয়ে আমার বাবা পড়লেন তারপর সবাইকে ডেকে বললেন, ‘তোমরা বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নাও। আমার মনে হচ্ছে এখানেই আমার মেয়ের জোড়া এবং এখানেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে’। বাবার কথায় ঘরের সবাই এক প্রকার চিন্তিত। একেতো অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত লোকজন, কারো সাথে কোন জানাশুনা নেই, এমন এক জায়গায় বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেললেন! এভেবে ঘরের সকলের মন খারাপ। সেই সময় চট্টগ্রাম নাসিরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন জোহরা বেগম। স্বামী নুরুদ্দীন আহমদ পরবর্তীতে চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জোহরা আপা এবং নুরুদ্দীন সাহেব আমাদের পরিবারের খুব আপনজন ছিলেন। সে সূত্র ধরে নুরুদ্দীন সাহেবের কাছ হতে ছেলের বিষয়ে বিস্তারিত জানার এবং পরিচয় নেয়ার জন্য যোগাযোগ করা হল। নুরুদ্দীন সাহেব এবং জোহরা আপা সহ চট্টগ্রাম জামা'তের সকলেই ছেলের বিষয়ে খুবই ভালো রিপোর্ট দিল। তাঁরা বলেন, ‘ছেলে খুবই ভালো, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভবিষ্যৎ ভালো। সম্পর্ক হলে খারাপ হবে না। অপর দিকে আমার বড় ভাই শহিদুল ইসলাম বাবুল স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২৬ বছর চট্টগ্রামে ছিলেন এবং চট্টগ্রাম জামা'তে খোদ্দামের কায়েদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। আমার ভাই চট্টগ্রামে থাকার সুবাধে সকলকে জানেন এবং চিনেন। তাঁরা সকলে

বললেন, ছেলের বড় ভাই ফরিদ আহমদ সাহেব একজন সরকারী বড় কর্মকর্তা এবং মোখলেস ও নেক আহমদী। তাঁরা চট্টগ্রামের বনেদী পরিবার। সবার পক্ষ হতে ভালো খবরাখবর পাওয়ার পর ১৯৯২ এর ১৫ মে চট্টগ্রাম মসজিদে আমার আক্‌দ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আকদের পর হঠাৎ করে ৯২ এর ২১ জুলাই আমার মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। এরপর আমার বি.এ পরীক্ষা। সব মিলিয়ে বিভিন্ন কারণে ৯৩ এর ৪ জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রামে চলে আসি। সেই থেকে ২৯ বছর ধরে আমি চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বউ হিসেবে আমি চট্টগ্রামেরই একজন লাজনা ইমা ইল্লার সদস্য এবং চট্টগ্রামেরই একজন।

বিয়ের পর সংসার জীবনে আমাকে অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে। স্বামীর বিভিন্ন ব্যবসায়িক অসুবিধার মাঝে অনেক সময় সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাতে হয়েছে। বিয়ের পরের বছরই আমার মেয়ে শমীর জন্ম। স্বামী, শ্বাশুড়ি, মেয়ে, ভাড়াবাসা সব মিলিয়ে সংসারের খরচ চালাতে আমার স্বামীর অনেক কষ্ট হচ্ছে দেখে আমিও পার্টটাইম সেলাইয়ের কাজ শুরু করি। সেলাই করে আমার ভালই আয় হতো। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় সংসারের ভালই উন্নতি হতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র পরিবর্তন হলো, ঘরে আসলো যেমন রঙিন টিভি,খাট, ফ্রিজ ইত্যাদি। এক সময় ঘরে টেলিফোন আসল,এরপর কিছু দিনের মধ্যে গাড়ীও কেনা হয়ে গেল। সত্যিই আমার স্বামী অসম্ভব পরিশ্রমী ও একজন প্রতিভাবান বিশাল হৃদয়ের মানুষ। সে এখনও রাত দিন অনেক পরিশ্রম করেন। আল্লাহ্‌তালা আমার স্বামীকে সবদিক দিয়ে ভাল রাখতে সুস্থ রাখুন এই দোয়া করি। এখন আমার ২ মেয়ে ১ ছেলে। মেয়ে দুইজনই ইঞ্জিনিয়ার আর ছেলে এই বার এসএসসি দিবে ইনশাআল্লাহ। আমার স্বামীর পরিচয়টা এখাতে তুলে ধরার প্রাসঙ্গিক মনে করছি। নেছার আহমদ চট্টগ্রামের মানুষের নিকট বহুল পরিচিত একটি নাম। সে চট্টগ্রাম বিষয়ে গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক এবং 'শিল্পশৈলী' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক। ইতিমধ্যে তাঁর প্রায় ২৫ টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ভারত হতে তাঁর একটি বই ইংরেজি অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিয়ের পর হতেই দেখছি সে জামা'তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন সত্যিকার নিষ্ঠাবান আহমদী কর্মী হিসেবে বিয়ের পর হতে তাকে দেখেছি, চট্টগ্রাম জামা'তে সে সেক্রেটারী তবলীগ, জলসা কমিটির সেক্রেটারী, চেয়ারম্যান, জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী, নায়েবে আমীর এবং চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে সেবা করে আসছে।

আমি যখন আমার লেখাটা লিখছি এই সময়ে আমি লাজনা ইমাই ইল্লাহ, চট্টগ্রামের সেক্রেটারী তাজনীদ এবং চকবাজার হালকা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

সাতরাজার ধন আহমদীয়াত পাওয়াটা আমার জন্য মহা এক গৌরবের। প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াত আমাদের জীবনে সহজে আসেনি, অনেক কষ্ট, ত্যাগ, জুলুম অত্যাচার, ধৈর্য্য ও ন্যায়নিষ্ঠতা ও আমার পিতার আন্তরিক ধৈর্য্য ও ত্যাগের এবং বিশেষ করে দোয়ার কল্যাণের সফলতাই হলো আমাদের জন্য নেয়ামত হিসেবে পাওয়া আহমদীয়াত। লেখার শুরুতেই আমি আমার পরিচয়টা তুলে ধরেছি, কারণ হলো আমার মত অতি সামান্য এবং নগন্য মানুষ শুধুমাত্র আহমদীয়াত ও আমার বাবার দোয়ার কল্যাণেই নিম্ন পর্যায় হতে আজকের এ পর্যায়ে উঠে এসেছি। যে মহান মানুষটির দোয়ার কল্যাণে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ায় যা পাওয়া তিনি হলেন আমার বাবা। আমার বাবাকে নিয়ে আমার এ লেখা। যার আত্মত্যাগ, ধৈর্য্য, ইবাদত সর্বোপরি খোদাপ্রাপ্তির মাধ্যমে আহমদীয়াতের একটি জ্বলন্ত নিদর্শন হিসেবে যিনি সাতরাজার ধন আহমদীয়াত পেয়েছিলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার জন্য ভূমিকাটা লিখতে হলো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বনামধন্য বড় মৌলানা বলে খ্যাত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ) এর মাধ্যমে ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। তাঁর ভক্তকুলের সকলে সত্যের সন্ধানে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এসব আহমদী তথা ইসলাম প্রেমিকদের প্রেম পূর্ণ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আমার বাবা হিন্দু ব্রাহ্মণ থেকে সাতরাজার ধন আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে সর্ব প্রথম আমার বাবা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বাবার বংশের কেউ এখন পর্যন্ত আর ধর্মান্তরিত হননি। আমার বাবার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাবলী তাঁর নোট বুক থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি। সত্য গ্রহণের ঘটনাগুলো কিছু তাঁর নিজ মুখের বর্ণনা। বাবা বলতেন, 'এইগুলি তোমরা যত্ন করে রাখিও। পরে যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা জানতে চাইবে তাদের নানা/দাদা কিভাবে মুসলমান হলেন, তোমরা যেন নির্ভুল ইতিহাস তাদেরকে জানাতে পার। এটি আমানত হিসেবে তোমরা সংরক্ষণ করিও'।

আমার বাবার নোটবুক এবং তিনি সময়ে সময়ে যে সব ঘটনা আমাদেরকে শুনাতেন তাথেকে যতটুকু আমার স্মরণ আছে তা সংক্ষিপ্তকারে এখানে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

'ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার পিতা ও পিতামহের বাসস্থান। ব্রিটিশ আমল থেকে এই ব্রাহ্মণ বংশের নামেই এই শহরের নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীবাড়ি ছিল এই শহরের কেন্দ্রবিন্দু। যা আজ অবদি এভাবেই আছে। স্থানীয় ভাষায় ঠাকুরবাড়ি হিসেবে সুপরিচিত'।

"বাবারা তিন ভাই দুই বোন। বাবা মেঝ। বাবার হিন্দু নাম 'শ্রী কালীমোহন চক্রবর্তী'। বাবার বয়স যখন ১০ বছর তখন দাদী মারা যান। মাতৃহারা এ ছেলের প্রতি দাদার স্নেহ, মায়া মমতা, ভালোবাসা ছিল সবেছেয়ে বেশি। তিনি আদরের এ ছেলেকে কখনো চোখের আড়াল করতেন না। হিন্দু থাকা অবস্থায় আমার বাবা অত্যন্ত ধার্মিক, শান্ত শিষ্ঠ ও চরিত্রবান ছেলে হিসেবে সবার আদরের ছিলেন।

বাবা ছোটবেলা হতেই সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। বয়স ১২ হওয়ার সাথে সাথেই ব্রাহ্মণ প্রথা হিসেবে বাবাকে অনুষ্ঠান করে পৈতা (১টা সাদা সুতা) পরানো হয়। পৈতা পড়ানোর ফলে বিভিন্ন বাসায় ও মন্দিরে পুজা পরিচালনা করতে পারবেন। এক সময় যখন পুজার মওসুম শুরু হল তখন ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল কম। ফলে বাবাকে বলা হল কয়েকটা মন্দিরে পুজা সারতে হবে। তখন তিনি দাদাকে বললেন, 'বাবা আমি বেশি মন্ত্র জানিনা কিভাবে পুজা করব?' দাদা বললেন, 'যা জান তা দিয়ে শেষ করে আস, মন্ত্রতো তুমি মনে মনে পড়বা কেউ শুনবেনা'। উত্তরটা তত বেশি তাঁর পছন্দ হয়নি। এরপরও যথাসময়ে বাবা বিভিন্ন বাড়িতে এবং মন্দিরে পুজা সম্পাদনের জন্য বের হলেন অন্য ভাইদের সঙ্গে। পুজা শেষে সব মানুষেরা বাবাকে ষষ্টাঙ্গে প্রনাম করে। ঠাকুর পরিবারের ব্রাহ্মণদের ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করার নিয়ম ছিল। যখন যুবক, বৃদ্ধা সকলে তাঁকে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করছিলেন তিনি তা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'এরা আমাকে বিশ্বাস করে প্রণাম করছে! সম্মান করছে! কিন্তু আমিতো কিছুই জানিনা। আমি জেনেশুনে তাদের বিশ্বাসের সাথে ধোকাবাজি করছি। এটা কি আমার ধর্ম? সব কিছুই মনে মনে বলেই সেরে ফেলা যায়'? সে সময় হতে ধর্ম নিয়ে, ধর্মের ব্যবসা, নিয়মনীতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু হলো। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। "ব্রাহ্মণ কি সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে'? এটা আবার কোন ধরণের ধর্ম"? তাঁর মনে এধরণের এলোমেলো বিভিন্ন প্রশ্ন জাগতে লাগল। বড় কাকা এবং দাদার সঙ্গে এই সব প্রশ্ন করলে উনারা তাঁকে বকা দিয়ে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু আমার বাবাতো চুপ থাকার মানুষ নয়। বাড়ির সামনেই মুসলমানদের তথা একজন আহমদীর মুসলিমের মুদির দোকান। দোকানদারের নাম আব্দুল হেকিম। সেই সময় থেকে বাবা সুযোগ পেলেই সেই দোকানে গিয়ে বসতেন। আব্দুল হেকিম সাহেব অত্যান্ত ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি যাকে পেতেন তাকেই ধর্মীয় বিষয়ে প্রকৃত ধর্মের স্বরুপ এবং প্রকৃত ধর্ম কি? ইমলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কি? এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন। লোকেরাও এসব কথা শুনে লাভবান হতেন এবং ধর্ম শিখতেন। বাবার আজেবাজে আড্ডা, বন্ধুদের সাথে ঘুরাফেরা বা অন্য কোন বাজে অভ্যাস ছিলনা। ফলে বাবা তাঁর দোকানের নিয়মিত একজন শ্রোতা হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান জানার ও বুঝার চেষ্টা করতেন। ধর্ম বিষয়ে যে সব প্রশ্ন তাঁর মাথায় ঘুরপাক তিনি তাঁর নিকট হতে জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন। আস্তে আস্তে বাবার কাছে আব্দুল হেকিমের কথাগুলো যুক্তিসম্পন্ন ও প্রকৃত ধর্মীয় ব্যাখ্যা হিসেবে ভালো ভাল লাগতে শুরু করল। যতদিন যেতে লাগল বাবার মনে মুসলমান ধর্মের বিষয় নিয়ে আরো বেশি প্রশ্ন জাগতে লাগল। মুসলমানের দোকানে যাওয়া আসাটা এবং সেখানে নিয়মিত বসে বসে আড্ডা দেওয়াটা আমার দাদার পছন্দ হতো না। দোকান থেকে ঘরে আসলে দাদা আমার বাবাকে বলতেন, 'তুই মুসলমানের দোকান থেকে এসেছিস, তাদের সাথে মেলামেশা করিস। সুতরাং স্নান করে ঘরে আসবি'। স্নান করে ঘরে আসার বিষয়েও বাবার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল। তিনিতো খারাপ কিছু করছেন না সেখানে বসে ধর্মীয় আলোচনা শুনছেন। এসব বিষয় হতে 'হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরাগ এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ে জানার আগ্রহ বাবার দিন দিন বেড়ে গেল।

মুদি দোকানে অনেক আহমদী বুজুর্গ ব্যক্তিদের আনাগোনা ছিল। মাঝে মধ্য আব্দুল হেকিম ও আব্দুল আজিজ মৌলানা দোকানে নিয়মিতভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা ও প্রকৃত ধর্মের সৌন্দর্য্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। বাবার বয়স তখন ১৩/১৪ বছর। সেই বয়সেই তিনি এইসব জ্ঞানগম্ভীর ধর্মীয় কথাবার্তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতেন। ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা এবং আলোচনাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনার ফলে আস্তে আস্তে বাবার মনেও নিজের হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হল এবং প্রকৃত সত্য এবং ব্রাহ্মণদের প্রাত্যহিক ধর্ম চর্চা এসব বিষয়ে সন্দেহ জাগা শুরু হল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন 'আমরা নিজের হাতে মাটি দিয়ে যে দেবতা তৈরি করি আবার এটার পুজা করি। এই মাটির দেবতা আমাকে কি দিবে'? নিয়মিত মুসলমানের দোকানে বসে নিয়মিত ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা, তাঁর অংশ গ্রহণ প্রভৃতির কারণে বাবার বিরুদ্ধে অনেকে দাদার কাছে বিচার দিতে লাগলো। হিন্দু ধর্ম মতে ব্রাহ্মণদেরকে মুসলমানরা শরীরে হাত দিলে স্নান করে পবিত্র হতে হয়। এ যে নিয়ম সেটি তিনি মেনে নিতে পারতেন না। তিনি তো কোন খারাপ ও অপবিত্র কাজ করে আসেনি, তবে কেন স্নান করতে হবে? যত দিন যাচ্ছে হিন্দু ধর্মের নিয়মনীতি বাবার অপছন্দ হতে লাগল। হিন্দু ধর্মের নিয়ম কানুন এবং ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য সৌন্দর্য্য, খোদার একত্ব, দোয়ার কবুলিয়ত, মানবতাবোধ, সাম্য প্রভৃতি বিষয়ে জানার ফলে মুসলমান ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হতে লাগলেন। তাঁর মনের

মধ্যে হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রমাণিত হতে লাগলো। এক সময় বাবা চিন্তা করলেন তিনি আর মূর্তি পুজা করবেন না।

বাবা একদিন দাদাকে বললেন, 'বাবা আমার মনে হচ্ছে মূর্তি পুজা ও হিন্দু ধর্ম মিথ্যা, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের খোদা সত্য'। দাদা এই কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর ছেলে ভিন্ন পথে যাওয়া শুরু করেছে। তিনি বাবাকে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। মুসলমানদের প্রতি বেশি মেলামেশার কারণে ঘরের মধ্যে ভাই বোনের অবহেলা, অপমান ও কথায় কথায় খোঁচা দেওয়া শুরু হলো। এরপর থেকে বাবা আর কোন মন্দিরে এবং হিন্দু বাড়িতে পুজা করতে যান নাই।

আব্দুল হেকিম সাহেব হতে বাবা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ইসলাম ধর্মের বই পুস্তক নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। এ বয়সেই বাবা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ) এর লেখা 'নিশানে আসমানী' বইটা পড়ে শেষ করেন। বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় সত্যের সন্ধানের পদ্ধতি পড়ে তাঁর মনের মধ্যে সত্যকে জানার আগ্রহ তৈরি হলো। সে পদ্ধতিতে নিয়মিত আল্লাহার কাছে দোয়া করা শুরু করলেন। তিনি কাতরভাবে দোয়ার মাধ্যমে বলেন, 'আহমদী ধর্ম যদি সত্য হয় তবে আল্লাহ তুমি আমাকে সত্য রাস্তা দেখাও, আমি মিথ্যার সঙ্গে থাকতে চাইনা'। এ সময় হতে তাঁর আরবী পড়তে ইচ্ছা হতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে হেকিম সাহেববের কাছে গিয়ে বিভিন্ন দোয়া সুরা শিখার চেষ্টা করতে লাগলেন। আরবি পড়া তার জন্য ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু তিনি নিরাশ হননি। সারা রাত জেগে তাঁর প্রভু আল্লাহর কাছে নিজের ভাষায় দোয়া করতে লাগলেন। আল্লাহ যেন তাঁর জন্য আরবি শেখার কোন সহজ পথ বের করে দেন। যাতে তিনি সত্যি ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধে বুঝার এবং তা গ্রহণ করার সুযোগ পান।

এভাবে প্রায় এক বছর সময় পার হওয়ার পর বাবা কঠোর ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন। সেই সময় এক রাতে বাবা তাঁর রবের নিকট কাতরভাবে অনেক দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বাবা দোয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন "আব্দুল হেকিম সাহেব বাবার পাশে বসে তাকে সুরা ফাতেহা শিখাচ্ছেন"। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা দেখলেন সুরা ফাতেহা তিনি মুখস্ত বলতে পারেন। আল্লাহতালার অশেষ কৃপায় স্বপ্নের মাধ্যমেই তাঁর সুরা ফাতেহা শিখা হয়ে গেল। এটি ছিল একটি সত্য স্বপ্ন। সেই একই রাতেই দাদা স্বপ্নে দেখলেন, 'তিনি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন আর প্রস্রাবের ফেনার সাথে কুরআনের আয়াত ভেসে উঠছে, সমুদ্রের ঢেউ এসে আবার মিশিয়ে নিয়ে যাচ্ছে'। দাদা এই স্বপ্নটি যখন বাবাকে বললেন, তখন বাবা মনে করলেন দাদা এত নোংরা স্বপ্ন কেন দেখেছেন? নাকি এগুলি বানিয়ে বলছেন, ইসলাম ধর্মকে হেয় করার জন্য? দাদার স্বপ্ন নিয়ে বাবা একটু সন্দিহান হয়ে পড়লেন।

বাবা অনেক কষ্ট করে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্বপ্ন দু'টি মিয়া ভাই (সাঈদ আহমদ) ও মৌলানা এজাজ সাহেবকে বললেন, উনারা স্বপ্ন দু'টি শুনে বললেন, 'তোমার বাবার স্বপ্নটা খুবই ভাল স্বপ্ন'। স্বপ্নের তাবির করে তাঁরা বললেন, "তুমি তোমার বাবার ঔরসজাত সন্তান, আল্লাহর সাহায্যে ইসলামের জন্য তুমি বিলীন হয়ে যাবে, তোমার বাবা তোমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। আর তোমার স্বপ্নটি হলো আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নিদর্শন। তোমার জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। আরো বললেন, 'তুমি তোমার বাবার জীবদ্দশায় মুসলমান হবে', ইনশাআল্লাহ।"

বাবার ইসলাম ধর্মের প্রতি অতি আগ্রহ, আকর্ষণ ও ভালোবাসা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরুপ মনোভাব দেখে দাদা বাবাকে ঘরের বাইরে যাওয়া এবং আব্দুল হেকিম ও মৌলানা আব্দুল আজিজ সাহেবদের সাথে দেখা করা, কথা বলা কঠোরভাবে বন্ধ করে দিলেন। ঘরের মধ্যে অবহেলা, নির্যাতন, আত্মীয় স্বজনের বিরূপ ব্যবহার তাঁর মনকে অস্থির করে তুলল। সে সময় আমার ছোট ফুফু ছিলেন বিবাহ উপযুর্ক্ত। এ সময় যদি বাবা ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তাঁর ছোট বোনের বিবাহ হবেনা। এটা তাঁর জন্য বড় কষ্টের কারণ হবে। বাবা তাঁর ছোট বোনকে খুবই ভালোবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। বাবার ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং তিনি যে মুসলমান হয়ে যাবেন সে বিষয়ে ছোট বোন সব জানতেন। ছোট বোনের জন্য এবং তাঁর বিয়ের জন্য মনোকষ্টের বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর মনিব আল্লাহতালার নিকট দোয়া করতে লাগলেন। আল্লাহতালা যেন সহসা এবিষয়ে একটা মিমাংসা করে দেন। তাঁর দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। ফলে দ্রুত ছোট ফুফির বিবাহের সম্বন্ধ আসলো এবং সবদিক দিয়ে ঠিকঠাকভাবে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। বাবা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। এরপর বাবা ঠিক করলেন আর হিন্দু অবস্থায় থাকা যাবেনা। বাবার মুসরিম হয়ে যাবার সিদ্ধান্তের পর হতে প্রতিরাতে শুধু স্বপ্নে দেখতে লাগলেন। কেউ যেন ফজরের সময় তাঁকে ডেকে বলছে, 'উঠ নামাজ পড়'। স্বপ্নটা বার বার দেখায় বাবা বুঝতে পারলেন, এখন তাঁর জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হয়ে গেছ। বাড়ির কঠিন পাহাড়ায় সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ির বাঁশের পায়খানার ভিতর দিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত মৌলভী পাড়া আহমদী মসজিদে গিয়ে উঠলেন। মসজিদে তখন ছিলেন মৌলানা

আব্দুল আজীজ সাহেব, আব্দুল হেকিম সাহেব এবং জামা'তের প্রেসিডেন্ট এ্যাডভোকেট গোলাম সামদানী সাহেব। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি বাবার বয়াত নিলেন। তিনি বাবার নাম কাশিনাথ চক্রবর্তীর পরিবর্তে নুরুল ইসলাম রাখলেন। বয়আতের দিনটি ছিল ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বাংলা, ডিসেম্বর ১ তারিখ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ রোজ সোমবার। বয়আতের দু'দিন পর বাড়িতে খবর পৌঁছাল বাবা মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর পেয়ে দাদা থানার সাথে যোগাযোগ করে দারোগাবাবুকে সাথে নিয়ে মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে বাবাকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বললেন, 'আমি সারা জীবন কোমড় পানিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্য দেবতার পুজা করতে গিয়ে অর্ধেক অঙ্গ সাদা করে ফেলেছি। একি তাঁর পরিণাম'! বাবা বলেন, 'তুমি এভাবে ভগবানকে পুজো দিয়েছ বলেই আমি প্রকৃত ধর্ম কি তা বুঝতে পেরেছি এবং তা গ্রহণ করতে পেরেছি। এটি তোমার প্রার্থণার ফসল'। দাদার কান্নাকাটি ও অনুরোধে বাবা কোন অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে যেতে রাজী না হওয়ায় দারোগাবাবু বাবাকে থানায় নিয়ে গেলেন। থানায় জোর করে তাঁকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করালেন। অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ ছিল যে, 'যদি আব্দুল হেকিম ও আব্দুল আজিজ বাবার সঙ্গে দেখা করেন তবে তাদেরকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে অনাদায়ে ৬ মাসের জেল'। দু'দিন থানায় আটকিয়ে রেখে তাঁকে অনেক মারধর করে জোর করে দাদার হাতে তুলে দিলেন। পুনরায় আবারো বাড়ি নামক জেলখানায়। দাদা বাবাকে এক প্রকার বন্দি করে রাখলেন। বাবা এ বন্দিদশা হতে পালানোর সুযোগ খুজঁতে লাগলেন। একদিন সুযোগ বুঝে বাবা আবার পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবার পর দাদা থানায় গিয়ে মামলা করলেন, আহমদী গন্যমান্য ব্যক্তিদেরকে আসামী করে। আসামীরা হলেন (১) আব্দুল হেকিম (২) গনি মিয়া (জাহাঙ্গীরের দাদা) (৩)আহসাব আলী উকিল (৪) এ্যাডভোকেট গোলাম সামদানী (৫) মৌলানা আব্দুল আজিজ (ভাদুঘর) (৬) মিয়াচান্দ (৭) কফিল উদ্দীন মিয়া (৮) আব্দুল হাই (দৌলতের মার স্বামী) (৯) আব্দুল আলীম (১০) মালেক মাস্টার (১১) মাহবুবুর রহমান উকিল (গয়েব আহমদী) (১২) মধু মিয়া।

তিনি মামলার এজাহারে লিখলেন 'আমার ছেলের বয়স ১১ বছর। সে একজন নাবালক। বর্ণিত ব্যক্তিরা তাকে লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে ধর্মত্যাগ করিয়েছেন। ছেলে না বুঝে তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করেছে'। আহমদীদের বিভিন্ন জনের বাড়িতে চার দিন চার রাত লুকিয়ে থেকে এবং সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কষ্টে, অনেক পথ ঘুরে ঘুরে ঢাকা চলে গেলেন। ঢাকাতে দাদার একজন বন্ধু হিন্দু ডাক্তারের মাধ্যমে মুসলমান হওয়ায় সংবাদ গোপন করে সাবালক হওয়ার সনদ নিলেন। ডাক্তার লিখে দিলেন, 'এই ছেলের বয়স ১৯ এবং সে একজন সাবালক'। যা মহান মর্যদাশালী আল্লাহর এক সত্য নিদর্শন।

সাবালকের সনদ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসলেন। মসজিদে এসে খবর পেলেন, বাবাকে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেন্ট বের হয়েছে। সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিন-রাত তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মুরুব্বীদের দোয়া এবং পরামর্শ নিয়ে বাবা নিজেই আদালতে হাজির হলেন। আদালত তাঁকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন। জেলখানায় থাকা অবস্থায় রমজান মাস শুরু হয়, রমজান মাসে জেলখানায় রোজা রাখারও চেষ্টা করলেন তিনি। সে সময় ব্রিটিশদের রাজত্ব হওয়ায় হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের আধিপত্য বেশি, ফলে রোজা না রাখার জন্য জেলখানায় তাঁকে মারপিট করা হত। অনেক কষ্টে মনের জোড়ে ১০/১২ টি রোজা রাখলেন। রোজা রাখার কারণে জেলখানায় তাঁকে ভাত দেয়া বন্ধ করে দেয়া হল। ক্ষুধার যন্ত্রনা এবং কারারক্ষীদের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে দিন রাত কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে খোদা তুমি আমাকে সাহায্য করো, তুমি আমাকে রক্ষা করো। 'হে আল্লাহ! আমি তোমাকে যেভাবে ডেকেছি, সেভাবেই পেয়েছি। তুমি আমার সকল বিষয়ে শ্রবণকারি খোদা, তুমি আমার প্রতি দয়া দেখাও। আমার এই অবস্থা হতে আমাকে মুক্তির পথ দেখাও। আমার উপর যে কঠিন পরীক্ষা তা তুমি আমার জন্য সহজ করে দাও। কঠিন অত্যাচার ও যন্ত্রনার মাঝেও কোরআন শিখার জন্য এবং আরবি জানার জন্য তাঁর মন উতলা হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি আরবি জানেন না, কোরআনের কোন সুরাই তাঁর জানা নেই। তিনি গভীর আবেগ সহকারে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইলেন। 'হে দোয়া শুরুকারী খোদা, আমি চাই তুমি কোরআন শিখাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। আমি সহজেই তোমর বাণী কোরআন যেন পড়তে পারি'। আল্লাহ রহমানুর রহিম, বাবার দোয়া কবুল করলেন। সেই থেকে জেলখানাতে প্রতিদিন রাতে বাবা স্বপ্নে দেখেন স্বপ্নে একজন বুজুর্গ এসে বাবাকে কোরআন শিখাচ্ছেন। এইভাবে স্বপ্নের মধ্যেই সুরা নাস, সুরা এখলাস, সুরা কাউসার, সুরা কাফিরুন জেলখানাতেই মুখস্ত করে ফেললেন। দীর্ঘ ছয় মাস জেলখানায় থাকার পর জেলখানা পরিদর্শনে আসা মুসলিম এসপির সহযোগিতায় মুক্তির পথ কিছুটা সুগম হলো। পরবর্তীতে বাবার মামালার তারিখ যে দিন ছিল, সেদিন আদালতে আব্দুল হেকিম সাহেব বাবাকে বললেন, 'আমি আগের রাতে স্বপ্ন দেখেছি। "কেউ একজন আমাকে ডেকে বলছেন, 'হে আব্দুল হেকিম আপনি আপনার কবুতর লোহার পিঞ্জর হতে নিয়ে আসুন'।" বাবাকে হেকিম সাহেব অভয় দিয়ে বললেন কালু আল্লাহর অসীম দয়ায় তুমি আজ খালাস পেয়ে

যাবে। কাঠগড়ায় বাবাকে যখন তোলা হল, তখন একপাশে আহমদী জামা'তের সব বুজুর্গ ব্যক্তিরা অন্য পাশে বাবার পুরো ব্রাহ্মণ পরিবার। এ যেন এক প্রকার দুই পক্ষের রণভূমে অবস্থান। সে সময়কালে এ ঘটনা পুরো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আলোচিত ঘটনা হিসেবে সকলের মুখে মুখে ছিল। সেই মামলায় বাবা অলৌকিকভাবে বেকুসুর খালাস পেয়ে গেলেন। হেকিম সাহেবের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। দাদা আদরের ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করলেন। অনেক আদরের ছোট ছেলেকে ছেড়ে দিতে তাঁর মন মানছিলনা। তিনি বুকফাটা আর্তনাদ করে ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বাবা ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। দাদার গগণবিদারী কান্নার রোলে উপস্থিত সকলেরই চোখ অশ্রু সজল ছিল। সকল মায়া ভালোবাসা, সকলের চোখের জল পিছনে ফেলে বাবা আহমদীদেকে আপন করে নিয়ে পুরানো সব কিছু ত্যাগ করে তাঁদের সাথে চলে আসলেন। বাবার আত্মীয় স্বজনদেরকে বাদ দিয়ে ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবাদের ত্যাগের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আদালত বাবাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে রায় দিয়েছে।

পুত্রের আহমদী মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর অপমানে মনের দুঃখে কষ্টে এবং শোকে দাদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া বেশি দিন থাকেননি। তিনি সব জায়গা সম্পতি রেখে বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। দেশে শুধুমাত্র তাঁর একছেলে রয়ে গেলেন। বাবা মুসলমান হওয়ার পর দাদা ১৫ বছর জীবিত ছিলেন। বাবার জন্য যারা আসামী হয়েছিলেন তাঁরা বাবাকে আপন ছেলে, ভাই, সন্তান এর মতো গ্রহণ করে নিলেন। বাবা তাঁর ভাই, বোন, বাবা, অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও সকল সম্পত্তি ছেড়ে কপর্দকশূন্য অস্থায় আহমদী হয়েছিলেন। আহমদী হয়ে তিনি সকল আহমদীদেরকে ভাই, বোন, আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করে আপন করে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমরাও ছোটবেলায় কোন সময় ভাবতে পারিনি আহমদীরা আমাদের কোন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় নন। আহমদীরা ও সকলে আমাদেরকে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের চাইতে বেশি আপন করে নিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন। তারা কখনো আমাদেরকে কোন আপনজনের অভাব অনুভব করতে দেননি। আমি আমার সকল আহমদী ভাইবোনদের নিকট শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহতালা যেন তাঁদেরকে তাঁদের কাজের উত্তম পুরস্কার দেন'।

বাবার মুসলমান হওয়ার পর ১৩৩৯ বাংলা, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জলসায় মসীহ মাউদ (আঃ) এর সাহাবী আব্দুর রহমান নাইয়ার (রাঃ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জলসায় এসেছিলেন। জলসা শেষে আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব (লাল মিয়া) হুযূরের প্রতিনিধির সাথে বাবাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাবার আহমদী হওয়ার পুরো ঘটনা তাঁকে বলেন। তিনি খুশি হয়ে বাবাকে নাম জিজ্ঞেস করলে, বাবা বললেন, 'নুরুল ইসলাম'। তখন নাইয়ার সাহেব বললেন, 'আপনি আপনার নামের সাথে বংশের পরিচয় রাখবেন। তিনিই তাঁর নাম রাখলেন 'নুরুল ইসলাম চক্রবর্তী'। সে হতে বাবা নুরুল ইসলাম চক্রবর্তী বা ঠাকুর সাহেব হিসেবে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

মুসলমান হওয়ার দীর্ঘ সময় পর ১৯৪৮ সনে বাবা ময়মনসিংহ নিবাসী তালেব হোসেন মৌলনা সাহেবের ছোট ভাই ইমাম হোসেন সাহেবের ৩য় মেয়ে রাবেয়া খাতুনকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে আমার নানা এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা আহমদী বিরোধী মুখালেফতের কারণে ময়মনসিংহ থেকে হিজরত করে পঞ্চগড়ের আহমদ নগরে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে আহমদ নগর মসজিদের পাশে এবং সম্প্রতি ক্রয়কৃত বিশাল জায়গার চারিপাশেই আমার নানার আত্মীয় স্বজনদের বসবাস।

এতক্ষণ আমি নিজের ভাষায় যা বর্ণনা করেছি তা ছিল বাবার ইসলাম তথা আহমদীয়াত গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। তিনি ৮২ বছর বয়স পেয়েছিলেন। বাবার জীবন সায়াহ্নের কয়েকটা সত্য স্বপ্নের কথা আমি এখানে তুলে ধরছি। আমার বাবা খুবই তাহাজ্জুদ গুজার মানুষ ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহজ্জুদ বাদ দেননি।

মৃত্যুর ৭ দিন আগে বাবা একটি স্বপ্নে দেখেন, "তাঁর বাড়িতে মৌলনা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, মৌলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, মৌলানা এজাজ সাহেব, আব্দুল হেকিম সাহেব, আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব, সাদা পোশাক ও পাগড়ী পড়ে সকলে একসাথে বাবাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা বাবার নাম নিয়ে বলছেন, 'ঠাকুর সাহেব আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন'। স্বপ্নে বাবাও খুশী মনে তাঁদের সাথে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করলেন এবং বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমার কাপড়গুলি ইস্ত্রি করা নেই। আমাকে একটু সময় দিন কাপড়গুলি ইস্ত্রি করে নেই। তখন তাঁরা বললেন, ঠিক আছে আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমরা আবার আসব, জরুরী কাজ ফেলে এসেছি; এখন আমরা যাই। একথা বলে তারা চলে যান'। বাবাকে আল্লাহতালা যেন প্রভুর সান্নিধ্যে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় দিলেন। বাবা আমাদের ডেকে বললেন, "শুন আমি আল্লাহর কাছ হতে সামান্য কিছু সময় ছেয়ে নিয়েছি। তোমরা আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নও। আমার যাবার সময় হয়েছে। এ স্বপ্ন দেখার ৭ দিন পরই বাবা আমাদেরকে ছেড়ে তাঁর প্রিয় হাবিবের নিকট চিরস্থায়ী ঠিকানায় চলে গেলেন।

মৃত্যুর ২ দিন আগে বাবা আরেকটি স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন, 'আমি দেখলাম, "আমি মারা গেলে আমাকে গোসল করিয়ে কাফন পড়িয়ে খাটিয়ায় রেখে সবাই অপেক্ষা করছেন'। আমার বড় জামাই আর এক নাতি বাড়িতে নেই, তারা বাড়ি আসলে আমাকে জানাযা পড়িয়ে কবর দিবে"।

বাবার মৃত্যুর দিন হুবহু বাস্তবে এই ঘটনায় ঘটেছিল। আমার বাবার বড় জামাই ফারুখ সাহেব ও তাঁর দ্বিতীয় ছেলে রিয়াজ আহমদ সুমন আখাউড়ার এক গ্রামে জমির ধান আনতে গিয়েছিল, তাঁরা চলে যাবার ১ ঘন্টা পরেই বাবা মারা যান, তাঁদেরকে খবর দিয়ে অপেক্ষা করে বিকেল ৫ টার সময় আসরের নামাজের পর জানাজা পড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের নতুন কবরস্থান তিতাস নদীর পাড়ে বাবাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'লা আমার বাবাকে বেহেশ্‌ত নসীব করুন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে যেন তাঁকে তাঁর কর্মের উত্তম পুরস্কার দান করেন।

বাবার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। আমার আগে অনেক ভাই বোন মারা যাবার পর আমার জন্ম। আমার বড় বোনের চেয়ে তের বছরের ছোট আমি। ফলে বাবার খুবই আদর ও স্নেহে আমার বেড়ে উঠা।

আমি ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেলাইয়ের কাজ করতাম। এতে করে বেশ টাকা পয়সা উপার্জন হতো। তাই এক সময় চিন্তা করলাম আমারতো এত টাকার প্রয়োজন নেই, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বাবা-মার জামা'তের চাঁদাটা আমি পরিশোধ করব। সিদ্ধান্তনুযায়ী আমার বাবা এবং মায়ের চাঁদা আমিই আমার সেলাইয়ের আয় হতে নিয়মিতভাবে দিতাম। একদিন আমাকে বাবা ডেকে বললেন, "মা তুমি যে তোমার সেলাই হতে আয় করে যে টাকা পাও তাথেকে আমাদের চাঁদা পরিশোধ করছ, মনে করোনা এটা নষ্ট হচ্ছে, তোমার সব টাকা তুমি আল্লাহর ব্যাংকে জমা রাখছ। একদিন আল্লাহ চাইলে তুমি সুদে আসলে আল্লাহর কাছ হতে ফেরত পাবা"। সত্যিই আমি আমার বাবার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখেছি। আমাদের দুই বোনকে সব সময় বাবা বলতেন, 'মা তোমাদের জন্য তো আমি কোন জায়গা জমি রেখে যাচ্ছি না। আমি আল্লাহ্‌তালার কাছে অনেক দোয়া করছি আল্লাহ্‌ যেন তোমাদেরকে অনেক সম্পদ দান করেন। তোমরাও আল্লাহর কাছে চাও'। সত্যি আশ্চর্য্যজনকভাবে এবং আল্লাহর খাস রহমতে আমরা দু'বোন আর ভাই সকলেই খুব ভাল আছি। আল্লাহর নিকট হাজারো শুকরিয়া, আমার বাবার দোয়ার বরকতে সাতরাজার ধন আহমদীয়াতের পাশাপাশি দুনীয়াবি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের কারো কোন অভাব এবং সাধ অপুরণ রাখেনি। আমার বাবা কর্পদকহীন ছিলেন কিন্তু তাঁর সন্তান এবং বংশধরেরা আল্লাহর রহমতে অনেক সহায় সম্পদের মালিক। সুরা আর রহমানের ভাষায় বলতে হয়, "আল্লাহর কোন দানটি তোমরা অস্বীকার করবে"। আজ আমরা অর্জন করেছি তা আমার বাবার কোরবানির ও দোয়ার ফসল।

আল্লাহতালা আমাদের বাবার আওলাদ ছেলে মেয়ে ও নাতি-নাত্নী সবাই যেন তাঁর কুরবানী স্মরণ রেখে আহমদীয়াতের সঠিক শিক্ষা উপলব্ধি করে প্রকৃত আহমদী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে এবং সে সৌভাগ্য যেন দান করেন। আমার বাবা আহমদী হওয়ার পর থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদ, কোরআন তেলওয়াত মূহর্তের জন্যই বাদ দেন নাই। নিয়মিত দোয়ার রত থেকেছেন। তিনি খুবই শান্ত মেজাজী ছিলেন, জীবনে কারো সঙ্গে ঝগড়া বা রাগারাগি করেননি। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন সহায় সম্পদ ছেড়ে আহমদীয়াতকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে জামা'তের প্রতিটি মানুষকে তিনি আত্মীয় মনে করে তাঁদের মেহমানদারী করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। শত অর্থ কষ্টের মাঝেও তিনি মেহমানদারী করে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করে আনন্দ পেতেন। এতেই তিনি সুখ অনুভব করতেন। শেষ বয়সে বাবার কোন আয় ছিলনা। তাঁর কোন জায়গা জমি ছিলনা। ধর্মের জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করে এসেছিলেন। আমার ভাই শহীদুল ইসলাম বাবুল যখন হতে আয় উপার্জন শুরু করেন তখন হতেই বাবার সাধ আহ্লাদ ইচ্ছেকে অপুরণ রাখেননি। তিনি বাবার সকল ইচ্ছেকে পুরণ করার চেষ্টা করতেন। বাবাকে খুশি রাখার জন্য সামান্য এক খন্ড জমি কিনেছিলেন, তাও বাবার নামে। যাতে তাঁর বাবার মনটা খুশি থাকে। বাবা আমার ভাইয়ের উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর জন্য অনেক দোয়া করেছেন। আল্লাহতালা যেন আমার ভাইকে তার কাজের উত্তম পুরস্কার দান করেন।

আজ জীবনের মধ্য পর্যায়ে এসে আমার বাবার আহমদীয়াত গ্রহণ এবং তাঁর দোয়া কবুলিয়তের ঘটনা যখন স্মরণ করি তখন নিজের অজান্তেই আল্লাহতালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে পড়ি। আজকে আমাদের যা কিছু প্রাপ্তি এবং যা কিছু অর্জন সকলি আমার বাবার দোয়ার কল্যাণে। আমরা এবং আমাদের ছেলে মেয়েরাও যেন এ দোয়ার অংশীদার হতে পারে। আমরা সকলে যেন আমার বাবার দেখানো পথে চলে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আমি এবং আমার সন্তানেরা যেন বাবার কষ্টে পাওয়া নিয়ামত আহমদীয়াতকে জীবনে ধারণ করে রাখতে পারে। জীবনের সকল কঠিন পরীক্ষাকে ধৈর্য্যর সাথে যেন মোকাবেলা করতে পারি আল্লাহতালা যেন আমাদেরকে সে শক্তি, সাহস ও ধৈর্য্য দান করেন। আমিন।

স্মৃতিপটে লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

সাবরিনা জাহান সিনথিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

সময়টা ছিল ২০০৪/২০০৫-২০০৭ এর মধ্যকার সময়ের। আমি তখন লাজনা ইমাইল্লাহ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম-এর জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রওশন আরা আহমদ সাহেবা। উনার নেতৃত্বে আমাদের লাজনা ইমাইল্লাহ্র সাংগঠনিক কাঠামো অনেক মজবুত ছিলো। তখন আমাদের সাধারণ সভা থেকে শুরু করে, আমেলা সভা, মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন ও পরিচালনা, বার্ষিক জলসা সালানা পরিচালনা (লাজনাদের), তালিমী ক্লাস ইত্যাদি অনেক কিছুই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়োজন করতাম, পালন করতাম।

আমার মনে পড়ে জামা'তের যেকোনো কাজে যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের সকল সদস্যাদের অংশগ্রহণ করতে বলা হতো তখন সবাই সর্বাত্মক চেষ্টা করতো অংশগ্রহণ করার। আমরা আমেলা সদস্যারা যে যেভাবে পারি, যতটুকু পারি চেষ্টা করতাম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার। আমাদের চট্টগ্রাম আনজুমানে লাজনাদের অংশে বিশেষ করে উপরের তলায় কোনো শৌচাগার ছিলোনা। যার কারণে লাজনাদের বিশেষ করে বয়স্ক লাজনাদের অনেক সমস্যা হতো। তখন আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবার নেতৃত্বে চাঁদা তুলে লাজনাদের শৌচাগারের বানানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। মনে পড়ে প্রায়ই সাধারণ সভা, আমেলা সভা শেষ করে বাড়িতে ফিরতে দেরী হয়ে যেতো। কিন্তু তবুও কোথা থেকে সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে আমরা লাজনারা কাজ করতাম সেটা ভাবলে এখনো শিহরিত হই।

তখন এখনকার মতো স্মার্ট ফোন ছিলোনা, উবার-পাঠাও-এর পরিবহনের ব্যবস্থা ছিলো না, গৃহিণীর নিজস্ব কোনো অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থাও ছিলোনা তবুও আমাদের লাজনাদের জামা'তের কোনো কাজে আগ্রহের কমতি ছিলোনা। কখনো কখনো সমস্যা বা বাঁধা যে আসতো না তা নয়, তবুও সবার সাহস, আগ্রহ, মনের জোর আর সর্বোপরি আল্লাহর রহমতে সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে হয়ে যেতো। এমন অনেক স্মৃতিই আছে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্কে নিয়ে যেসব মনে পড়লে এখনো ভালো লাগে। চট্টগ্রাম লাজনা ইমাল্লাহ্র সুবর্ণ জয়ন্তীতে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং দোয়া। নতুন প্রজন্ম যেনো আরো ভালোভাবে, সফলভাবে জামা'তকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই দোয়া করি।

অন্তিম যাত্রা

রওশান আরা আহমদ (সূচী)

লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনের শতবর্ষ পূর্তির আনন্দে যখন আমরা মাতোয়ারা ঠিক তখনই লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম উদযাপন করছে তাঁদের ৫০তম সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমা। মহান আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া জানাই এই সুবর্ণ সময়ের সাথে থাকবার সৌভাগ্য দানের জন্য। ৫০তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মত একটি স্মরণিকা প্রকাশের সাহসী ইচ্ছা প্রকাশ করেছে লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম।

সম্পাদিকা সাহেবা সংগঠনের বোনদের উৎসাহিত করলেন লেখা জমা দেওয়ার জন্য। লক্ষ্য করলাম, অসম্ভব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বোনেরা লেখা জমা দিচ্ছেন। সম্পাদিকার ফাইল-এর আকার মোটা হয়ে উঠছে। হবেইবা না কেন? এ যে আমাদের প্রাণের চট্টগ্রাম। কতশত মধুর স্মৃতি আমাদের মনের গভীরে। কি আবেগ, ভালোবাসা প্রত্যেকের ভেতরে। জামা'তের সবগুলো পরিবার মিলে আমরা আজ এক পরিবারের পরিণত হয়েছি। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি, রাগ-অনুরাগ সবই আমরা ভাগাভাগি করে নিতে শিখেছি, আলহামদুলিল্লাহ্‌। ১৯৯৪ সাল থেকে চট্টগ্রামে আছি। অচেনা পরিবেশে এসেও মানুষকে ভালোবাসতে ও ভালোবাসা পেতে আমার খুব বেশি সময় দরকার হয় নাই। আমার বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমার এই জামা'তের প্রতিটি সদস্যকে।

ফিরে আসি আবারো স্মরণিকার লেখার কথায়। সবার লেখা জমা দেওয়া দেখে লোভ হলো কিছু লিখি। কিন্তু আমাকে দিয়ে যে লেখা হয় না! পারলাম না লিখতে।

যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের অন্তিম বিদায়কে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করে সামান্য স্মৃতিচারণ করছি। কোন লাজনা সদস্যা ইন্তেকাল করলে দেখতাম লাশ ধোয়ানোর মত কঠিন কাজ করতে আমাতুল মজীদ (ছুটি খালা), আমাতুর রশীদ (রশু খালা) ছুটে আসতেন। সবুজ চাদরে ঘেরা জায়গায় লাশ ধোয়ানো হয়। আমার মত দুর্বল লাজনা সদস্যা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মনে মনে ভয়ে কুঁকড়ে থাকতাম। ভাবতাম খালাদের কি সাহস। সময়ের পরিক্রমায় রশু খালা চট্টগ্রামের বাইরে চলে গেলেন আর ছুটি খালা বয়সের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। পরবর্তীতে হালিশহর থেকে ছুটে আসতেন আমাতুল নাজিম কুদশিয়া সাহেবা। দূরত্বের কারণে তাঁর একা আসা যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। লাশ ধোয়ানোর জন্য লাজনা সদস্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিলো। তৎকালীন আমীর মরহুম মাহমুদুল হাসান সিরাজী সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "আপনারা নিজেরাই এই কাজ শিখে নেন"। আমীর সাহেবের আনুগত্য করতে হবে। সাহস করে ঢুকে গেলাম সবুজ চাদরে ঘেরা ঐ জায়গাটুকুতে। আমি একা নই, পেয়ে গেলাম নাঈমা বুশরা, নিলুফার মমতাজ, নাসরীন সুলতানা নিপা, মুশাররাত আফরীন মুক্তা, ফেরদৌস আক্তার রেনু, মাহমুদা পাপিয়া, নুসরাত জাহান, সানিয়া সুলতানা, মোবাশ্বেরা আঁখি সাহেবাদের। সম্মানিত মরহুম আমীর সাহেবের উৎসাহে আল্লাহ্‌র রহমতে মৃতের গোসল ও পাঁচপ্রস্থ কাফন পরানোতে কেউ আমরা পিছিয়ে নেই। আমাদের এই সেবা আল্লাহ্‌ গ্রহণ করুন। মরহুম আমীর সাহেবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তার উপদেশের জন্য। কাফনে সাজিয়েছি কতো কতো প্রিয় মানুষগুলোকে। দোয়া করি তারা জান্নাতবাসী হউন। অপেক্ষার প্রহর গুনছি এই অন্তিম যাত্রার জন্য।

"কুল্লু নাফসিন যা' ইকাতুল মাওত। ওয়া নাবলু কুম বিশশাররি ওয়াল খায়রি ফিতনাহ; ওয়া ইলাইনা তুরযা'উন" [সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত ৩৬]

অর্থ: প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভালো অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব।

স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম

লেখিকা: **মাহমুদা হেলাল**

আমরা চট্টগ্রাম এসেছি ২০১৪ সালে। আমি যখন প্রথম চট্টগ্রাম জামা'ত বায়তুল বাসেত, চকবাজার মসজিদে আসলাম সত্যি কথা বলতে কি আমার খুব ভয় ভয় লাগছিল। নতুন মানুষ নতুন জামা'ত। আমি কার সাথে মিশবো কীভাবে মিশবো এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে আমার মনে। ক্ষণিকের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম জামা'ত আমার না আমাদের জামা'ত। আমরা সবাই এক। আমরা মাহদীর তরীতে উঠেছি সবাই একসাথে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, ঘাটুরা বলতে কোনো কিছু নেই। আমরা সবাই এক ইমাম কে মানি, এক জাতি, একটা নির্দিষ্ট গন্ডিতে আমরা আছি। একই তরীর যাত্রী আমরা। যখন এই কথাগুলো আমার মনে পড়লো তখন আমার মনে আর কোন ভয় থাকলো না। সবার সাথে মিশলাম কথা বললাম। খুবই আন্তরিকতার সাথে সবাই আমাকে আপন করে নিল। চট্টগ্রাম হালিশহর হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই মিলেমিশে দায়িত্ব পালন করলাম। ভালোই লাগলো, তারপর লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম এর ইশায়াত সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম যখন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তখন বুলেটিনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। দায়িত্ব নেওয়ার এক বছরের মধ্যে আল্লাহ তা'লার ফযলে সদস্য সংখ্যা হয় ৫৬ জন। আল্লাহর অশেষ কৃপায় কাজ ভালোই চলছিল। হঠাৎ মহামারী করোনা দেখা দেওয়ায় থমকে যাওয়া জীবনের সাথে জামা'তের কাজটাও অনেকটা থমকে গিয়েছিল। এখন আবার কাজ চলছে, চলবে, ইনশাল্লাহ তা'লা।

আমি মনে করি, আমরা যখন জামা'তের কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখি তখন আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে রহমতের চাদর দিয়ে আবৃত রাখেন। নূরের আলো দিয়ে আমাদেরকে আলোকিত করে রাখেন। এই কাজের মাধ্যমে আমাদের আত্মা পবিত্র হয়।

আমার লিখার কোন অভিজ্ঞতা কখনোই ছিল না। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে অল্প কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম।

লেখিকা: সৈয়দা রাবেয়া সুলতানা (মৌরী), বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য

মহান আল্লাহ তা'লার রহমতে আমি চট্টগ্রাম মজলিসের একজন আমেলার সদস্য হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাই। গভীর শ্রদ্ধাভরে আমি এখনও সেই সময়টা স্মরণ করি। আমার মা এবং আমাদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রওশন আরা আহমদ সূচী আপা উভয়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সবসময় তাদের কাছ থেকে উৎসাহ ও নির্দেশনা পেয়েছি। বর্তমানে আমি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম শহরে বসবাস করছি। আল্লাহ তা'লা আমাকে এখানেও একজন আমেলার সদস্য হিসেবে স্থানীয় মজলিসে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।

আমরা সবাই জানি যে, একজন নিষ্ঠাবান আহমদী হবার শর্ত হচ্ছে যে জামা'তের সাথে নিবীড় সম্পর্ক রাখা যা আমরা আমাদের বয়আতে ওয়াদা করে থাকি।

আপনারা আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আমরা যাতে সর্বদা নিষ্ঠার সাথে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারি।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এই কঠিন সময়ে সুস্থ ও ভালো রাখুন।

লেখিকা: জাকিয়া খাতুন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের ৫০তম বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ এই আনন্দ ও গৌরবময় মুহূর্তে লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের সদস্য হিসেবে আমি স্মৃতিচারণ করছি। চাকরিসূত্রে দুই মেয়ে নিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে আমার চট্টগ্রামে আসা। কিন্তু আগের কর্মস্থল থেকে চাঁদার ক্লিয়ারেন্স পেতে দেরি হয়েছিল অনেক। একারণে এখানকার সদস্য হতে দেরী হয়ে গিয়েছিল আমাদের। মসজিদে যেতাম, তবে সদস্য না হওয়ায় সেভাবে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করতে পারছিলাম না। প্রেসিডেন্ট সাহেবা (সূচি আন্টি) বললেন এখানে বাজেট করে ফেলতে। উনার মাতৃসুলভ আচরণে আমার খুশির অন্ত ছিল না। আমি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেলাম আর বাজেটও করে ফেললাম। এরপর সব প্রোগ্রামে আমি আর আমার মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করলাম। বাধ সাধল করোনা।

কিন্তু চট্টগ্রামের লাজনা সংগঠন পিছিয়ে থাকার নয়। অনলাইনে জুম অ্যাপে নাসেরাতদের তরবিয়্যতী ক্লাসের মাধ্যমে শুরু। ফিজা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের যুক্ত করে নিল। এরপর করোনাকে হার মানিয়ে ঈদ পুনর্মিলনী থেকে শুরু করে মাসিক সভা সবই অনলাইনে হতে থাকল। আর তালীম বিভাগের উদ্যোগে সেহলা সুরাইয়া মুন্নী আপার শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষার ক্লাস "শেখাতে শেখাতে শিখি" আমার জন্য রহমতস্বরূপ বলে মনে হলো। আমি সবসময় চিন্তা করতাম আমি কুরআন পড়তে জানলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারি না, আর বদলির চাকরির কারণে মেয়েকেও কারো কাছে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করতে পারিনি।

এই ক্লাসের কারণে ঘরে বসেই কুরআনের বেশিরভাগ নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করে ফেললাম, বোনাস হিসেবে পেলাম সবার সাথে সুসম্পর্ক। আমার বড় মেয়ে নিয়মিত সব ক্লাসে ও বিভিন্ন তালীম-তরবিয়্যতী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সেবছর (২০১৯-২০২০) শ্রেষ্ঠ নাসেরাত হতে পেরে খুব উৎসাহিত হয়েছিল। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাকে "সেহেতে জিসমানী" বিভাগে কাজ করার তৌফিক দান করলেন। সবার আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি সবসময়। আমি চেষ্টা করেছি তবে আরও অনেক কিছু করা সম্ভব ছিল। এরপর চট্টগ্রাম আমেলার সাথে পরামর্শক্রমে শতবার্ষিকীর কুরআন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম থেকে আমার নামও পাঠানো হল, যা ছিল আমার জন্য নিয়ামত। এর জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট সাহেবার কাছে। আমি যা পেয়েছি তার কোন প্রতিদানই দিতে পারিনি।

অভিভাবক হিসেবে আমার দুই ফুফুর সাথে পেয়েছি সূচি আন্টি, নিলু আন্টি, রিনা আন্টি, তাহেরা (দিবা) আন্টি, কাজল আন্টি, জাহানারা আন্টি, রানু আন্টি, মুন্নী আপা, খুশি আপু, জুলিয়া মামী আরো অনেককে। আর ফিজা, তুবা, এপি, রাফা (আরও অনেকের) কথা না বললেই নয়। জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ এই অভিভাবক আর বোনগুলো আছে বলেই লাজনা সংগঠনটি আজ অত্যন্ত সফলভাবে বার্ষিক ইজতেমার ৫০তম পূর্তি উদযাপন করতে পারছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমি ঢাকায় বসে সবাইকে খুব মিস করছি। কারণ আমার বদলি হয়েছে ঢাকায়। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার দোয়া থাকবে সবসময় আল্লাহ তা'লা যেন লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন। আমিন। পরিশেষে সবার দোয়া কামনা করছি।

লেখিকা: সিলিমা সুবহা, কানাডা

চট্টগ্রাম জামা'ত ছেড়েছি ছয় বছর আগে। তবুও জামা'তে কাটানো স্মৃতিগুলো এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। সব স্মৃতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি যদি বলি তাহলে বলবো আমেলায় কাজ করার মুহূর্তগুলো। প্রতি শুক্রবার অফিস রুমে সবার সাথে মিলে কাজ করা, কাজের ফাঁকে একটু গল্প করা, মিটিং শেষে সবাই মিলে চা এবং সিঙ্গারা খাওয়া খুব মিস করি। এই জামা'তে আমার বেড়ে ওঠা। নাসেরাত থাকাকালীন কতই না মজা করেছি।

ইজতেমার আগের দিন কত রাত জেগে কুরআন তিলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্র্যাকটিস করেছি। বিশেষ করে এম.টি.এ প্রোগ্রামের আগে রিহারসাল সেশনগুলো এবং এম.টি.এর প্রোগ্রামের দিনগুলো অদ্ভুত মজাদার ছিল। এই জামা'তের মুরুব্বীদের কাছ থেকে অনেক কাজ শিখেছি আমেলায় থাকাকালীন। আমি মনে করি এই সকল মূল্যবান শিক্ষাগুলো সারা জীবনের মূল্যবান সম্পদ। যদিও আমি এখন বাংলাদেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি, তবুও বলবো চট্টগ্রাম জামা'তে কাটানো মুহূর্তগুলো আমার এখনও মনে পড়ে এবং এই স্মৃতিগুলো আমার জীবনের একটি মূল্যবান অংশ হয়ে থাকবে।

লেখিকা: বুশরা মজিদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আ'লা রাসূলিহীল কারীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহু। আজ এই ৫০তম ইজতেমার শুভলগ্নে মোহতরমা প্রেসিডেন্ট সাহেবার নির্দেশক্রমে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে জামা'তের জন্য সামান্য সেবার এবং লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের আমেলায় কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু লিখছি। প্রথমেই আমি খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে তিনি আমার মত এই অধম বান্দাকে তাঁর জামা'তের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর আমেলায় সরাসরিভাবে নিয়োগ হই ২০১১ সালে। এর আগে আমি নাসেরাত থাকা অবস্থায় নাসেরাতের আমেলায় তালিম সেক্রেটারী ছিলাম।

এছাড়া মসজিদ কমপ্লেক্সে ছোট থেকে থাকার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ক্লাস, মিটিং, ওয়াকারে আমল, জলসা, ইজতেমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। নাসেরাতের সেক্রেটারী তালিম থাকাকালীন নাসেরাতদের তালিমী সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনা, মাসিক সভা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতাম।

তারপর ২০১১ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর আমেলায় সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হই। তখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মিসেস রওশন আরা আহমদ সাহেবাকে পাই। ছোট সদস্যা হিসেবে তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আর কাজ বুঝিয়ে দিতেন। তাকে বেশিদিন পাইনি। তারপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিসেস নাঈমা বুশরা সাহেবা। নাঈমা আপার সাথেই আমার কাজের অভিজ্ঞতা বেশি। তখন জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন মিসেস খালেদা দাউদ সিমি সাহেবা। তারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং অনেক কাজের ক্ষেত্রেই দেখা যেত আমার মত এত ক্ষুদ্র মানুষের সাথে পরামর্শ করতেন ও আমার মতামত জানতে চাইতেন। তাদের এই ভালোবাসা আমি কখনও ভুলব না।

এছাড়া আমেলার সব সদস্যরাই খুব সাহায্য করতেন ও তাদের দরকারে আমার সাহায্য নিতেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত সময় থেকে সময় বের করে প্রত্যেকেই মসজিদে সময় দিতেন ও লাজনা সংগঠনের উন্নয়নের জন্য সর্বদা কাজ করতেন। তারপর যখন আমরা কেন্দ্রীয় ইজতেমার উদ্দেশ্যে একসাথে ঢাকায় যেতাম তখনও খুব মজা করতাম আমরা বাসে বা ট্রেনে। তারপর আমরা ইজতেমার প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম। কেন্দ্রীয় ইজতেমাগুলোতে আমাদের জামা'ত অনেক পুরস্কারও পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আসলে আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের যে পটভূমি বিশেষ করে আমেলার সংগঠন এখানে আমরা যারা কাজ করেছি বা করছি এ জায়গাটা আমাদের একটা পরিবারের মত। এখানে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। এখানে আমরা সকলেই আন্তরিক ও প্রফুল্ল চিত্তে কাজ করে থাকি। একে অপরের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এগিয়ে আসি। আর আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের জান, মাল, ওয়াক্ত ও আওলাদ কে আমরা জামা'তের কাজের জন্য উৎসর্গ করি।

তাই আমার আহ্বান, আমরা যারা আমেলায় কাজ করছি কিংবা শুধু আমেলাতেই নয় যারা সাধারণ সদস্যা আছি তারা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে জামা'তের সেবায় যেন এগিয়ে আসি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

লেখিকা: নাঈমা বুশরা

আমার আব্বার চাকুরীর সুবাদে ১৯৮৮ সালে আমার চট্টগ্রামে আসা। এরপর চট্টগ্রামেই আমার বিয়ে হয়। তখন থেকেই চট্টগ্রাম জামা'তের সাথে আমার যাত্রা শুরু। আমি ঢাকা জামা'তেও লাজনার মাল বিভাগে কাজ করেছি। চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহর সাথে সেক্রেটারী নাসেরাত দিয়ে আমার কাজ শুরু। এরপর সেক্রেটারী তাজনীদ, খেদমতে খালক, তরবিয়্যত, জেনারেল সেক্রেটারী, ২০১৩-২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এবং সবশেষে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলা সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ সম্পর্কে লিখতে গেলে এই সামান্য লেখায় শেষ হবেনা। হালকাগুলোতে যখন যেতাম তখন সেই স্মৃতিগুলো এত বেশি ভালোবাসা পূর্ণ ও প্রাণবন্ত ছিলো আমি বোঝাতে পারবোনা। একই ভাবে তবলীগি সেমিনার, সীরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারগুলোতে যখন যেতাম সেখানকার বোনদের আন্তরিকতা ও আনুগত্য এত বেশী ছিলো তা কখনোই ভুলার নয়। সকলের জন্য আমি সর্বদা দোয়া করি, শূরার প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকায় যাওয়ার স্মৃতির কথা খুব বেশি মনে পড়ে।

বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন মনোরম জায়গায় যাওয়ার সময়গুলোতে লাজনা বোনদের সহযোগীতার কথা তারা যে তাদের সময়, মাল কুরবানী করেছে সেটা যে আহাদনামার-ই শর্ত পূরণ করেছে তারই প্রমাণ ।

টিম গঠন করে আমরা হালকা পর্যায়ে প্রবীণ মুরুব্বীদের দেখতে যেতাম; উনাদের সেকি আনন্দ হত আমার মনে আজও দাগ কেটে আছে। যেকোন সময়ে বা কাজে যখনই আমার প্রাণপ্রিয় বোনদের, নাসেরাতদের ডেকেছি তখনই উনারা লাব্বাইক বলে ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এগুলো সম্ভব হয়েছে একমাত্র খেলাফতের আনুগত্যের কারণে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বদা আমাদেরকে খেলাফতের কল্যানের চাদরে আবৃত করে রাখেন, আমীন, সুম্মা আমীন।

লেখিকা: মাকসুদা মজিদ, পঞ্চগড়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি আহমদনগর নিবাসী মাকসুদা মজিদ। আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামে। আমার পিতা জনাব আব্দুল মজিদ (কেয়ারটেকার, আ.মু.জা, চট্টগ্রাম), মাতা জনাবা রেনু বেগম। আমার মনে আছে আমি যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তখন থেকেই আমি জামা'তে নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের চাঁদার কাজ করি সহকারী হিসাবে। এরপর লাজনার সহকারী মাল, সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আমাদের সব সেক্রেটারীদের সব কাজে পারদর্শিতা ছিলো। সবাই সবার কাজ করেছে, সবাই সবাইকে সহযোগিতা করতো। কখনো মনে হয়নি না পারলে কীভাবে করবো।

সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনো পুলকিত হই, আমরা যে কী আনন্দ করে কাজ করেছি তা বলে বুঝাতে পারবো না। জামা'তের কাজ ছেড়ে বাসাতে যেতে মন চায়নি।

অনেক প্রেসিডেন্ট সাহেবার সাথে কাজ করেছি যেমন মোহতরমা ইশরাত জাহান, মোহতরমা মোক্তার বানু, মোহতরমা তাহেরা মির্যা, মোহতরমা দিপা (টেরীবাজার), মোহতরমা নাসেরা বেগম ও মোহতরমা রওশন আরা আহমদ সাহেবা। এনারা প্রত্যেকে এতটা কেয়ারফুল ও স্নেহশীল যে তাদের কথা স্মরণ করলেই শ্রদ্ধায় ভালোবাসাতে চোখে পানি চলে আসে।

আমার মনে হয় এতো মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে কোন জামা'তে কাজ শিখায়না আর প্রত্যেকটা কর্মীকে এতোটা সম্মান কোথাও করেনা। ছোট বড় প্রত্যেক কর্মীকে সমান চোখে দেখা এবং সবার মধ্যে যে একটা বন্ধন সেটা দেখার মতোই ছিল। আমি বেশি বেশি যদি বলে থাকি আমার মনে হয় তাও কম বলা হবে।

আমি গর্বিত চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্য হতে পেরে, জামা'তের একজন সেবক হিসেবে কাজ শিখতে ও করতে পেরে। আমার জন্য সবাই খাসভাবে দোয়া করবেন আল্লাহ তা'লা যেন আবার আমাকে সঠিকভাবে জামা'তের খেদমত করার তৌফিক দান করেন।

আমার স্নেহময়ী শাশুড়ি মায়ের স্মৃতিচারণ

ফারাহ রহীম রাণী, যুক্তরাষ্ট

আমার স্নেহময়ী শাশুড়ি 'মা' মিসেস রাবেয়া রহিম, তাঁর পিতার নাম হাজী আব্দুস সাত্তার মেমন এবং স্বামী আব্দুর রহিম ইউনুস সাহেব। এ পূণ্যবতী মহিলা পিতার সাথে ১৯৩৪ সালে বয়াত করে জামা'তভুক্ত হন। ভারত বিভক্তির পর স্বামীর সাথে ভারত থেকে চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং বসতী স্থাপন করেন। মিসেস রাবেয়া রহিম ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দীর্ঘ ৭ বছর তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। লাজনাদের মিটিং করার সুবিধার্থে চাঁদা সংগ্রহ করা, আলাদা রুম ও বাথরুম বানানোর জন্য উদ্যোগ নেন এবং এতে তিনি সফলও হন।

উনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। উনি সেলাইয়ে অনেক ভীষণ দক্ষ ছিলেন। উনি উর্দু, আরবী এবং ইংরেজী ভাষাও জানতেন। উনার দায়িত্বকালে নোমায়েশ এ চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ ১ম স্থান অধিকার করে এবং একটি বড় ফুলদানী পুরষ্কার হিসেবে পায়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উনি আমাকে এবং আমার বড় বোনকে উর্দু, আরবী ভাষা এবং সেলাই শেখাতেন; সেই জন্য উনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। আমি এবং আমার বোন প্রায় ৯ মাস উনার কাছে আরবী, উর্দু এবং সেলাই-এর তালীম নেই। উনি কত বড় উদার মনের মানুষ হলে এ কাজটি করতে পারেন। উনি ভাবলেন যুদ্ধকালীন এ ৯ মাস আমরা ঘরে কি করবো তাই কুরআন শিক্ষা ও উর্দু শিক্ষা-ই উত্তম।

আমি উনার পুত্রবধু। আমেরিকায় আছি ১৯ বছর। আমার শাশুড়িকে আমি বেশি দিন পাইনি। উনি যদি আজ আমাদের মাঝে থাকতেন আমি বোধহয় নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে আরো উন্নত করতে পারতাম।

পরিশেষে আমি এটাই বলতে চাই, আল্লাহ্ তা'লা উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমীন। লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রামের সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমায় সকলের প্রতি আমার সালাম ও অভিনন্দন। জামা'তের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মো'জেযা বা নিদর্শন

সংগ্রহে: খাদিজা বেগম তুষ্টি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সারা জীবন মো'জেযা দেখিয়েছেন। মো'জেযা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। সকল প্রকারের মো'জেযা হযরত সাহেব (আ.) দেখিয়েছেন। তিনি তো 'প্রতিশ্রুত মসীহ' হবার দাবীর পূর্বেই মো'জেযা দেখাবার দাবী করেছেন এবং দেখিয়েছেন।

মো'জেযা কি?

মো'জেযা অর্থ আমেন নিদর্শন প্রদর্শন করা যা ঐ যুগে অন্য কেউ প্রদর্শন করতে পারেনি। অথবা প্রতিযোগিতায় নামতে পারেনি। প্রথম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মো'জেযা হচ্ছে এমন মো'জেযা যা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সরাসরি প্রদর্শন হয়ে থাকে। তারপর চারিত্রিক মো'জেযাও বড় শক্তিশালী মো'জেযা। এছাড়া জ্ঞান বা বিদ্যাজগতের মো'জেযা আছে যাকে বলে ইলমী মো'জেযা। আর এক প্রকার মো'জেযা আছে যাকে বলে অলৌকিক মো'জেযা বা অসম্ভব ঘটনা ঘটানো। এমন ঘটনা বা সাধারণভাবে প্রকৃতির বিধান মতে ঘটা সম্ভব নয়। এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটানো এক বড় ধরণের মো'জেযা। এই সকল প্রকারের মো'জেযা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) দেখিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মো'জেযার একটি সার্বজনীন বিশেষত্ব রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, কখনও কখনও কোন মো'জেযা সবাই বুঝতে পারে না বা দেখতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে মো'জেযা হয়নি। এখানে মূখ্য ভূমিকা হচ্ছে এই যে, মো'জেযা বুঝার বা দেখার যোগ্যতা কার কতটুকু আছে।

হযরত মির্যা সাহেবের অজস্র অগণিত মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছে, প্রদর্শিত হয়েছে– বহুলোক দেখেছে এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যতজন দেখেছেন ও গ্রহণ করেছেন তার গুণ বেশী মানুষ দেখেনি বা গ্রহণ করেনি। অতএব প্রকৃত সত্য এই, যে সংখ্যা মানুষ ঐসব মো'জেযা দেখেনি বা বুঝেনি অথচ মো'জেযা অবশ্যই প্রদর্শিত হয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর কয়েকটি মো'জেযা

ভয়াবহ প্লেগ একটি অনন্য মো'জেযা:

ব্যাপকতার দিকক থেকে ভয়াবহতার দিক থেকে ভারত বর্ষে বিশেষত পাঞ্জাবে, যে প্লেগের মহামারী হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ দেখিয়েছিলেন তা অনেক বড় নিদর্শন।

হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বিরোধী নেতার উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তারা যারা নিজেকে ধর্মীয় নেতা, আল্লাহর দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে মনে করে, তারা যেন ঘোষণা দেন যে–

ক. তিনি অমুক ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি স্বয়ং প্লেগে মারা যাবেন না।

খ. তার অনুগত বা ভক্তরাও প্লেগে মারা যাবে না।

গ. তার শহরে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমন হবে না। (দাফেউল বালা)

তিনি (আ.) এত বড় দাবি করলেন যে, আমার সত্যতার প্রমাণ এই যে, আমি আল্লাহর বাণী পেয়ে বলছি যে, আমি ও আমার পরিবারের কেউ প্লেগের আক্রমণে মারা যাবো না। আমার

অনুগত জামা'ত, আহমদীয়া জামা'তের কেউ মারা যাবে না- অথচ লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে এবং ৭/৮ বছরে ৩৩ লক্ষের বেশি লোক মারা গেছে। মির্যা সাহেবের কথা মতোই সব ঘটে গেল। তারপরও কী এটি সত্যতার নিদর্শন নয়?

এক রাতে ৪০ হাজার আরবী শব্দভাণ্ডার শিক্ষা লাভ:

হযরত মির্যা সাহেব (আ.) কোন মাদ্রসায় দ্বীনি তালীম গ্রহণ করেন নি। তফসীর, হাদীস, ফিকাহ কিছুই পড়াশুনা করেন নি। যখন তিনি দাবী করলেন– তখন আলেমরা অত্যন্ত দম্ভভরে অভিযোগ তুলল যে, মির্যা সাহেব আরবী ভাষা জানে না। তফসীর হাদীস ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ এমন ব্যক্তির কথার কী মূল্য থাকতে পারে? এদিকে দেখুন, হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'লা তাকে ওহীর মাধ্যমে এক রাতে ৪০ হাজার আরবী ভাষার প্রকৃতি/ধাতু শিখিয়ে দিলেন। প্রমাণস্বরূপ হযরত (আ.) অনেকগুলো গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখলেন। উলামায়ে ইসলাম এমনকি পৃথিবীর সকল আরবী ভাষার আলেমদের চ্যালেঞ্জ দিলেন যে, আরবী ভাষায় লেখার প্রতিযোগিতা করুন। বিভিন্ন আরবী বই-এর উপর বিভিন্ন ধরণের পুরষ্কার রাখলেন। আরবী ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কে কাসীদা লিখলেন। সূরা ফাতিহার তফসীর লিখলেন। কোন আলেম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'লা তাকে আরবী ভাষা, তফসীর এবং ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন।

হযরত আকদাস (আ.) লিখেছেন, "আমাদের আরবী লেখা গ্রন্থগুলো আল্লাহর বিশেষ গায়েবী সাহায্যে লেখা– লিখতে লিখতে এমন শব্দ অনেক সময় দরকার হয় যা আমার জানা থাকে না। কিন্তু তখনই ইলহামের মাধ্যমে সেই শব্দ পেয়ে যাই। অনেক সময় শব্দ লিখে ফেলি যার অর্থ পরে অভিধান দেখে জানতে হয়।"

হযরত সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানী সারশাবী (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"আমি প্রায় চার বছর ধরে সর্দি লাগায় নোযালা যুকাম ভূগছিলাম। দুধপান সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি আমার জন্য অসহ্য ছিল। ব্যবহার করলেই সর্দি লেগে যেত। হাঁচি, কাশি ইত্যাদিতে ভুগতে থাকতাম কমপক্ষে ১৫/১৬ দিন।

একদিন এশার নামাযের পর মসজিদে মোবারকের ছাদে হযরত আকদাস (আ.) বসা ছিলেন। সাহবায়েকেরাম আশেপাশে ঘিরে বসে ছিলেন। যেন চাঁদের চারদিকে নক্ষত্ররাজি। হযরত (আ.) দুধপানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দুধ আনা হলে হযরত এক ঢোক দুধ পান করে দুধের গ্লাস আমাকে দিয়ে বললেন "পান কর"। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, "হুযূর আমি তো দুধ পান করতে পারি না। দুধ পান করলে বিষক্রিয়া হয়ে নাযালা যুকাম (সর্দি) হয়ে যায়"। হযরত বললেন– "পিলো, কাহে কা যুকাম উকাম" (পান কর কোথাকার সর্দী)। আমি আদব ও সম্মানের কারণে সব দুধ পান করে ফেললাম। ওই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনও আমার যুকাম হয়নি। অথচ ইতঃপূর্বে সামান্য দুধও পান করতে পারতাম না। আর যদি পান করতাম অবশ্যই ১৪/২০দিন মাথা ব্যথা, কাশি ইত্যাদিতে অসুস্থ থাকতাম। নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি হযরত (আ.)-এর পান করা উচ্ছিষ্ট্য দুধের বরকতে আমার রোগ মুক্তি হয়েছে। আল্লাহর ফযল এটা। (তাযকেরাতুল মাহদী: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

মূল লেখক: মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

চট্টলার ঝর্ণাধারায় লুটোপুটি

আমাতুল মুজিব খুশী

আমার মেয়ে ছোট্ট দুষ্টু মিষ্টি সোনা সারা
বোরখা পড়ে মসজিদে গিয়ে করতো মাতোয়ারা
বছরটা হবে হয়তো ২০০৯-১০ সাল
চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহতে তখনো আমার ছিল না কোন হাল
পুরুষ কি মহিলা সবাই কাছে ডেকে ডেকে
নাম শুনতো, করতো আদর আমার সারা পাখিকে
আমি চিনিনা, আমাকে চেনেনা চিনতো সারা বুড়ীকে
অল্পদিনেই "সারার আম্মু" নামে ডাক পড়লো চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহতে
শুধু সারাকে দিয়েই পরিচিতি আমার পৌঁছালো সবার কাছে
সবাই যেন হলো আপন, হৃদয়টা যেন নাচে
চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনের ঝর্ণাধারায় লুটোপুটি খেয়ে
আস্তে আস্তে আমার ছোট্ট সারা গেছে বড় হয়ে
আজ সুবর্ণ সন্ধিক্ষণে সেই ছোট্ট মেয়েটি সারা
লাজনা হয়ে যেন আনন্দতে করছে মাতোয়ারা
লাজনা বোনদের সবার কাছে আমার আকুল আবেদন
সৎকর্মে মেয়েটি যেন সবার মাঝে বাঁচে আজীবন।

স্মৃতিতে চট্টগ্রাম

খালেদা দাউদ

চট্টগ্রাম থাকাকালীন সময়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম জামা'তের একজন সদস্য হিসেবে কাজ করার। সে সময়কার অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। জামা'তে কাজ করার সময় এমন অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছিল যাদের কথা আমি কখনই ভুলে যেতে পারব না।

ছোটবেলা থেকে আমি আমার আব্বাকে দেখেছি যে উনি কীভাবে জামা'তের কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। জামা'ত আমার আব্বার প্রাণ ছিল। উনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। আমার আব্বা মরহুম জনাব নুরুদ্দিন আহমদ খান সাহেব জীবনে অনেকটা সময় নিজেকে ঢাকা জামা'তের কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'লা আমার পিতাকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন। আমরা দুই বোন। আমাদের জন্ম ঢাকায়। আমার আম্মা মরহুমা মাহবুবা হাসনা উনি প্রাক্তন নায়েব আমীর মরহুম ভিজির আলী সাহেবের বড় কন্যা ছিলেন। আল্লাহ উনাদের বেহেশত নসীব করুন আমীন।

ঢাকা থেকে পরবর্তীতে আমার যাত্রা শুরু হয় চট্টগ্রামে। বিয়ে হয়ে যাবার কারণে আমি ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমি আরেকজন সত্যিকার পিতা পেলাম উনি হলেন প্রিন্সিপ্যাল মোনায়েম বিল্লাহ সাহেব। উনার কারণে ঢাকার মায়া আমার মনে অনেক কমে গিয়েছিল। উনি হলেন আরেকজন মানুষ যিনি কিনা জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ঠিক ঢাকার আরেকটা পরিবেশ আমি চট্টগ্রামে পেয়েছি। আমার মরহুম বাবা মনে হয় এতটা খুশি হতেন না আমার বাইরে চাকরী করাতে যতটা খুশি তিনি হয়েছিলেন চট্টগ্রাম জামা'তের একজন লাজনার কর্মী হওয়াতে। আল্লাহ বাবাকে বেহেশত নসীব করুন।

আমার চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছু উল্লেখ করতে হবে। জানি না আমি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারব কিনা।

চট্টগ্রাম জামা'তে আমার কাজ শুরু হয় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাহেবা জনাবা রওশন আহমদ (সূচী আপা)-এর হাত ধরে। আপা আমাকে প্রথম জামা'তে একজন আমেলার সদস্যা হিসেবে কাজ করবার সুযোগ করে দেন। আপাকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া। এজন্য আপাকে শুকরিয়া কেননা আপা আমার নাম অডিটর হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন আর বাকীটা আল্লাহ তা'লার হাতে ছিল। আপা বর্তমানেও চট্টগ্রাম জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা আপাকে এবং তার পরিবারকে হেফাযতে রাখুন। সেসময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন একটি নতুন ঘটনার যা সারাজীবন মনে রাখার মত। আমার সালটা ঠিক মনে নাই যে সালে চট্টগ্রাম জলসায় লন্ডনের ইমাম সাহেব জনাব আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব এবং উনার বিবির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি এবং আমার স্বামী উনাদের নিয়ে চট্টগ্রামের কিছু দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এমনকি উনাদের আমাদের বাড়িতে একবেলা দাওয়াত খাওয়ানোর সৌভাগ্যও হয়েছিল। ইমাম সাহেব সে বছর হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। এরপর আরেকজন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মওলানা হামিদ কাওসার সাহেবের সাথে আমাদের মোলাকাত হয়েছিল। কোন সালে তিনি হুযূরের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন ঠিক মনে নাই। তবে মওলানা সাহেবকে সবসময় 'রাহে হুদা' নামক একটি অনুষ্ঠানে এম.টি.এ-তে দেখতাম। উনাকেও সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে উনি আমাদের বাসায় এসেছেন এবং আলাদা করে আমাদের বাসায় থাকাকালীন লাজনাদের সাথে

মোলাকাত করেছিলেন। আল্লাহ তা'লার কাছে অশেষ শুকরিয়া যে তাদের সাথে আমরা মোলাকাত করতে পেরেছি।

এখন আমি আমার কাজের অভিজ্ঞতায় আসি। সূচী আপা (বর্তমান প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম) যিনি কিনা আমি আগেও বলেছি যে সে সময়ে লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অডিটের যেটা কিনা আমার জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ আমার পড়াশোনা ছিল Marketing, Human Resource Management নিয়ে। Accounting ছিল আমার পড়ার একটা অংশ। আর আমার ধারণা ছিল Audit করতে হলে Chartard Accountant হওয়া লাগে। যাই হোক আপা অনেক বুঝে শুনেই হয়ত চিন্তা করেছেন এবং অবশ্যই আল্লাহর সম্মতি ছিল আর আমার ঘরেও একজন Chartard Accountant ছিলেন। তিনি হলেন আমার স্বামী জনাব আহমদ দাউদ সাহেব (FCA, FCMA)। উনার কাছেই প্রথম আমার অডিট করার হাতেখড়ি। জনাব দাউদ সাহেব তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রাম জামা'তের অডিটর ছিলেন। অডিটর হিসেবে জামা'তে আমার প্রথম কাজ। কিন্তু আল্লাহর ফযলে আমি আমার ঘর এবং লাজনা বোনদের থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। ফলে কাজ আমার জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনের প্রথম কাজ বলে আমি যেমন উৎসাহিত ছিলাম তেমনি কিছুটা ভয়ও কাজ করতো যে ঠিকমতো পারব কিনা। পরবর্তীতে আরো বড় কাজের দায়িত্বভার আল্লাহ তা'লা আমার উপরে দেন তা হলো জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব। জামা'তের সকল দায়িত্বই সমান গুরুত্বপূর্ণ শুধু কাজের ধরণ আলাদা। যখন আমি জেনারেল সেক্রেটারী ছিলাম তখন চট্টগ্রাম লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা ছিলেন নাঈমা বুশরা সাহেবা যিনি সম্পর্কে আমার খালা। অসম্ভব কর্মঠ একজন কর্মী ছিলেন জামা'তের। উনি আমার আম্মা আব্বার দু'দিক দিয়ে আত্মীয় হন। অসম্ভব সহযোগিতা ছিল খালার এবং সহকারী বুশরা মজীদ সহ অনেকের। একসাথে আমরা জলসা, ইজতেমা সহ জামা'তী বিভিন্ন দিবস যেমন মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস, মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস, সীরাতুন্নবী (সা.) খুবই সুন্দরভাবে পালন করেছি।

আমি এতক্ষণ আমার কিছু অভিজ্ঞতা আমার লেখনীতে তুলে ধরলাম। তবে আমি আমার নিজস্ব পরিচয়টা এখনও দেইনি। আমার জন্ম ঢাকাতে আগেও বলেছি, আমার পড়াশোনা Marketing এ অনার্স এবং Human Resource Management (M.B.A) সম্পূর্ণ করেছি। আমার পুরো নাম খালেদা আক্তার খান। আমি জনাব নুরুদ্দিন আহমদ খান এবং জনাবা মাহবুবা হাসনার কনিষ্ঠা কন্যা। পরবর্তীতে আমার বিবাহ হয় জনাব প্রিন্সিপ্যাল মোনায়েম বিল্লাহ ও জনাবা নুসরাত মোনায়েম সাহেবার কনিষ্ঠ পুত্র জনাব আহমদ দাউদ সাহেবের সাথে। তবে চট্টগ্রাম জামা'তে আমি খালেদা দাউদ হিসেবে পরিচিত ছিলাম। কারণ আমার মা (শাশুড়ি) চাঁদার খাতায় নামটা এভাবেই উঠিয়েছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে আল্লাহর পরে আমার বাবা (শ্বশুর) এবং আমার মা (শ্বাশুরী) উনাদেরকে মনের অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। কারণ উনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি কোনদিনও এত সহজ করে কাজ করতে পাতাম না। আমার ২ কি ৩ বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে আমার বাবা আর মা যেভাবে দেখাশোনা করতেন যা কিনা একজন মায়ের চেয়েও বেশি। আমার মেয়েটা বুঝতো না যে সে মা-বাবার কাছে আছে না দাদা-দাদীর কাছে। আজকে আমাদের নিকট হতে আমার বাবা-মা (শ্বশুর-শ্বাশুরী), এমনকি অনেক কষ্টের হলেও সত্যি, যে আমার প্রাণপ্রিয় মেয়েটা পর্যন্ত এই দুনিয়া ছেড়ে প্রাণপ্রিয় পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'লা আমার বাবা, মা এবং আমার ছোট্ট মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন আমীন।

জামা'তে কাজ করাটা দায়িত্ব বলে আমার মনে হয় না। বরং এটা হলো আল্লাহর দেয়া সৌভাগ্য। অনেক মানুষদেরকে নিয়ে একসাথে সবাই মিলে আমরা কাজ করেছি। আমার শ্বাশুরী মা সবসময় বলতেন বেটা Unity is Strength. আসলেই একহাতে যে কাজটা যতটা কঠিন দশহাতে সেই কাজটা ততটাই সহজ। সবাই একসাথে আমরা যখন জলসা, ইজতেমার আগেরদিন রাত পর্যন্ত কাজ করতাম তখন কোন মুহূর্তের জন্য নিজেকে ক্লান্ত মনে হতো না। এখন আমি ঢাকাবাসী হয়ে গিয়েছি। জীবনে অনেক অনেক আনন্দ যেমন আল্লাহর ফযলে পেয়েছি তেমনি একজনকে হারানোর ঘটনায় জীবনে কষ্টের মধ্যে থেকেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'লা স্বয়ং সেই জায়গা থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু সেই কষ্টটা সত্যি বলতে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে। আজ আমার জায়গায় অনেক নতুন মানুষ জামা'তের কাজ করছেন এবং করবেন কারণ আল্লাহর সত্য জামা'ত কারও জন্য থেমে থাকে না। বরং আরো উন্নতির দিকে ধাবিত হবে জামা'ত। এটাই হলো হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যিকার জামা'তের নিদর্শন।

পরিশেষে আমি আমাদের যুগ-খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মতো একই কথা বলবো যে অনেক অনেক দোয়া করার প্রয়োজন। এই দোয়াই যেন আমাদের দাওয়া হিসেবে কাজ করে। আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব। দোয়াই হল আমাদের একমাত্র হাতিয়ার। আল্লাহ তা'লা বাংলাদেশ জামা'তকে অগ্রগতি দান করুন এবং জামা'তের কর্মীদেরকে দ্বীন ও দুনিয়াতে উন্নতি সাধন করুন। মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের হাফেজ ও নাসের হউন আমীন।

স্মরণ রেখো

ফিজা আহমেদ

আজ নেই আনন্দের শেষ,
চারিদিকে আড়ম্বর বেশ,
উল্লাসে মুখরিত লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম
সুবর্ণ জয়ন্তী ইজতেমার দিন আজ
পঞ্চাশটি ইজতেমার স্মৃতিচারণের দিন আজ।
আজ দিন অতীতে ফিরে যাওয়ার,
আজ দিন ভবিষ্যতের সাক্ষী গড়ার।

বায়তুল বাসেতের তিন তলায় আজ তিল ধারণের ঠাঁই নেই,
সোনালী ইতিহাসের সাক্ষী হতে দূর-দূরান্ত হতে এসেছে সবাই,
সেই চিরচেনা মসজিদ ও প্রাণপ্রিয় মুখগুলো সামনে,
বহুদিন পর এক ছাদের নিচে আবারও হবে স্মৃতিকথা,
আনন্দ অশ্রু তাই গড়িয়ে পড়ছে সবখানে।
ভুলি নি, ভুলবো না, ভুলতে দিব না,
চট্টগ্রাম লাজনার ইতিহাসের নিবেদিতপ্রাণ,
আমরা তোমাদের ভুলবো না।

আজ হতে পঞ্চাশ বছর পরে,
শততম ইজতেমা যারা করবে পালন,
সালাম জানাই তোমাদেরও
স্মরণ রেখো এই আমাদেরও।
পুরনো তাজনীদে কিংবা ছেঁড়া ফাইলের কাগজে,
অথবা কোনো এক গোলাপি চাঁদার রশিদে,
খুঁজে দেখো পাবে নিশ্চয়ই,
ঝাপসা কালিতে মোদের অস্তিত্বই।
স্মরণ করে রেখো কাছে,
আমরা আছি তোমাদেরই সাথে।
আবেদন রইল তোমাদের কাছে–
শততম ইজতেমা এমনভাবে করিও পালন,
আজীবন পুরো বিশ্ব যেন করে স্মরণ।
শুভকামনা নিরন্তর তোমাদের জন্য,
স্মরণ রেখো আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকবো,
আন্তরিক দোয়া শুধু তোমাদের জন্য।

ফুলবাগিচা

মমতাজ জামান

আমরা মুসলিম, আমরা আহমদী।
আমরা নারী জগতের আশার আলো,
আমাদের আছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ।
আমাদের আছেন ধর্মজগতের সূর্য,
আলোর দিশারী হযরত রসূলে করীম (সা.)
আরো আছেন ধর্ম জগতের চন্দ্র,
পথপ্রদর্শক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)
আমরা আহমদী নারী,
কখনও করিনা অবহেলা নেজামের বাণী।
তাইতো আমাদেরকে দান করিয়াছেন
হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী,
১৫ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে
লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন।
তাইতো আমরা হয়েছি মহীয়ান।
আমরা মুসলিম, আমরা আহমদী নারী।
আমাদের চলার পথ দেখিয়েছেন,
আমাদের প্রাণপ্রিয় মাথার মুকুট,
খলীফা রাজিগণ।
তাইতো, আজ আমরা পেয়েছি,
এই মহিমান্বিত ৫০তম গৌরবময়
মহান ইজতেমা।
ইজতেমাতে যাব আমরা।
একসাথে গড়বো ধর্মের বাগান।
বাগানে ফুল ফুটবে হাজার হাজার শতকোটি।
একসাথে মিলেমিশে,
করবো আমরা ধর্মের গুঞ্জন।
আসছে, আমাদের শুভদিন ২০২২ সাল। আনন্দ আর খুশীতে রয় না যেমন।
৫০তম মহান ইজতেমা আমাদের মাঝে, বয়ে আনুক শুভবার্তা।
আমাদের মাঝে এসে পড়েছে, এক ভয়ংকর ব্যাধি।
নাম তার করোনা ভাইরাস।
এই মহামারী হতে শিখতে পেরেছি
দূরে হতে কাছে, আড়াল হতে সামনে।
জুমের মাধ্যমে ধর্মের সর্ব প্রকার কাজ।
পরিচর্যা করে আমরা ছড়াবো পৃথিবীর কোণে কোণে।
আমরা মুসলিম, আমরা আহমদী,
আমরা লাজনা ইমাইল্লাহর এক আশার আলো।
আমাদের ধর্মের বাগান ভরে উঠুক
হাজার হাজার শতকোটি ফুলের গন্ধে।
এইতো আমার কামনা।

চট্টগ্রামের কীর্তিমানদের স্মরণে

দীনা নাসরিন

আশেকে রসূল, সুফি সাধক,
বার আউলিয়ার দেশ, চট্টগ্রাম।
অপরুপ, বৈচিত্র্যময়, ফুলে ফলে সুশোভিত
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম।

পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের পদচারণায়
চট্টগ্রামের মাটি ধন্য।
তাঁদের দোয়ার বরকতে, এই মাটিতে
বাংলার প্রথম আহমদীর জন্ম।
কালজয়ী ক্ষণজন্মা
এই মহান মানব
আনোয়ারা থানার তিনি
আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.)
বার্মায় চাকরিরত অবস্থায়
আহমদীয়াতের পয়গাম পান।
১৯০৫ সালে তিনি (রা.)
কাদিয়ানে যান।
মাহাদীর হাতে বয়আত নিয়ে
আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক হয়ে
দেশে ফিরে আসেন তিনি
মাহাদীর আগমনের বার্তা নিয়ে।
সাহসের সাথে প্রচার করেন
গ্রামবাসীদের মাঝে।
এই প্রচারের রিপোর্ট দিতেন
ইমাম মাহদীর কাছে।
বটতলীতে পরিচিত যিনি
ঈসা মারা মৌলভী
তিনিই হলেন নূর মোহাম্মদ
বাংলার প্রথম সাহাবী।
বগুড়ার মৌলভী সাহেব
মোবারক আলী খান,
মাহাদীর খলীফার হাতে বয়আত নিতে
১৯০৯ সালে কাদিয়ানে যান।

সরকারী মাদ্রাসা হাই স্কুলে,
প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিলেন তিনি ১৯১৬ সালে।
আহমদীয়াতের প্রচার-প্রসারে
ঝাপিয়ে পড়েন তবলীগের ময়দানে।
তার তবলীগে বয়আত নেয়ার সৌভাগ্য পান
প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান।
তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের আরবী প্রফেসর
ইমাম ছিলেন চকবাজারের
মসজিদ ওলী খাঁর।
আহমদী জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে
মসজিদের ইমামতী ত্যাগ করে
নামাযের জায়গা করেন তিনি
নিজের বাস ঘরে।
স্ত্রী, মাতা, কাজের ছেলে রহীম বক্স
তাঁর তবলীগে বয়াত নিয়ে জামা'তভুক্ত হন।
দিনে দিনে আহমদীদের সংখ্যা
আরো বৃদ্ধি পায়।
১৯২০ সালে আব্দুল লতিফ সাহেবের মাধ্যমে
চট্টগ্রাম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।
জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে তিনি হননি ক্ষান্ত,
জামা'তের উন্নতির জন্য
পরিশ্রম করেছেন অক্লান্ত।
জীবনের চেয়ে জামা'ত ছিল
তাঁর কাছে অধিক মূল্যবান,
এই জামা'তে করেছেন তিনি
অনেক সম্পত্তি দান।
সেখানেই আজ কেন্দ্র
চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহমদীদের,
নির্মিত হয়েছে 'বায়তুল বাসেত'
প্রাণ প্রিয় মসজিদ সকলের।
হযরত রঈস উদ্দিন খাঁ সাহেব
বাংলার দ্বিতীয় সাহাবী
সৈয়দা আজিজাতুন নেসা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী।
১৯০৭ সনে পত্রের মাধ্যমে
বয়আত গ্রহণ করেন
তিনিই বাংলার প্রথম আহমদী নারী
হওয়ার সৌভাগ্য পেলেন।

১৯২১ সনে স্বামী রঈস উদ্দিন খাঁ
মৃত্যুবরণ করেন,
আল্লাহ-রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী
আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে ২য় বার
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।
এই পূণ্যবতী স্নেহ মমতা ও তালীম তরবিয়তের জন্য,
চট্টগ্রামের আহমদী সন্তানেরা
হয়েছে ধন্য।
লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম
সংগঠন তৈরী হয় ১৯৪৮ সনে।
এই সংগঠনের কার্যক্রম
করেছে অনেক সুনাম অর্জন।
সংগঠনটির প্রথম প্রেসিডেন্ট
মরহুমা সামছুন্নেছা
তাঁর দানশীলতা ও ধার্মিকতার কথা
চট্টগ্রামবাসীর হৃদয়ে আজও আছে গাঁথা।
বুযুর্গ আবদুল লতিফ
ও তার বুযুর্গ সহধর্মিনী,
চট্টগ্রামে ছিলেন তারা সকলের
আধ্যাত্মিক জনক-জননী।
তাদের সুযোগ্য সন্তান
গোলাম আহমদ খান,
চট্টগ্রাম জামা'তে খেদমতে তাঁর
অসাধারণ অবদান।
চট্টগ্রামে আরো অনেকেই ছিলেন
জামা'তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ,
তারা বরণীয় সকলের কাছে
হয়েছেন খ্যাতিমান।
সর্বদা আমরা দোয়া করি
চট্টগ্রামের এই কৃতি সন্তানদের জন্য,
যাদের আত্মত্যাগের কারণে
চট্টগ্রাম হয়েছে ধন্য।
তাদের স্মৃতি চির জাগ্রত থাকুক
আহমদীদের হৃদয়ে
আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই
তাদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণে।

ইসলামের বিজয়

ফারহানা সিকদার

আমরাই আহমদী
সত্য পথে চলি নিরবধী
করি না মোরা ভয়
যারা মোদের কে কাদিয়ানী কয়
আমরাই আহমদী।

নতুন করে ইসলামের পতাকা
করেছি মোরা উত্তোলন
বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে
ইসলামের মহামিলন।

মোরা করি সত্যিকারের
ইসলাম প্রচার
যা দেখে অন্য মোল্লারা হয় বেজার।
তারা তাদের উগ্র থাবায়
করতে চায় মোদের দমন
স্বয়ং খোদা মোদের করেন রক্ষা
নিজ সন্তানের মতন।

আহমদী জিন্দাবাদ বলি বারবার
কি আছে এ জামা'তে দেখে যাও একবার
বলি মোল্লাদের
কর খোদাকে ভয়
আমাদের শহীদ করে
ভেবোনা পেয়েছ জয়
দেখো চেয়ে
আহমদী ইসলামের হবে নিশ্চিত বিজয়।

ছবিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

মসজিদ বিল্ডিং

মসজিদের পশ্চিমাংশ

ইফতার বিতরণ কর্মসূচি

ইফতার বিতরণ কর্মসূচি

ইফতার বিতরণ কর্মসূচি

সুবর্ণ-স্মৃতি

মীনা বাজার ও পিঠা উৎসব

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

করোনাকালীন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন কর্মসূচি

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (নাসেরাত)

ঈদ পুনর্মিলনী, লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জামা'তের শতবর্ষ উপলক্ষে দেয়ালিকা

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

প্রজেক্ট (নাসেরাত)

প্রজেক্ট (নাসেরাত)

প্রজেক্ট (নাসেরাত)

প্রজেক্ট (নাসেরাত)

আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।

[ইলহাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)]

সুবর্ণ-স্মৃতি

৫০তম ইজতেমা স্মরণিকা | আগস্ট, ২০২২ | লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন,

“তোমরা যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মহিলারও সংশোধন করতে সক্ষম হও তবে সুনিশ্চিত ইসলামের উন্নতি হবে।”

(আল-ফজল, ২৯ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ. ০৩)

লাজনা ইমাইল্লাহ (আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা’তের মহিলা স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গ সংগঠন) | Visit: **www.lajnabd.org**

Design & Printed by: **Bud-O-Leaves** / +880 1711 527 514